সাইমুম-৩৯

ধ্বংস টাওয়ারের নিচে

আবুল আসাদ

ইবুক সম্পর্কে কিছু কথা

সম্মানিত পাঠক,

আসসালামু আলাইকুম

সাইমুম সিরিজকে অনলাইনে টেক্সট আকারে আনার লক্ষ্য নিয়ে ২০১২ সালের ১৭ই আগস্ট গঠন করা হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট (SSUP) গ্রুপ। তারপর বিভিন্ন ব্লগে ও ফেসবুকে প্রোজেক্টের জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করা হয়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন একঝাক স্বেচ্ছাসেবক এবং এই স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট টীম। টীম মেম্বারদের কঠোর পরিশ্রমে প্রায় ৮ মাসে সবগুলো সাইমুম অনলাইনে আসে। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

ওয়েবসাইটঃ www.saimumseries.blogspot.com

ফেসবুক পেজঃ www.facebook.com/SaimumSeriesPDF

ফেসবুক গ্রুপঃ www.facebook.com/groups/saimumseries

১

ছুটছিল আহমদ মুসা পূর্বমুখী প্রশস্ত করিডোর ধরে। তার পেছনে বুমেদীন বিল্লাহ।

দুজনের হাতেই দুটি ডেডলি কারবাইন। উদ্যত অবস্থায়। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যেত দুটো কারবাইনের নল দিয়েই ধুঁয়া বেরুচ্ছে। তাদের পেছনে করিডোরের এক চৌমাথা। চৌমাথার উপর পড়ে আছে ছয় সাতটি লাশ। ওরা ছুটে এসেছিল উত্তর ও দক্ষিণের করিডোরটার দিক থেকে আহমদ মুসাকে বাধা দেয়ার জন্যে। বন্দীখানার ভেতরে প্রহরীদের সাথে যে সংঘর্ষ হয়, তার গুলীর শব্দ তারা পেয়েছিল।

আহমদ মুসার বন্দীখানা থেকে বেরুতে চেয়েছিল নিশব্দেই। কিন্তু তা পারেনি। আবার গেটেও যে গোপন এ্যালার্ম ব্যবস্থা ছিল তা আহমদ মুসারা একবারও ভাবেনি। এ এলার্ম পেয়েই দুপাশ থেকে বাড়তি প্রহরীরা ছুটে এসেছিল গেটের দিকে। এ সবের ফলেই হাইম হাইকেলকে খোঁজার জন্যে আহমদ মুসারা বন্দীখানায় যে কাজটা নি:শব্দে সারতে চেয়েছিল তা আর হয়নি।

তাদেরকে বন্দীখানা থেকে ছয়টি লাশ মাড়িয়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সব আট-ঘাট বেঁধে তাদের বন্দী করে রাখলেও তাতে একটা বড়

ফসকা গিরা ছিল। তাদেরকে ক্লোরোফরম করেছিল তারা ঠিকই, কিন্তু আহমদ মুসা ও বুমেদীন বিল্লাহ তাদের নিশ্বাস বন্ধ করে রাখায় ক্লোরোফরম তাদের উপর কাজ করেনি। তারা সংজ্ঞা হারাবার ভান করে ওদের বোকা বানাতে পেরেছিল।

ওরা আহমদ মুসাদের পিছমোড়া করে বেঁধে মেঝেয় ফেলে রেখে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যেতেই আহমদ মুসা চোখ খুলেছিল। বুমেদীন বিল্লাহও। গেট আগলাবার ও বন্দীদের উপর নজর রাখার জন্য দুজন প্রহরী রাখা ও তাদের কড়া নির্দেশ দেয়ার বিষয়টাও তারা শুনে নেয়।

চোখ খুলেই মেঝের উপর উঠে বসে আহমদ মুসা। পিছমোড়া করে বাঁধা হাতের বাঁধন পরখ করার চেষ্টা করে বলে, 'বিল্লাহ ওরা বিশেষ ধরনের রাবার রোপ দিয়ে বেঁধেছে। সম্ভবত এটা কোনভাবেই কাটা যাবে না।'

বুমেদীন বিল্লাহও উঠে বসেছিল। বলেছিল, 'রাবারের বাঁধন খোলাও কঠিন ভাইয়া।'

আহমদ মুসা চোখ বন্ধ করে একটু ভেবেছিল। বলেছিল, 'তবে বিল্লাহ রাবার দড়িতে যদি ইলাষ্টিসিটি থাকে, তাহলে কিন্তু একটা পথ বের করা যায়। বাঁধনটা যেভাবে হাতকে কামড়ে ধরেছে, তাতে রাবার দড়িতে ইলাষ্টিসিটি আছে বলেই মনে হচ্ছে। তোমারটা কেমন বিল্লাহ?'

'ঠিক ভাইয়া, বাঁধনটা হাতে যেন ক্রমশই চেপে বসেছে।' বলেছিল বুমেদীন বিল্লাহ।

খুশি হয় আহমদ মুসা। ঘরে ছিল ঘুট ঘুটে অন্ধকার। আহমদ মুসা বুমেদীন বিল্লাহর দিকে ঘুরে বসে বলেছিল, 'আমি একটু চেষ্টা করি। দেখি তোমার বাঁধন কি বলে?'

'কাজটা খুবই কঠিন ভাইয়া। পিছমোড়া করে বাঁধা হাত খুব একটা শক্তি খাটাতে পারবে না। কিন্তু বাঁধন দারুণ শক্ত বোঝাই যাচ্ছে।' বলেছিল বুমেদীন বিল্লাহ।

'তা ঠিক, বাঁধনটা খুবই শক্ত। কিন্তু বাঁধনের একটা সিংগল তারকে তুমি যদি আলগা করতে পার, তাহলে কিন্তু কাজ খুবই সহজ হয়ে যাবে।' আহমদ মুসা বলেছিল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বুমেদীন বিল্লাহকে আবার বলে, ‘তোমার হাত এদিকে দাও।’

আহমদ মুসা তার দিকে পেছন ফিরেছিল।

আহমদ মুসা হাতের আঙুল দিয়ে বুমেদীন বিল্লাহর হাতের বাঁধন পরীক্ষা করে। অত্যন্ত শক্ত বাঁধন, রাবার ইলাষ্টিক হওয়ার কারণেই বাঁধন আরও কামড়ে ধরেছে হাতকে।

আহমদ মুসা অনেক চেষ্টার পর চিমটি দিয়ে ধরে একটা তারকে আলগা করে তাতে আঙুল ঢোকাতে পারল।

এ সময় বাইরে থেকে একজনের কণ্ঠ শোনা যায়। বলেছিল সে, ‘শালারা সংজ্ঞা হারায়নি। সাবধান। ঘর খোল। ওদের ঘুমিয়ে রাখতে হবে।’

কথাটা কানে যেতেই আহমদ মুসা বুঝে ফেলে সব। নিশ্চয় এঘরে সাউন্ড মনিটর যন্ত্র আছে, এমনকি টিভি ক্যামেরাও থাকতে পারে। তারা ঐভাবে কথা বলে ভুল করেছে।

ব্যাপারটা বুঝার সংগে সংগেই আহমদ মুসা বুমেদীন বিল্লাহর হাতের বাঁধনে ঢুকানো আঙুলটা বড়শির মত বাকা করে হাত দিয়ে জোরে টান দেবার উপায় না খুঁজে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সামনের দিকে।

আছড়ে পড়ে আহমদ মুসা মেঝের উপর। মুখ খুলে যায় বিল্লাহর হাতের বাঁধনের। বুমেদীন বিল্লাহ দ্রুত বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে এগিয়ে যায় আহমদ মুসার দিকে।

‘তাড়াতাড়ি বিল্লাহ। ওরা দরজা খুলছে।’

বুমেদীন বিল্লাহ অন্ধকারে আহমদ মুসার হাত খুঁজে নিয়েছিল। পরীক্ষা করে দেখে হাতে কামড়ে বসে আছে শক্ত বাঁধন। অন্ধকারে হাতের বাঁধন হাতড়ে একটা তার খুঁজে নিয়ে তা বিচ্ছিন্ন করার মত অত সময় তখন নেই। কিন্তু হঠাৎ পেয়ে গেল গিরার মুখটা। গিরার বাইরে দুই তারের বাড়তি অংশে গিয়েই তার হাত পড়েছিল। সংগে সংগেই বিল্লাহ সেই বাড়তি অংশটুকু ডান হাতে ধরে জোরে টান দেয় এবং আলগা হয়ে উঠে আসা তারের ভেতর বাম হাতের চার আঙুল ঢুকিয়ে তারকে টেনে ধরে। সঙ্গে সঙ্গেই ডান হাতের চার আঙুলও বাম হাতেদের

আঙুলের সাথে গিয়ে যোগ হয়। তারপর 'রেডি ভাইয়া' বলে তীব্র একটা হ্যাচকা টানে ছিড়ে ফেলল রাবারের দড়ি।

হাতের বাঁধন খুলে গিয়েছিল আহমদ মুসার। কিন্তু পায়ের বাঁধন তখনও বাকি। খুলে যায় এই সময় দরজা। উজ্জ্বল আলোয় ভরে যায় ঘর।

হুড়মুড় করে পাশাপাশি দ্রুত হেঁটে দুজন কারবাইন বাগিয়ে ঘরে ঢোকে। তাদের পেছনে আরও দুজন এসেছিল। তারা কারবাইন বাগিয়ে পূর্ব থেকে পাহারায় থাকা দুজনের সাথে দরজা আগলে দাঁড়ায়।

দরজা খোলার আগেই আহমদ মুসা শুয়ে পড়েছিল হাত দুটি পিঠের তলায় নিয়ে, যেন বুঝা যায় তার হাত বাঁধাই আছে। আর পা বাঁধা তা দেখাই যাচ্ছিল।

কিন্তু বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল বুমেদীন বিল্লাহ। তার হাত-পা খোলা।

ঘরে ঢুকেই একজন চিৎকার করে ওঠে, 'একশালা বাঁধন খুলে ফেলেছে।'

ঘরে ঢুকে দুজনই বুমেদীন বিল্লাহর দিকে এগোয়। তারা যাচ্ছিল আহমদ মুসার পাঁচ ছয় ফুট দূর দিয়ে।

আহমদ মুসার দেহটা কাত হয়ে নড়ে ওঠে, যেন সে ওদের ভালো করে দেখতে চাচ্ছে।

হঠাৎ আহমদ মুসার দুহাত পিঠের তলা থেকে বেরিয়ে আসে এবং তার দুপা তীরের মত ছুটে গিয়ে আঘাত করে বিল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়া লোক দুজনের হাঁটুর নিচটায়।

ওরা আকস্মিক এই আঘাতে চিৎ হয়ে উল্টে পড়ে যায়। ওরা আহমদ মুসার পাশেই পড়েছিল। আর ওদের একজনের কারবাইন ছিটকে এসে আহমদ মুসার উপর পড়ে।

আহমদ মুসা লুফে নিয়েছিল কারবাইনটা। চোখের পলকে ব্যারেল ঘুরিয়ে নেয় সে দরজায় দাঁড়ানো চারজনের দিকে। ওরাও কি ঘটছে দেখতে পেয়েছিল। প্রথমটায় একটা বিমূঢ় ভাব তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আহমদ মুসাকে কারবাইন তাক করতে দেখে তারা সম্বিত ফিরে পায়। তারাও ঘুরাতে যায়

তাদের ষ্টেনগানের নল। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাদের ষ্টেনগানের ব্যারেল ঘুরে আসার আগেই আহমদ মুসার গুলীবৃষ্টির শিকার হয় তারা। দেহগুলো ঢলে পড়ে দরজার উপর।

ওদিকে মেঝেয় পড়ে যাওয়া দুজনের একজন গড়িয়ে দ্বিতীয় ষ্টেনগানটার দিকে এগুচ্ছিল। অন্যজন এগুচ্ছিল আহমদ মুসার দিকে।

বুমেদীন বিল্লাহ ছুটে গিয়ে ষ্টেনগানটা আগেই হাত করে নেয় এবং ষ্টেনগানের ব্যারেল ঘুরিয়েই গুলী করে ওদের দুজনকে। আহমদ মুসাও তার ষ্টেনগানের ব্যারেল ঘুরিয়ে নিয়েছিল। বিল্লাহ গুলী করে ওদের দুজনকে লক্ষ্য করে।

'ধন্যবাদ বিল্লাহ, ওয়েলডান।' বলে আহমদ মুসা উঠে বসে এবং পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে।

আহমদ মুসা ও বিল্লাহ দুজনে দুটি রিভলবার এবং আরও দুটি কারবাইন কুড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে।

ছুটছিল আহমদ মুসারা করিডোর ধরে। এখন তাদের কাছে এখান থেকে বের হওয়াটাই একমত্র লক্ষ্য। আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছে, এই পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানী হাইম হাইকেলকে খোঁজা যাবে না। বের হবার জন্যে আহমদ মুসারা 'এক্সিট' সাইন দেখে সামনে দৌড়াচ্ছে।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ এক সময় আহমদ মুসার মনে হলো কেউ আর বাধা দিতে আসছে না কেন! বন্দীখানা থেকে বের হবার পর করিডোরের প্রথম মোড়টাতেই শুধু দুপাশ থেকে আসা প্রহরীদের বাধার সম্মুখীন হয়েছে তারা। তারপর থেকে তারা সামনে এগুচ্ছেই। কিন্তু কোন দিন থেকেই বাধা আসছে না, প্রতিরোধ আসছে না।

করিডোরটা একটা ঘরে এসে প্রবেশ করল।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল আহমদ মুসা। দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠল, 'বিল্লাহ, আমরা নিশ্চিতই ট্রাপে পড়ে গেছি। এক্সিট আসলে............।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারলো না। মেঝেটা তাদের পায়ের তলা থেকে সরে গেল। পাকা ফলের মত তারা পতিত হলো। গিয়ে আছড়ে পড়ল একটা শক্ত মেঝেতে। শব্দটা ফাঁপা ধরনের।

মেঝে শক্ত হলেও আহমদ মুসাদের তেমন একটা লাগেনি। যে উচ্চতা থেকে পড়েছে তা চৌদ্দ পনের ফুটের বেশি হবে না।

শক্ত মেঝেটাতে পড়ার সংগে সংগেই একটা ঝাঁকুনি খেল তারা। তার সাথে উঠল শব্দ। ইঞ্জিন ষ্টার্টের শব্দ।

আহমদ মুসা বুঝল এবং চারদিকে তাকিয়েও দেখল তারা একটা গাড়ির মেঝেতে এসে পড়েছে। তারা পড়ার সময় গাড়িতে ছাদ ছিল না। কিন্তু তারা পড়ার সাথে সাথেই দুপাশ ও পেছন থেকে ষ্টিলের দেয়াল উঠে এসে উপরটা ঢেকে দিয়েছে।

'আমরা একটা গাড়িতে পড়েছি বিল্লাহ। এ গাড়িটাও একটা ফাঁদ।' আহমদ মুসা বলল।

গাড়িটা তখন তীব্র গতিতে চলতে শুরু করেছে।

'ঠিক ভাইয়া। গাড়িটাও একটা ট্রাপ। আমাদের কোথাও নিয়ে যাচ্ছে।'

'আরেক বন্দীখানায় নিশ্চয়।' গাড়িটার চারদিক পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলল আহমদ মুসা।

দেখল আহমদ মুসা, তারা যে ফ্লোরের উপর বসে আছে সেটা অল্প দুলছে। পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে, এটা স্প্রিং-এর উপর রয়েছে। অবাকই হলো আহমদ মুসা। গাড়ি স্প্রিং-এর উপর থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু ফ্লোর আলাদাভাবে স্প্রিং-এর উপর থাকাটা তার কাছে একেবারেই নতুন। কেন? এর কোন ফাংশন আছে?

উপরে যে ঢাকনাটা গাড়ির ছাদে পরিণত হয়েছে, তার দুপাশে দুটি হাতল। মাথার উপর হাত বাড়ালেই মাথার উপরের ঢাকনাটা পাওয়া যায়। ভাবল খোলার এটা একটা ম্যানুয়াল ব্যবস্থা হতে পারে।

মেঝের উপর আরেক দফা চোখ বুলাতে গিয়ে আহমদ মুসা আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করল। মেঝেটা লম্বালম্বি দুভাবে বিভক্ত। মাঝ বরাবর দুঅংশের

জোড়। জোড়টা আলগা মনে হলো আহমদ মুসার কাছে। জোড়টা লম্বালম্বির দুপ্রান্তে অস্পষ্ট হলেও ঘর্ষণের দাগ দেখতে পেল আহমদ মুসা। ভ্রুকুঞ্চিত হলো তার। স্প্রিং-এর কারণে উঁচু-নিচুঁ হবার ফলে এ দাগ হয়নি। আরও বড় ধরনের কোন আঘাতের ফলেই এ দাগ সৃষ্টি হতে পারে। কি সে আঘাত? ভাবছিল আহমদ মুসা।

'কি দেখছেন ভাইয়া? গুরুত্বপূর্ণ কিছু?' বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

'বিল্লাহ আমার মনে হচ্ছে, গাড়ির উপরের ঢাকনার মত গাড়ির এ ফ্লোরটাও স্থানান্তরযোগ্য।' বলল আহমদ মুসা।

'তার মানে? ঢাকনা যেমন সরে গিয়ে আমাদের গ্রহণ করেছে, তেমনি এ ফ্লোরও কি সরে গিয়ে আমাদের ফেলে দেবে?' বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

বিস্ময়-বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসা বিল্লাহর দিকে। পরক্ষণেই তার চোখে বিস্ময়ের বদলে দেখা দিল এক ঝলক আনন্দ। বলল, 'তুমি ঠিক বলেছ বিল্লাহ। তোমাকে ধন্যবাদ। আমি তাৎপর্য খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সত্যিই তুমি যা বলেছ, তার বাইরে আর কোন অর্থ দেখা যাচ্ছে না।'

একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলে উঠল, 'ঢাকনা খোলা ছিল আমাদের গ্রহণ করে নিয়ে আসার জন্যে, তাহলে ফ্লোর খুলবে কি আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে যাবার জনে?'

'সেটা কি হবে নতুন বন্দীখানা?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'বিল্লাহ, তুমি সাংবাদিক থেকে একেবারে গোয়েন্দা বনে যাচ্ছ।' আহমদ মুসা বলল।

বুমেদীন বিল্লাহ কিছু বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ গাড়িটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল।

ঝাঁকুনির সাথে সাথেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছে।

উঠে দাঁড়াবার সাথে সাথেই সে অনুভব করল পায়ের তলার মেঝে নড়ে উঠেছে।

সংগে সংগে আহমদ মুসা চিৎকার করে উঠল, 'বিল্লাহ ফ্লোর নেমে যাচ্ছে। সাবধান গাড়ি ছেড় না।'

বলেই আহমদ মুসা এদিক ওদিক তাকিয়ে ডান হাত বাড়িয়ে গাড়ির ছাদের ডান দিকের হাতলটি ধরে ফেলল।

বুমেদীন বিল্লাহ বসেছিল। সাবধান হবার সুযোগ নিতে পারেনি। শেষ মুহূর্তে পড়ে যাবার সময় কোন অবলম্বন না পেয়ে আহমদ মুসার একটি পা দুহাতে জড়িয়ে ধরল।

আহমদ মুসা ডান হাত দিয়ে হাতলের উপর ঝুলে পড়েছিল। বিল্লাহ ঝুলে পড়ল আহমদ মুসাকে ধরে।

ছোট দুটি স্ক্রুতে আটকানো হাতলের পক্ষে দুজনের ভার বহনের শক্তি ছিল না। আহমদ মুসার হাত অনুভব করল হাতল ঢিলা হয়ে যাচ্ছে। আহমদ মুসা চিৎকার করে বিল্লাহর উদ্দেশ্যে বলল, 'তাড়াতাড়ি আমার গা বেয়ে উঠে এসে বাঁ দিকের হাতলটি ধর। এ হাতলটি খসে যাচ্ছে। আহমদ মুসাও বাম হাত দিয়ে বাঁ দিকের হাতল ধরার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না।

বিল্লাহ একবার তাকাল উপর দিকে। তারপর আহমদ মুসাকে ছেড়ে দিল। পড়তে লাগল সে নিচের দিকে।

আহমদ মুসা নিচের দিকে তাকিয়ে 'বিল্লাহ' বলে চিৎকার করে উঠল। তারপর নিজেও তার হাত ছেড়ে দিল হাতল থেকে।

কিন্তু বিল্লাহ পড়ে যাওয়ার পরক্ষণেই গাড়ির ফ্লোর আবার উঠে আসতে শুরু করেছে। উঠে আসা ফ্লোরে আহমদ মুসার দেহ আটকে গেল।

আহমদ মুসার মুখ বেদনায় নীল হয়ে উঠেছে। গাড়ির ষ্টিলের ফ্লোরে একটা মুষ্ঠাঘাত করে বলল, 'ও আল্লাহ, বিল্লাহ একা কোথায় গেল!'

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল কিন্তু গাড়িটা আবার ভীষণ বেগে পেছন দিকে যাত্রা শুরু করল।

আহমদ মুসা বুঝল গাড়িটা যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ফিরে যাচ্ছে। আরও বুঝল, গাড়িটা নিশ্চয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলছে। তা না হলে সে পড়ে যায়নি এটা জানার পর গাড়ি এভাবে ফেরত যেত না এবং আবার ফ্লোর নামিয়ে দিয়ে তাকেও ফেলার চেষ্টা করত।

উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

গাড়িকে থামানো কিংবা গাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়া যায় কিনা তার উপায় সন্ধান করতে লাগল।

আহমদ মুসা ভাবল, গাড়িটা স্বয়ংক্রিয় হলে অবশ্যই তা কতকগুলো অবস্থা বা সময়-সীমা দ্বারা পরিচালিত হয়। সেগুলো কি?

তারা যখন গাড়ির মেঝেতে আছড়ে পড়ে, তখন দুপাশ থেকে ঢাকনা এসে গাড়িকে ঢেকে দেয় এবং গাড়িও ষ্টার্ট নেয়। তাদের আছড়ে পড়া, গাড়ি ঢাকনায় ঢেকে যাওয়া এবং ষ্টার্ট নেয়া কি একে-অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত? আবার গাড়ি তার লক্ষ্যে পৌছে যাওয়ার পর গাড়ির ফ্লোর খুলে যাওয়া, আবার বন্ধ হওয়া এবং গাড়ি ষ্টার্ট নেয়ার বিষয়টা নিশ্চয় নির্ধারিত প্রোগ্রাম ও সময়-সীমার সাথে সম্পর্কিত।

আহমদ মুসা গাড়ির ঢাকনার দুটি হাতলের কথা ভাবল। হাতল রাখার মধ্যে নিশ্চয় বড় কোন তাৎপর্য আছে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবল, হাতলের উপর ঝুলেই তো সে একবার বেঁচেছিল। কিন্তু ঢাকনা তো খুলে যায়নি। আবার ভাবল, দুহাতল একসাথে ধরে সে একটা চেষ্টা করতে পারে।

চিন্তার সাথে সাথেই আহমদ মুসা দুহাত বাড়িয়ে দুপাশের দুটি হাতল ধরে ঢাকনার উপর চাপ সৃষ্টির জন্যে ঝুলে পড়ল।

সংগে সংগেই ঢাকনাটি গুটিয়ে গিয়ে ইঞ্জিন ও ক্যারিয়ারের মাঝখানে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসা আছড়ে পড়ল ক্যারিয়ারের সামনের প্রাচীরের উপর। তার দুটি হাত ঢাকনার ফাঁকে পড়ে থেঁথলে গেল।

কিন্তু সে দেখল গাড়িটা থেমে গেছে।

গাড়ি থেমে গেলেও আহমদ মুসা কিছুক্ষণ নড়তে পারলো না আছড়ে পড়ার ধাক্কা এবং বেদনার নি:সাড় হয়ে যাওয়া দুটি হাত নিয়ে।

শীঘ্রই আহমদ মুসা শরীরটাকে টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রথমেই চোখ পড়ল ড্রাইভিং বক্সের দিকে। যেখানে ড্রাইভিং সিট বা ড্রাইভার কিছুই দেখল না। আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো গাড়িটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে কম্পিউটারাইজড প্রোগ্রাম অনুসারে।

দ্রুত তাকাল দুপাশের দিকে। দেখল একটা সুড়ঙ্গের দক্ষিণ পাশ ঘেঁষে রেল। তার উপরে দাঁড়ানো গাড়িটা। আর উত্তর দিকে দিয়ে মসৃণ একটা পথ, ফুটপাথ বলা যায়, রাস্তাও বলা যায়। দুটো গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে।

আহমদ মুসা দিকটা ঠিক করলো অনুমানের উপর। আহমদ মুসার ধারণা সুড়ঙ্গটা ডেট্রোয়েট ডেট্রোয়েট নদীর দিকে চলে গেছে। আর ডেট্রোয়েট নদীটা নগরীর পূর্ব প্রান্ত ঘেঁষে।

আহমদ মুসা লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল। সে মাটিতে পড়ার আগেই গাড়ি ছুটতে শুরু করেছে। গাড়ির ফোল্ড হওয়া ঢাকনাটাও উঠে এসে ঢেকে দিয়েছে গাড়িটাকে।

বুঝল আহমদ মুসা, নামার জন্যে যখন সে ডান পা উপরে তোলে তখন বাম পায়ের একটা বাড়তি চাপ পড়েছিল গাড়ির মেঝের উপর। সেই চাপেই গাড়িটা ষ্টার্ট নিয়ে থাকতে পারে। আর গাড়ি চলার সাথে নিশ্চয় সম্পর্ক আছে ঢাকনা গাড়িটাকে ঢেকে দেয়ার।

আহমদ মুসা লাফ দিয়ে নেমেই ছুটল যে দিক থেকে এসেছিল সেই দিকে। বিল্লাহর কি অবস্থা হয়েছে কে জানে! তাকে উদ্ধারই এখন প্রথম কাজ।

দশ মিনিট দৌড়াবার পর এক জায়গায় এসে তাকে থমকে দাঁড়াতে হলো। সামনে সুড়ঙ্গ জুড়ে ষ্টিলের দেয়াল। বাম দিকে তাকিয়ে দেখল, গাড়ি চলার রেলটি ষ্টিলের দেয়ালের ভেতরে ঢুকে গেছে। আহমদ মুসা বুঝল, ষ্টিলের দেয়াল খোলা যায়। নিশ্চয় এ জন্যে কোন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আছে।

আহমদ মুসা একটু এগিয়ে টোকা দিল দেয়ালের গায়ে। একদম নিরেট ষ্টিলের দেয়াল। দেয়ালের গা সহ উপর নিচে অনেক খোঁজাখুঁজি করল দেয়াল সরিয়ে দেয়া বা দেয়ালে দরজা খোলার কোন ক্লু পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। ভাবল আহমদ মুসা, হতে পারে রেলের উপর, গাড়ির চাপের সাথে সম্পর্কিত কোন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আছে।

উদ্বিগ্ন হলো আহমদ মুসা। ভেতরে ঢুকতে না পারলে খুঁজবে কি করে বুমেদীন বিল্লাহকে। সে বিপদে পড়েনি তো! যেখানে সে পড়েছে, সেটা নিশ্চয় আন্ডার গ্রাউন্ড বন্দীখানা। বন্দীখানা হওয়ার অর্থ লোকজন সেখানে আছে।

তাদের হাতেই সে এখন পড়েছে। তারা বিল্লাহর উপর চরম কিছু কি করবে? শংকিত হলো আহমদ মুসা। কিন্তু ভাবল আবার, আহমদ মুসাকে না পাওয়া পর্যন্ত বিল্লাহকে তারা কিছু করতে নাও পারে।

গাড়ির রেল ট্রাক থেকে উত্তর পাশের রাস্তায় উঠে আসার জন্যে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। ঠিক এ সময়ই আহমদ মুসা অনুভব করল তার পায়ের তলার মাটি কাঁপছে।

কি কারণে মাটি কাঁপছে? জেনারেটর চলা, গাড়ি চলা ইত্যাদি নানা কারণে মাটি কাঁপতে পারে। তাহলে আবার সেই গাড়ি ফেরত আসছে না তো?

চিন্তার সাথে সাথেই আহমদ মুসা রাস্তার উপর শুয়ে পড়ে রেল-এর উপর কান পাতল। রেলের উপর গাড়ির চাকার ঘর্ষনের স্পষ্ট শব্দ শুনতে পেল আহমদ মুসা।

গাড়ি ফিরে আসছে নিশ্চিত হলো আহমদ মুসা। কিন্তু কেন ফিরে আসছে? ধরা পড়া বন্দীদের কাছে আসছে? সে ধরা পড়েনি এটা নিশ্চয় ওরা জেনে ফেলেছে এবং তাকে খোঁজার জন্যেই ওরা আসছে?

যা হোক, এখন তাকে লুকাতে হবে। কিন্তু কোথায়?

চারদিকে চোখ বুলাল আহমদ মুসা। লুকানোর মত আশ্রয় কোথাও নেই। অথচ কিছুতেই ওদের চোখে পড়া যাবে না।

অবশেষে রেল লাইনটার পাশে মরার মত পড়ে থাকার কথা চিন্তা করল। তাতে সহজে ওদের চোখে পড়লেও আকস্মিক আক্রমণ করার একটা সুযোগ থেকে যাবে।

চিন্তার সাথে সাথেই আহমদ মুসা রেল লাইনটার পাশে সটান শুয়ে পড়ল। ছুটে আসছে গাড়ি।

কান খাড়া করে চোখ বন্ধ করে নিঃসাড়ে পড়ে আছে আহমদ মুসা। শব্দ শুনে যখন মনে হলো গাড়ি দৃষ্টি সীমার মধ্যে পৌছেছে, তখন আস্তে মাথাটা একটু কাত করে সামনে তাকাল।

গাড়ি দেখতে পেল সে। গাড়িটা খোলা নয়, ঢাকা।

খুশিতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। গাড়িতে যারা আসছে, তারা তাকে দেখতে পাবে না। বরং সে এখন ভেতরে ঢোকার জন্যে এই গাড়ির সাহায্য নিতে পারে।

গাড়ির রেল লাইন থেকে ফুট তিনেক সরে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

পরিকল্পনা ঠিক করে নিয়েছে সে।

গাড়ি এই দেয়ালের কাছে এসে যে থামবে না সেটা সেটা জানে। তারা আসার সময় এখানে গাড়ি থামেনি। বন্দীদের নামিয়ে দেবার জন্যে বন্দীখানার উপরে গিয়েই প্রথম থেমেছিল।

গাড়ি এসে গেছে। আহমদ মুসা রেল লাইনটার পাশ বরাবর সামনে এগিয়ে দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। গাড়ি তখনও দশ বারো ফুট দূরে।

আহমদ মুসার পাশ থেকেই দেয়ালের একটা অংশ নিঃশব্দে উপরে উঠে গেল। যে দরজাটা উন্মুক্ত হলো তা গাড়িটা সহজভাবে ঢোকার জন্য যথেষ্ট। দরজা খোলার সেকেন্ডের মধ্যেই গাড়িটা ঢুকে গেল ভেতরে।

দরজার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল আহমদ মুসা। গাড়িটা ঢুকে যাওয়ার পর মুহূর্তেই আহমদ মুসা চোখের পলকে দেয়ালের এপার থেকে ওপারে ঢুকে গেল। ঢুকেই ভেতরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। তার সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

বাহির থেকে ভেতরটা একেবারেই আলাদা। বর্গাকৃতির বিশাল ঘর। মেঝেতে দামী পাথর বিছানো। অবশিষ্ট তিনটি দেয়ালেই দরজা।

ঘরের উত্তর দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়িটা। উত্তর দেয়ালেও একটা দরজা। সবগুলো দরজাই বন্ধ। ঘরে লুকানোর কোন আড়াল নেই।

গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়তে দেখেই আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে গাড়ির ওপাশের দেয়াল ও গাড়ির চাকার মাঝখানে আশ্রয় নিল।

আহমদ মুসা হাঁটু গেড়ে বসে সবে উপর দিকে তাকাল। দেখল, একটা অস্পষ্ট শীষ দেয়ার শব্দ করে গাড়ির উপরের কভার সরে গেল। গাড়ির মেঝেতে বসা একজনের মাথার হ্যাট নজরে পড়ল আহমদ মুসার। তাড়াতাড়ি আহমদ মুসা গাড়ির তলে সরে গেল।

'জন, চল নেমে পড়ি।' গাড়ির মেঝে থেকে একজনের কণ্ঠ শোনা গেল।

‘চল, মিখাইল। কিন্তু জ্যাকের তো এতক্ষণে এখানে পৌছার কথা। এদিকটা একবার দেখে আমরা ওদিকে যেতে পারি। হারামজাদাটা লুকালো কোথায়, তাকে তো পেতে হবে!’ বলল জন নামের লোকটি।

‘চিন্তা নেই, ছোটটাকে তো পাওয়া গেছে। তার মুখ থেকেই সব কথা বেরুবে। চল।’ মিখাইল নামের লোকটি বলল।

বলে মিখাইল নামের লোকটি নিচে লাফিয়ে পড়ল।

‘হ্যাঁ তা তো দেবেই।’ নিচ থেকে বলল মিখাইল।

আহমদ মুসা গাড়ির নিচে মেঝে দিয়ে সাপের মত এগুচ্ছে মিখাইলের দিকে। এগুবার সময় ভাবল, গাড়ির নিচের এই মেঝেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা আছে। এদিক দিয়েই কিছুক্ষণ আগে বুমেদীন বিল্লাহ পড়ে গেছে। এ পর্যন্ত ভাবতেই তার বুকটা ধক করে কেঁপে উঠল মিখাইলের কথায়। বুমেদীন বিল্লাহ তাহলে এখন ওদের হাতে! বিল্লাহকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যেই এরা তাহলে এসেছে!

এটা চিন্তা করে নতুন করে সে ভাবল, বিল্লাহর কাছে পৌছা পর্যন্ত এদের ফলো করা উচিত হবে। এর আগে সে ভেবেছিল এদের দুজনকে কাবু করে গাড়ির কাছে রেখে দিয়ে সে বিল্লাহর সন্ধানে যাবে। এ সিদ্ধান্ত নিয়েই সে মিখাইলের দিকে এগুচ্ছিল। গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামল জনও।

দুজনে এগুলো পুবের দরজার দিকে। আহমদ মুসার দুচোখ তাদের অনুসরণ করল। ওরা দুজন গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল।

ওদের একজন গিয়ে দরজার বাম পাশের দেয়ালে লম্বালম্বি আয়তাকার একটা প্যানেলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কালো বোর্ডের উপর সাদা ‘কী’ ডিজিটগুলো জ্বল জ্বল করছে। প্যানেলের সাইজ দেখে আহমদ মুসা ধরে নিল ওটা আলফাবেটিক্যাল প্যানেল হবে।

লোকটি তার তর্জনি দিয়ে প্যানেলের ‘কি’ গুলোতে টোকা দিতে লাগল। টোকা শেষ হতেই দরজা খুলে গেল।

ওরা দরজা দিয়ে ওপারে ঢুকে গেল। আর সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে যখন দরজার কাছে দাঁড়াল, তার আগেই দরজা বন্ধ হওয়ার ক্লিক শব্দ বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

আহমদ মুসা দ্রুত গিয়ে প্যানেলের কাছে দাঁড়াল।

লোকটির নক করা দেখেই আহমদ মুসা জেনে ফেলেছে যে, সে কিবোর্ডে 'DAVID' টাইপ করেছে। অর্থাৎ 'DAVID' দরজার খোলার 'পাস ওয়ার্ড'।

আহমদ মুসা দ্রুত 'DAVID' টাইপ করল কি বোর্ডে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল।

আহমদ মুসা উঁকি দিল দরজা দিয়ে। দেখল, ওরা ডান দিকে করিডোর ধরে এগুচ্ছে। দুদিকে চকিতে একবার চেয়েই আহমদ মুসা বুঝল, করিডোরটি এ ঘরকে তিন দিক থেকে বেষ্টন করে আছে। করিডোরের ওপাশ দিয়ে ঘরের সারি।

আহমদ মুসা কাঁধ থেকে কারবাইনটা হাতে নিয়ে বিড়ালের মত ওদের পেছনে ছুটল।

ওরা দুজন প্রথমে পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে কিছুটা এগিয়ে উত্তরমূখী আরেকটা করিডোর ধরে এগিয়ে চলল।

ওদের পিছে পিছে এগুচ্ছে আহমদ মুসা।

একটা ছোট করিডোরের বাঁকে বসে পড়ল আহমদ মুসা। বাঁক ঘোরার অপেক্ষা করছে সে। অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রপাতের মত গলার দুপাশ দিয়ে দুটো হাত এসে তাকে চেপে ধরল।

সবটুকু মনোযোগ সামনে দিতে গিয়ে পেছনের ব্যাপারে সাবধান হয়নি আহমদ মুসা। এখন কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারল সে। বুঝল, এই অবস্থায় সামনে-পিছনে দুদিক সামলানো তার পক্ষে সম্ভব হবে না। আক্রান্ত হয়েও আহমদ মুসা তাই আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ না করে তার কারবাইন তুলে গুলী বৃষ্টি করল সামনের দুজনকে লক্ষ্য করে।

আক্রমণকারীর দুটি হাত তখন আহমদ মুসার গলায় চেপে বসেছে। কারবাইনটা তখনও আহমদ মুসার হাতে। কিন্তু আক্রমণকারীকে তার কারবাইনের নলের আওতায় আনার অবস্থা তখন আহমদ মুসার নেই। গলা থেকে মাথা পর্যন্ত অংশ প্রায় অকেজো হয়ে পড়ছে। শ্বাস নালীর উপর চাপ পড়ায়

শরীরের সক্রিয়তাও কমে যাচ্ছে। বুক, চোখ ও মাথার উপর চাপ কষ্টকর হয়ে উঠছে। বাঁচার জন্যে কিছু করার সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে।

শেষ সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করতে চাইল আহমদ মুসা। সে সবটুকু দম একত্রিত করে দুহাতে আক্রমণকারীর জ্যাকেটের কলার জাপ্টে ধরে পা থেকে কোমর পর্যন্ত ঠিক খাড়া রেখে কোমর বাঁকিয়ে মাথা নিচে ছুড়ে দিয়ে ধনুকের মত বাঁকিয়ে নিয়ে এল।

আহমদ মুসার এ কাজটা ছিল তীব্র গতির এবং আকস্মিক। লোকটার পেছনটা আহমদ মুসার উপর দিয়ে ঘুরে এসে মাটিতে পড়ল।

লোকটির দুহাত আহমদ মুসার গলা থেকে আলগা হলো বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে আহমদ মুসার গলা জড়িয়ে ধরল।

ততক্ষণে আহমদ মুসার বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়া হয়ে গেছে।

লোকটি আধা শোয়া অবস্থায় তার দুহাত আহমদ মুসার ঘাড়ে লক করে আহমদ মুসাকে মাটিতে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল।

আহমদ মুসা উবু অবস্থায় ছিল। সে দুপা প্রসারিত করে লোকটির ঘাড়ে লাগিয়ে একদিকে সে লোকটির দেহ পেছন দিকে পুশ করল, অন্যদিকে নিজের কাঁধ নিজের পেছন দিকে সজোরে ঠেলে দিল।

লোকটির দুহাত খসে গেল আহমদ মুসার কাঁধ থেকে।

হাত থেকে পড়ে যাওয়া কারবাইনটা পাশেই পড়ে ছিল। আহমদ মুসা দ্রুত তা কুড়িয়ে নিল এবং কারবাইনের নল ঘুরিয়ে নিল লোকটির দিকে।

লোকটিও তার হাত ছুটে যাবার সাথে সাথে উঠে দাঁড়াচ্ছিল। আহমদ মুসাকে কারবাইন হাতে নিতে দেখে সেও পকেট থেকে বের করে নিয়েছিল রিভলবার। তার রিভলবার ধরা হাত উঠে আসছিল।

কিন্তু গুলী করার সময় সে পেল না। তার আগেই আহমদ মুসার কারবাইনের গুলীতে তার বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

গুলী করেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল এবং কারবাইনটা বাগিয়ে ধরে ছুটল জন-মিখাইলরা যে দিকে যাচ্ছিল সেদিকে। জন ও মিখাইলের লাশ ডিঙাবার সময় দেখল তাদের কেউই বেঁচে নেই।

ওদের লাশ ডিঙাবার পরই করিডোরের একটি বাঁকে গিয়ে পৌছল। তার সামনে মানে উত্তরে এগোবার পথ বন্ধ। সে পূর্ব-পশ্চিম লম্বা সরল রেখার মত একটা করিডোরের মুখোমুখি।

কোনদিকে যাবে? বুমেদীন বিল্লাহকে কোথায় তারা রেখেছে? ঠিক এই সময়ে আহমদ মুসার নজরে পড়ল করিডোরের পশ্চিম দিক থেকে পাঁচ ছয়জন ছুটে আসছে করিডোর ধরে। ওদের প্রত্যেকের হাতেই কারবাইন।

আহমদ মুসা এক ধাপ পেছনে হটে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়াল। ওদের পায়ের শব্দের দিকে উৎকর্ণ হয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

ধীরে ধীরে ওদের পায়ের শব্দ নিকটতর হচ্ছে, ক্রমেই বাড়ছে ওদের পায়ের শব্দ। একেবারে কাছে এসে গেছে ওরা। হঠাৎ ওদের পায়ের শব্দ থেমে গেল। ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। ওরা দাঁড়াল কেন?

ব্যাপার কি দেখার জন্যে অতি সন্তর্পণে মুখটা সামনে এগিয়ে উঁকি দিল।

উঁকি দেবার সাথে সাথেই এক ঝাঁক গুলী ছুটে এল তার দিকে।

মাথা সরিয়ে নিয়েছে আহমদ মুসা। এক ঝাঁক গুলী তার মাথার কয়েক ইঞ্চি সামনে দিয়ে ছুটে গেল। মাথা সরিয়ে নিতে মুহূর্ত দেরি হলে তার মাথা ছাতু হয়ে যেত।

উঁকি দিয়ে প্রথম দৃষ্টিতেই আহমদ মুসা দেখতে পেয়েছে ওরা দাঁড়িয়ে নেই, শিকারী বাঘের মত এক ধাপ এক ধাপ করে নিঃশব্দে তার দিকে এগুচ্ছে।

এর অর্থ ওরাও আহমদ মুসাকে দেখতে পেয়েছে, এ বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেল আহমদ মুসার কাছে। তার মানে যুদ্ধ সামনে।

আহমদ মুসা কারবাইনের ট্রিগারে হাত রেখে দেয়ালে পাজর ঠেস দিয়ে কৌশল নিয়ে ভাবছে।

এ সময় ওদিক থেকে গুলী শুরু হয়ে গেল। গুলী আসছে অবিরাম ধারায়। গুলীর এক অংশ দেয়ালের কোনায় এসে বিদ্ধ হচ্ছে। বেশীর ভাগই দেয়ালের পাশ দিয়ে গিয়ে করিডোরের বিপরীত দিকের দেয়ালকে বিদ্ধ করছে।

এভাবে অনর্থক পাগলের মত গুলী বর্ষণ করে চলার অর্থ কি? নিজেকেই এ প্রশ্ন করল আহমদ মুসা। পরক্ষণেই উত্তর তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

আসলে ওদের মতলব হলো, আহমদ মুসা যাতে আক্রমণের সুযোগই না পায় এজন্যেই ওদের অব্যাহত আক্রমণ। তাদের এখনকার অনর্থক আক্রমণই এক সময় অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। এখন যে গুলী কৌণিকভাবে আসছে, তা সমান্তরালে আসতে শুরু করলেই আহমদ মুসা গুলী বৃষ্টির মুখে অনাবৃত হয়ে পড়বে।

এই সুযোগ আহমদ মুসা তাদের দিতে পারে না। কিন্তু কোন পথে এগুবে সে।

এই আক্রমণের মধ্যেও তাকে পাল্টা আক্রমণের জন্যে একটা ফাঁক বের করতে হবে।

আহমদ মুসা লক্ষ্য করে দেখল ছুটে আসা গুলীর ¯্রােত সীমাবদ্ধ আছে এক ফুট থেকে চার ফুট উচ্চতার মধ্যে। নিচের এক ফুট মাত্র তার জন্যে নিরাপদ জোন। এটাই তার পাল্টা আক্রমণের জন্য সুড়ঙ্গ পথ।

আহমদ মুসা শুয়ে পড়ে সাপের মত এগুতে লাগল সামনে। করিডোরটির মুখে দেয়ালের শেষ প্রান্তে গিয়ে থামল আহমদ মুসা। ভাবল, সুযোগের এই সুড়ঙ্গটা মাত্র একবারই ব্যবহার করা যাবে। ওদেরকে বন্দুকের আওতায় আনার দরজা করে দেবে মাত্র একবারের জন্যে। সুতরাং তার প্রথম আক্রমণটা হবে শেষ আক্রমণ।

আহমদ মুসা তার কারবাইনের লোডটা পরীক্ষা করে নিল। তারপর কারবাইনের ব্যারেল ঘুরিয়ে ট্রিগারে হাত রাখল।

প্রস্তুত হয়ে মুখটা দেয়ালের বাইরে বাড়িয়ে দিতে যাবে এই সময় একটা কঠোর নির্দেশ শুনতে পেল পেছন দিক থেকে ‘তোমার খেলা সাঙ্গ শয়তানের বাচ্চা। আগে-পিছনে সবদিক থেকে ঘেরাও। অস্ত্র রেখে উঠে দাঁড়াও, দুহাত উপরে তোল, না হলে কারবাইনের ম্যাগাজিনের সবগুলো গুলী তোমার মাথায় ঢুকিয়ে দেব।’

আহমদ মুসা পেছন দিকে একবার তাকিয়ে অস্ত্র যেখান থেকে তাক করছিল সেখানে রেখেই সে ত্বরিত উঠে দাঁড়ালো দুহাত উপরে তুলে। আহমদ মুসার দুহাত তার মাথার পেছনটাকে আলতোভাবে ছুঁয়ে আছে। তার ডান হাতের মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে আহমদ মুসার রিভলবারের বাট তার ঘাড়ে জ্যাকেটের

একটা পকেটে ঝুলছে। আহমদ মুসার দুচোখ বাজের মত ষ্টাডি করছে সামনের শত্রুকে।

লোকটি হোঁ হোঁ করে হেসে উঠল। তার হাতে কারবাইনের নলটি নাচছিল। লোকটি হাসির সাথে বলল, 'তুমি খুব ঘড়েল আহমদ মুসা। কিন্তু আজ তুমি ব্রিগেডিয়ার শেরিল শ্যারনের হাতে পড়েছ। তোমার সব খেলা খত..........।' কথা শেষ করতে পারলো না ব্রিগেডিয়ার শ্যারন।

আহমদ মুসার ডান হাত মাথার পেছন থেকে কয়েক ইঞ্চি নেমে গিয়ে লুকানো রিভলবার নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। চোখের পলকে ছুটে এসেছিল ব্রিগেডিয়ার শ্যারনকে লক্ষ্য করে।

ব্রিগেডিয়ার শ্যারন দেখতে পেয়েছিল ব্যাপারটা। কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার মুখের। সে দ্রুত ট্রিগারে তর্জনি ফিরিয়ে নিয়ে টার্গেট থেকে নড়ে যাওয়া কারবাইনের ব্যারেল তুলে আনছিল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসার রিভলবারের গুলী তার কপালটাকে গুড়ো করে দিল।

মেঝের উপর ছিটকে পড়ে গেল সে লাশ হয়ে।

গুলী করেই আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার রেখে যাওয়া কারবাইনের কাছে।

ওরা অনেক কাছে চলে এসেছে। ওদের গুলীর এ্যাংগল বদলে গেছে। সমকোণে পৌছতে দেরি নেই। কারবাইনের ট্রিগারে তর্জনি রেখে আহমদ মুসা মুখ বাড়াতে যাচ্ছিল দেয়ালের ওপারে। কিন্তু পারল না। গুলী আসছে এবার মাটি কামড়ে। নিচের যে এক ফুট জায়গা গুলীর বাইরে ছিল, তাও পূরণ হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা পেছনে সরে এল। ভাবল, ওদের কেউ কেউ এখন তাদের গান-ব্যারেল আরও নামিয়ে নিয়েছে।

সামনে এগুনো সম্ভব নয়। আবার চারদিকে তাকালো আহমদ মুসা।

গুলীর এই আয়ত্তের বাইরে কোন উইনডো তাকে পেতে হবে। তা না হলে আক্রমণে যাওয়া যাবে না।

পাশের জানালার দিকে তাকালো আহমদ মুসা। উপরে গেল তার দৃষ্টি।

জানালার কিছু উপরে একই সমান্তরালে করিডোরের দুদেয়ালের মধ্যে কয়েকটি সংযোগ বার।

আহমদ মুসার মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। কারবাইনটা কাঁধে ফেলে চোখের পলকে সে জানালায় উঠে লাফ দিয়ে বার ধরল। এক বার থেকে আরেক বার- এই ভাবে শেষ বারে উঠে বসল আহমদ মুসা। নিচ দিয়ে গুলীর ঢেউ বয়ে যাচ্ছে।

আহমদ মুসা এ ঢেউ ডিঙিয়ে করিডোরের মুখের ওপাশে পৌছতে চাইল নিরাপদ উইন্ডোর সুযোগ নেবার জন্যে।

ওরা এগিয়ে আসছে। সমকৌণিক অবস্থান থেকে তার মাত্র পনের বিশ ডিগ্রি দূরে অবস্থান করছে। তাদের কারবাইনের ব্যারেল আরও ডান দিকে, করিডোরের মুখের দিকে বেঁকে গেছে। করিডোর মুখের বামপাশটা নিরাপদ হয়েছে। কিছু গুলী ওদিকেও যাচ্ছিল সেটা বন্ধ হয়েছে। আহমদ মুসা ওখানেই পৌছতে চায়।

আহমদ মুসা প্রস্তুত হয়ে কারবাইনের ট্রিগারে ডান তর্জনি রেখে বাম হাতে কারবাইনটা আঁকড়ে ধরে বার থেকে লাফিয়ে পড়ল করিডোর মুখের বামপাশের কোণায়।

প্রস্তুত ছিল আহমদ মুসা। মাটিতে পড়েই সে গুলীবৃষ্টি শুরু করল ওদের দিকে।

ওরা বুঝে উঠে তাদের কারবাইনের নল ফিরাবার আগেই ওরা সব লাশ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল করিডোর ধরে পশ্চিম দিকে। লাশগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের একজনের পকেট থেকে মোবাইলের শব্দ শুনল। থমকে দাঁড়াল আহমদ মুসা। সে লাশের পকেট থেকে মোবাইলটি বের করে নিল। অন করে মোবাইলটি সে কানে ধরল।

‘এতক্ষণ দেরি কেন রাস্কেল। শোন, ব্রিগেডিয়ারের মোবাইল কোন সাড়া দিচ্ছে না। অবস্থা সুবিধার মনে হচ্ছে না। আমরা ছোট শয়তানকে নিয়ে ০০৩৩ নাম্বারে ডক্টরের কক্ষে যাচ্ছি। সেখান থেকে ইমারজেন্সী এক্সিট নেব। তোমরা

ওদিকটা দেখ।' আদেশের সুরে ওপ্রান্ত থেকে কথাগুলো এল। তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই ওপার থেকে লাইন কেটে দিল।

'আলহামদুলিল্লাহ!' বলে আহমদ মুসা মোবাইলটি পকেটে পুরে মনে মনে বলল, অন্ধকারে হাতড়ানোর হাত থেকে আল্লাহ বাঁচিয়ে দিয়েছেন। বিল্লাহ এবং ডক্টর হাইকেলকে ঐ ০০৩৩ নাম্বার কক্ষে পাওয়া যাবে নিশ্চয়। দৌড় দিল আহমদ মুসা।

দৌড়ে যাবার সময় ডান পাশের একটা কক্ষের নাম্বার দেখল ০০১৬, আর বাম পাশের ঘরটার নাম্বার দেখল ০০৪৯। মনে মনে হাসল আহমদ মুসা। ডান পাশে ৩৩-এর আগের ১৬ এবং বাম পাশে তেত্রিশের পরের ১৬ টি ঘর রয়েছে। তার মানে করিডোর যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই ৩৩ নাম্বার ঘরটি হয় ডান সারিতে হবে, নয় তো বাম সারিতে। এখন সে চোখ বন্ধ করে দৌড়াতে পারে।

দৌড়াতে দৌড়াতেই আহমদ মুসা আবার ভাবল, বন্দী হবার পর গ্রাউন্ড ফ্লোরের একটা ঘরের নাম্বার ১১১ দেখেছিল। আর বন্দীখানা থেকে বেরিয়ে সামনের একটা ঘরের নাম্বার পড়েছিল ০৭৩। এর অর্থ আহমদ মুসা এখন আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরের দ্বিতীয় বা বটম ফ্লোরে রয়েছে। এখান থেকে এক্সিট মানে গ্রাউন্ডে উঠার পথ। সে পথ কি ০০৩৩-এর সাথে বা কাছাকাছি রয়েছে? করিডোরের শেষ প্রান্তে হবার একটা অর্থ এও হতে পারে।

০০৩৩ নাম্বারটি পেল আহমদ মুসা। কিন্তু ঘরটির কোন দরজা নেই। বাম সারির শেষ ঘর এটি। ০০৩২-এর পর করিডোরের শেষ পর্যন্ত শুধু দেয়াল, দরজা নেই। কিন্তু দেয়ালেল মাঝামাঝি এক জায়গায় ঘরের নাম্বার ০০৩৩ ঠিকই লিখা রয়েছে।

দরজায় এসে আছাড় খাওয়ার মত বিপদে পড়ে গেল আহমদ মুসা। দেয়ালে কোন গোপন দরজা আছে কিনা দেখার চেষ্টা করল আহমদ মুসা। কিন্তু কোন হদিস পেল না।

সময় হাতে নেই। অস্থির হয়ে উঠল আহমদ মুসা।

ফিরে এল ০০৩২ নাম্বার কক্ষের দরজায়। আস্তে নব ঘুরাল দরজার। দরজা খুলে গেল।

খুশি হলো আহমদ মুসা ডুবন্ড লেকের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতই।

ঘরে প্রবেশ করল সে। বিশাল ঘর। আসবাবপত্র শোবার ঘরের মতই।

ঘরের দক্ষিণ দেয়ালে একটা দরজা দেখতে পেল আহমদ মুসা। বাইরের দরজার মতই এর দরজার লক সিষ্টেম।

বিসমিল্লাহ বলে দরজার নব ঘুরাল। খুলে গেল দরজা।

পরের ঘরটাও একই রকম বড়। তবে এ ঘরটি শোবার নয়। অফিস টেবিল ও সারি সারি কম্পিউটার সাজানো ঘরটি।

'না আমি ইনজেকশান নেব না'- চিৎকার করে এই কথা বলার শব্দে চমকে উঠে আহমদ মুসা শব্দের উৎস লক্ষ্যে পশ্চিম দিকে তাকাল। দেখল, ঘরের পশ্চিম দেয়ালে একটা দরজা। দরজাটা আধ-খোলা। দরজার ওপার থেকেই শব্দটা ভেসে এসেছে।

আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। নিশ্চিত সে, ঐ ঘরটাই ০০৩৩ নাম্বার ঘর এবং সে ঘরে ঢোকার তাহলে এটাই দরজা।

চিৎকারটা থেমে যেতেই আরেকটা কণ্ঠ বলে উঠল, 'ডক্টর তুমি সব সময় বল আমি ইনজেকশন নেব না, আর সব সময় ইনজেকশন দিয়েই আমরা তোমাকে ঘুমিয়ে রাখি। এই ঘুম তোমার মৃত্যুর বিকল্প।'

'আমি বাঁচতে চাই না। মরতে চাই আমি। তোমরা মেরে ফেল আমাকে।' অসহায় কণ্ঠে বলল সেই চিৎকার করে কথা বলা লোকটি।

'তুমি একা মরলে আমাদের বিপদ আছে। আহমদ মুসা এবং তোমার পরিবারের সকলের সাথে তোমাকে একত্রে মরতে হবে। এই মৃত্যুর সাথেই তলিয়ে যাবে নাইন ইলেভেন নিউইয়র্কের লিবার্টি টাওয়ার ও ডেমোক্রাসি টাওয়ার ধ্বংসের সকল ইতিহাস।' বলল দ্বিতীয় লোকটি আবার।

আহমদ মুসা বুঝল, ইনজেকশন নিতে না চাওয়া লোকটিই ডক্টর হাইকেল। আর দ্বিতীয় কণ্ঠটি আজর ওয়াইজম্যানেরই কোন লোক।

দ্বিতীয় কণ্ঠ থামতেই ডক্টর হাইম হাইকেল বলে উঠল, 'আহমদ মুসা কে? তার সাথে আমার মৃত্যুর সম্পর্ক কি?'

'তুমি জান না? সে তো সাত সাগর তের নদী পাড়ি দিয়ে এসেছে তোমার কাছে। তোমাকে উদ্ধার করতে। তোমাকে তোমার কনফেশনের পুরষ্কার দিতে।'

বলে একটু থামল লোকটি। তারপর আবার বলে উঠল, 'এই যে হাত বাঁধা পায়ে বেড়ি লোকটিকে দেখল, সে আহমদ মুসার সাথী। এ ধরা পড়েছে। আহমদ মুসাও ধরা পড়তে যাচ্ছে।'

একটু নিরবতা। আবার ডক্টর হাইকেল চিৎকার করে উঠল, 'আমি ইনজেকশন নেব না। আমাকে ইনজেকশন দিও না।'

পরক্ষণেই ক্রুব্ধ কথা শোনা গেল সেই দ্বিতীয় কণ্ঠটির, 'এই তোমরা এস। তোমরা হাত, পা মাথা ভালো করে ধর।'

তারপর চিৎকার ও ধস্তাধস্তির কিছু শব্দ উঠল।

আহমদ মুসা ভেবে নিয়েছে, ডক্টর হাইকেলকে ইনজেকশন দেবার আগেই তাকে উদ্ধার করতে হবে।

আহমদ মুসা তার কারবাইন কাঁধে ফেলে দুহাতে দু'রিভলবার তুলে নিয়েছে।

আস্তে করে দরজা দিয়ে উঁকি দিল আহমদ মুসা। দেখল, একটা খাটে শুয়ে আছে ড. হাইম হাইকেল। দুজনে তার দুহাত খাটের সাথে সেঁটে ধরে আছে। একজন ধরে আছে পায়ের দিকটা। আর একজনের হাতে ইনজেকশন। সে যাচ্ছে ইনজেকশন করতে।

বুমেদীন বিল্লাহ বসে আছে ঘরের মেঝেতে। সে পিছ মোড়া করে বাঁধা। তার পায়েও চেন লাগানো।

আহমদ মুসা ডান হাতের রিভলবার থেকে প্রথম গুলীটা করল ইনজেকশন ধরা হাতটিতে।

তার হাত থেকে ইনজেকশন পড়ে গেল। লোকটির ডান হাতের কব্জিতে গুলী লেগেছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার লোকটি সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল। সেই সাথে তার বাঁ হাত বের করে এনেছে রিভলবার।

বেপরোয়া লোকটির রিভলবার ধরা হাত বিদ্যুত বেগে উঠে আসছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসার ডান হাত তৈরিই ছিল। আরেকবার ট্রিগার টিপল আহমদ মুসা। লোকটি এবার গুলী খেল মাথায়। উল্টে পড়ে গেল সে খাটে, ড.হাইকেলের উপর।

লোকটির লক্ষ্যে ট্রিগার টিপেই আহমদ মুসা দেখল বাকি দুজনই রিভলবার বের করে তাকে তাক করেছে।

শুধু একটা গুলী করারই সময় পেল আহমদ মুসা। ডক্টর হাইকেলের মাথার দিকের লোকটি বুকে গুলী খেয়ে পড়ে গেল।

গুলী করেই আহমদ মুসা নিজের দেহটাকে সরিয়ে নেবার জন্যে বাম দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। ড. হাইকেলের পায়ের দিকে দাঁড়ানো লোকটির নিক্ষিপ্ত গুলী আহমদ মুসার ডান হাতের তর্জনি সমেত হাতের রিভলবারকে আঘাত করল। তার রিভলবার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল এবং তর্জনির বামপাশটা কিছুটা ছিঁড়ে গেল।

আহমদ মুসা বেপরোয়া লোকটিকে আর দ্বিতীয় গুলীর সুযোগ দিল না। মাটিতে পড়ে গিয়েই বাম হাতের রিভলবার থেকে গুলী করল লোকটিকে। লোকটিও তার গুলী ব্যর্থ হয়েছে দেখে তার রিভলবার ঘুরিয়ে নিচ্ছিল আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু তার আগেই বুকে আহমদ মুসার গুলী খেয়ে পড়ে গেল লোকটি।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিল বুমেদীন বিল্লাহকে।

'ওয়া আলাইকুম সালাম। আলহামদুলিল্লাহ, ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন ভাইয়া। ওরা ডক্টর ও আমাকে নিয়ে এখনি চলে যেত। ডক্টর ইনজেকশন নিতে অস্বীকার করায় দেরি হচ্ছিল।' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

'আলহামদুলিল্লাহ। তিনি তাদের এ সুযোগ দেন নি।' বলে আহমদ মুসা তার বাম হাতের রিভলবার দিয়ে গুলী করে বিল্লাহর হাতের হ্যান্ডকাফ এবং পায়ের চেনের লক উড়িয়ে দিল। তারপর এগুলো ডক্টর হাইকেলের দিকে বলল, 'স্যার আপনি ভাল তো?'

ড. হাইকেলের মাথা ভর্তি উস্কো-খুস্কো চুল। মুখভর্তি দাড়ি ও গোঁফ। গায়ের লম্বা কালো কোট ও প্যান্ট বহু ব্যবহারে মলিন। মুখের দুধে-আলতা রংয়ের উপর যেন কুয়াশার ছাপ। কিন্তু চোখ দু'টি উজ্জ্বল। তাতে অনমনীয় দৃঢ়তার ছাপ।

ড. হাইকেল উঠে বসল। তার বিস্ময় দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। তার দুটি চোখ যেন আঠার মত আটকে গেছে আহমদ মুসার উপর। আহমদ মুসার প্রশ্ন যেন সে শুনতেই পায়নি। বলল, 'আপনিই কি আহমদ মুসা? আপনি আমার কাছে, আমাকে উদ্ধার করার জন্যে এসেছেন সাত-সাগর তের নদী পাড়ি দিয়ে?'

'ঠিক উদ্ধার করার জন্যে নয়। আমি এসেছিলাম আপনার কাছে। এসে শুনলাম আপনি নিখোঁজ। অনেক খোঁজ খবর নেয়ার পর বুঝলাম আপনি বন্দী। তারপর শুরু উদ্ধার করার চেষ্টা। আপনার বাড়িতেও গেছি। ওরা সবাই ভাল আছে। আমি ডেট্রয়েটে আসর আগে নিউইয়র্কে আপনার ছেলে বেঞ্জামিন আমার সাথেই ছিল।' বলল আহমদ মুসা।

আনন্দের একটা ঢেউ খেলে গেল ডক্টর হাইকেলের মুখে। তারপর একটু গম্ভীর হলো। বলল, 'বেঞ্জামিন এখন নিউইয়র্কে কেন?'

'ছুটিতে এসেছে। এসে সে সব জানতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেক কৃতজ্ঞতা। কিন্তু আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন? জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেন আমাকে উদ্ধারের চেষ্টা করছেন? ওদের কথা-বার্তায় বুঝেছি, ওদের অনেক লোক মারা গেছে। অনেক আস্তানা ওদের ধ্বংস হয়েছে। আজ বুঝলাম এসব আপনিই করেছেন। কেন করছেন আমি বুঝতে পারছি না।' ডক্টর হাইম হাইকেল বলল।

'সবই জানবেন। সবই বলব। তবে আজ নয়, এ অবস্থায় নয়।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক আছে। আপনি মুসলমান বুঝতে পারছি। কোন দেশের লোক আপনি?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'কোন দেশের নাম করব! একটা দেশে আমি জন্মেছি, যে দেশকে এখন আমার দেশ বললে ভুল হবে। এই হিসেবে কোন

দেশকেই আমি আমার দেশ বলতে পারি না। বলতে পারে, আমি সব দেশের বিশেষ করে সব মুসলিম দেশের আমি নাগরিক।'

ভ্রুকুঞ্চিত হলো ডক্টর হাইম হাইকেলের। ভাবনার চিহ্ন তার চোখে-মুখে। বলল আমি এক আহমদ মুসার কথা পড়েছি পত্র-পত্রিকায়। তিনি বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান। মানুষের সমস্যা ও বিপদ তিনি মাথায় তুলে নেন। তাঁর অনেক সাকসেস ষ্টোরি আমি পড়েছি। তিনি একজন বিপ্লবী নেতাও। আপনি কি সেই আহমদ মুসা?' জিজ্ঞাসা ড. হাইম হাইকেলের।

'হ্যাঁ স্যার। ইনিই তিনি।' বলল দ্রুত বুমেদীন বিল্লাহ আহমদ মুসা মুখ খোলার আগেই।

'আমিও এটাই ভেবেছি। কিন্তু আমি বিস্মিত হচ্ছি, পরম প্রভু ঈশ্বর আমার প্রতি এত দয়া করেছেন! আহমদ মুসাকে পাঠিয়েছেন আমার সাহায্যার্থে! বলে একটু থামল ডক্টর হাইকেল। তারপর আবার মুখ খুলেছিল আহমদ মুসাকে কিছু বলার জন্যে।

তার আগেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'স্যার, পরে আমরা কথা বলব। এখন আমাদের বের হতে হবে এখান থেকে। আমার অনুমান ঠিক হলে আমরা এখন ভূমিতল থেকে দুতলা নিচে অবস্থান করছি।'

'অনুমান কেন? আপনি তো উপর থেকে নিচে নেমেছেন!' বলল ডক্টর হাইম হাইকেল।

একটু হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমরা স্বেচ্ছায় আসিনি। ওরা আমাদের বন্দী করে এনেছিল।'

একটু বিস্ময়, একটু মলিনতা দেখা গেল ডক্টর হাইম হাইকেলের চোখে-মুখে। তারপরই হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলল, 'চমৎকার। বন্দী থেকে বিজয়।'

'বিজয় এখনো আসেনি স্যার। আমাদের বাইরে বেরুনো এখনও বাকি।' আহমদ মুসা বলল।

'এই ঘরেই বাইরে বেরুবার কোন ব্যবস্থা আছে। আমি ওদের কথায় এটা শুনেছি।' দ্রুত কণ্ঠে বলল ড. হাইম হাইকেল।

'ধন্যবাদ। আমারও এটাই বিশ্বাস।' আহমদ মুসা বলল।

ঘরের চারদিকে তাকাচ্ছিল আহমদ মুসা।

ঘরটা পরিষ্কার। শোবার খাট ছাড়া ঘরে আছে একটি মাত্র ষ্টিলের টেবিল। এর বাইরে রয়েছে ঘরে প্রবেশের একটা দরজা। ঘরে আর কিছু নেই। টেবিলটি ঘরের পশ্চিম দেয়ালের দক্ষিণ কোণায় একেবারে সেঁটে রাখা কোণের সাথে।

টেবিলের গাঁ ঘেঁষে পশ্চিম দেয়াল বরাবর রাখা খাটটি। টেবিল ও খাট দুটোই ষ্টিলের। ঘরের অবশিষ্টটা নগ্নভাবে ফাঁকা।

'বলতো বিল্লাহ, টেবিল ও খাটটাকে এমন বেসুরোভাবে রাখা হয়েছে কেন? কেন ঘরের মাঝখানে রাখা হয়নি। গোটা মেঝো কোন কাজে ফাঁকা রাখা হয়েছে?' বলল আহমদ মুসা অনেকটা স্বগত কণ্ঠে।

'ঠিক বলেছেন ভাইয়া। ঘর সাজানোর দৃষ্টিতে এটা একেবারেই বিদঘুটে। কিন্তু কেন?' বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

'আচ্ছা দেখ তো', টেবিলের উচ্চতা স্বাভাবিকের তুলনায় কম, তাই না?' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক। কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আমাদের বের হওয়ার পথ বের করতে হবে।' বলল বুমেদীন বিল্লাহ অস্থির কণ্ঠে।

'বুমেদীন বিল্লাহ লক্ষ্য কর, খাট ও টেবিলের মধ্যকার উচ্চতা একটা সিঁড়ির সাধারণ ধাপের সমান।' আহমদ মুসা বলল বিল্লাহর কথার দিকে কর্ণপাত না করে।

'মি. আহমদ মুসা, ঘর থেকে এক্সিট নেয়ার ক্ষেত্রে এই খাট ও টেবিলের মধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে বলে আপনি মনে করছেন?' আহমদ মুসার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে বলল হাইম হাইকেল।

একটু হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'এ ছাড়া আর কোন অবলম্বন দেখছি না।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বিল্লাহকে লক্ষ্য করে বলল, 'বিল্লাহ, দেখ, টেবিল ও খাট নিশ্চয় মেঝের সাথে ফিক্সড করা।'

বিল্লাহ ছুটে গিয়ে দেখে বলল, 'ঠিক ভাইয়া, ফিক্সড করা।'

আহমদ মুসার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এগিয়ে গিয়ে খাট ও টেবিলের তলা এবং পায়াগুলো ভালো করে পরীক্ষা করল, কিন্তু গোপন সুইচ জাতীয় কোন কিছুই পেল না।

এই প্রথম চেষ্টার ব্যর্থতার পর আহমদ মুসা এসে টেবিলের পাশ ঘেঁষে খাটের উপরে বসল।

আহমদ মুসার হাতে একটা টিস্যু পেপার ছিল। সে হাতের দলা পাকানো টিস্যু পেপার ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটের উদ্দেশ্যে ছুড়ে মারল।

ছোট আয়তাকার ওয়েষ্টপেপারের বাস্কেট ছিল টেবিল ও খাটের মাঝখানে। আহমদ মুসার ছুড়ে দেয়া টিস্যু পেপার বাস্কেটে পড়ার বদলে গিয়ে পড়ল বাস্কেটের ওপারে, বাস্কেটের আড়ালে।

আহমদ মুসা বাস্কেটটি একপাশে সরিয়ে ওপাশ থেকে টিস্যু পেপারটি নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারলো না। বাস্কেটটি মেজের সাথে ফিক্সড।

বিস্মিত হয়ে আহমদ মুসা তাকাল বাস্কেটের দিকে। ফাঁকা কালো রংয়ের বাস্কেটের তলায় দেখল সাদা বড় আকারের স্ক্রুর মাথা। কিন্তু স্ক্রুর মাথায় যেমন খাঁজ থাকে, তেমন কোন খাঁজ এ স্ক্রুতে নেই।

ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

মুখ না তুলেই আহমদ মুসা ডাকল, 'বিল্লাহ এদিকে এস।'

সাংবাদিক বিল্লাহ নব্য গোয়েন্দার ভাব নিয়ে ক্লুর সন্ধানে দেয়াল-খাট-টেবিলের আশে-পাশে ঘুর ঘুর করছিল। আহমদ মুসার ডাক পেয়ে ছুটে এল।

ঠিক এ সময় ০৩২ নম্বর ঘরের দরজায় ধাক্কার শব্দ হল। কয়েকটা ধাক্কার পরই ব্রাশ ফায়ারের শব্দ এল।

উদ্বিগ্ন চোখে বিল্লাহ তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আর ভীত ড. হাইম হাইকেল খাটের ওপ্রান্ত থেকে আহমদ মুসার দিকে সরে এসে কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'ওরা এসে গেছে মি. আহমদ মুসা।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'ভয় নেই। না হয় আরেক দফা লড়াই করতে হবে। আর সম্ভবত ওরা এসে আমাদের পাবে না।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বিল্লাহকে বাস্কেটের স্ক্রুর মাথা দেখিয়ে বলল, 'ওতে চাপ দাও।'

বিল্লাহ এক হাত টেবিলে ঠেস দিয়ে ঝুঁকে পড়ে অন্য হাতে স্ক্রুর মাথায় জোরে চাপ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে শিষ দেয়ার মত একটা লম্বা শব্দ উঠল। পশ্চিমের দেয়ালের একাংশ উপরে উঠে গেল এবং তার সাথে সাথে টেবিল ও খাটসহ মেঝের সংশ্লিষ্ট অংশ দেয়ালের ওপাশে ঢুকে যেতে লাগল।

এ সময়ই শোনা গেল ০০৩৩ ঘরের দরজায় ধাক্কা ও তারপর ব্রাশ ফায়ারের শব্দ।

টেবিল ও খাট ওপাশে পৌছে একটা সিঁড়ির সাথে সেট হয়ে গেল। দেখা গেল খাট থেকে টেবিল এবং টেবিল থেকে সিঁড়ির ধাপে উঠার সুন্দর পথ তৈরি হয়ে গেছে।

'চলুন সবাই সিঁড়িতে উঠে যাই।' বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

প্রথমে ড. হাইম হাইকেল, তারপর বুমেদীন বিল্লাহ, সবশেষে সিঁড়িতে গিয়ে উঠল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা সিঁড়িতে উঠতেই টেবিল ও খাট আবার ফিরে গেল সেই ঘরে। নেমে এল দেয়ালও উপর থেকে।

'এর আসাটা স্বয়ংক্রিয় নয়, কিন্তু যাওয়াটা স্বয়ংক্রিয়। মনে হয় ওজনের সাথে এর ফিরে যাওয়ার সক্রিয় হবার কোন সম্পর্ক আছে। আমরা ওতে অবস্থান করলে ওটা সম্ভবত ফেরত যেত না। আমরা নেমে আসায় ওর ওজন মূল অবস্থানে চলে আসায় তার ফিরে যাবার ব্যবস্থা সক্রিয় হয়েছে।' কথাগুলো বলেই আহমদ মুসা ড. হাইম হাইকেলকে লক্ষ্য করে বলল, 'চলুন স্যার। ওরা আমাদের পিছু ছাড়বে না। দেয়াল সরিয়ে এ পথে আসার পন্থা ওরা নিশ্চয় জানে। ওরা এখনি এসে পড়বে।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার আগেই ড. হাইম হাইকেল ও বুমেদীন বিল্লাহ দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসাও ছুটল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সিঁড়িতে ব্রাশ ফায়ারের শব্দ পেল আহমদ মুসারা। কিন্তু সিঁড়িটা এঁকে বেঁকে উপরে উঠায় আহমদ মুসাদের কোন অসুবিধা হলো না।

সিঁড়ি পথে আহমদ মুসারা একটা বাড়িতে গিয়ে উঠল। বাড়িটার পুব পাশ দিয়ে নদী এবং পশ্চিম পাশ ঘেঁষে সড়ক পথ।

ডেট্রয়েট শহরের এই এলাকাটা বলা যায় অফসাইড। অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকা এটা। সবজির ক্ষেত ও প্রচুর ঝোপ-জংগল রয়েছে।

আহমদ মুসা দ্রুত ড. হাইম হাইকেল ও বুমেদীন বিল্লাহকে নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়াল। কোন গাড়ি-ঘোড়া পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

আহমদ মুসারা দাঁড়ানোর মিনিট খানেকের মধ্যেই একটা গাড়িকে আসতে দেখল। কাছাকাছি এলে দেখা গেল, গাড়িতে আরোহী মাত্র একজন মহিলা, সেই ড্রাইভ করছে।

আহমদ মুসা হাত তুললে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। আহমদ মুসা দ্রুত তাকে বলল, 'আমরা বিপদে পড়েছি। বিশেষ করে এই বৃদ্ধ। আমরা আপনার সাহায্য চাই।'

মেয়েটি তার চোখের সব শক্তি উজাড় করে আহমদ মুসাকে দেখল। তারপর মেয়েটি মাত্র একটি শব্দ উচ্চারণ করল। বলল, 'উঠুন।'

পেছনের সিটে বিল্লাহ ও ড. হাইম হাইকেলকে বসিয়ে আহমদ মুসা নিজে সামনের ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে উঠে বসল।

এ সময় তিনজন ষ্টেনগানধারী বেরিয়ে এল আহমদ মুসারা যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেই বাড়ি থেকে।

আহমদ মুসাদের গাড়িতে ওঠা তারা দেখতে পেয়েছে। গাড়ি লক্ষ্যে এক পশলা গুলি ছুটে এল তাদের ষ্টেনগান থেকে।

মেয়েটি বিস্মিত হয়েছে। গাড়ি ষ্টার্ট দিতে দিতে বলল মেয়েটি, 'ঘটনা কি মি...........।'

'আহমদ আমি।' বলল আহমদ মুসা।

'আহমদ?' আপনি কি মুসলমান?' মেয়েটির চোখে বিস্ময় দৃষ্টি।

'জি হ্যাঁ।' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল আহমদ মুসা।

মেয়েটি মুহূর্তকাল চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'আপনারা মূলত বাদী, না আসামী?'

'বাদী।' ত্বরিত জবাব দিল আহমদ মুসা।

'আপনি বিশেষ করে বৃদ্ধের বিপদের কথা বললেন। বৃদ্ধটি কে, তার নাম কি?' জিজ্ঞাসা করল মেয়েটি।

আহমদ মুসা একটু দ্বিধা করল। তারপর বলল, 'ইনি ডক্টর হাইম হাইকেল।'

ব্রাশ ফায়ারের শব্দ পাওয়া গেল এ সময় পেছন থেকে।

আহমদ মুসা পেছনে তাকাল। দেখল, পেছনে একটা কার ছুটে আসছে। আহমদ মুসা বুঝল, ওরাই পিছু নিয়েছে। নিশ্চয় গাড়িটা ওদের ওই বাড়িতে ছিল।

আহমদ মুসা চারদিকে তাকাল। ডানে সবজির বাগান। বামে নদী পর্যন্ত ঝোপঝাড়।

সামনেই রাস্তাটা বাম দিকে একটা বাঁক নিয়েছে। বাঁক শেষে জংগল। খুশি হলো আহমদ মুসা।

তাকাল সে মেয়েটির দিকে। বলল, সামনের বাঁকে আমাকে নামিয়ে দিন। বাঁকটা ঘুরেই আমাকে নামিয়ে দেবেন। যাতে পেছনের গাড়ি দেখতে না পায়।'

মেয়েটির চোখে-মুখে উদ্বেগ। বলল, 'নেমে কি করবেন? ওরা তো মেরে ফেলবে আপনাদের। তার চেয়ে সামনে কোন পুলিশের সাহায্য পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক।'

'না সবাই নামবে না। শুধু আমি নামব। ওদের এখানেই আটকাতে চাই। সামনে পুলিশের সাহায্য পাওয়া যাবে, তার নিশ্চয়তা নেই।' বলল আহমদ মুসা।

মেয়েটির চোখে-মুখে বিস্ময়। বলল, 'আপনি কিভাবে ওদের ঠেকাবেন? ওরা তো সংখ্যায় বেশ কয়েকজন। তাছাড়া ষ্টেনগানের মত বড় অস্ত্র ওদের আছে।'

'কিন্তু এভাবে আপনি এবং আমরা সবাই বিপদগ্রস্ত হবো। ওরা গাড়ির টায়ারে গুলী করতে পারলে এখনি গাড়ি থেমে যাবে এবং আমরা সবাই ওদের গুলীর মুখে পড়বো। আর আমি নেমে গিয়ে ওদের গাড়ি আটকে দিতে পারব। এ

পাশের দুটি টায়ারের যে কোন একটি ফাটাতে পারলেই ওরা থেমে যেতে বাধ্য হবে। তখন আপনারা নিরাপদে চলে যেতে পারবেন।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু আপনার কি হবে? ওদের গাড়ি আটকাতে পারলেও ওদের সবাইকে একা এঁটে উঠবেন কি করে?' বলল মেয়েটি প্রতিবাদের সুরে।

'আমি হবো আক্রমণকারী, ওরা আক্রান্ত। আমার জয়ী হবার সম্ভাবনা বেশি।' আহমদ মুসা বলল।

'সম্ভাবনা যদি সত্য না হয়?' বলল মেয়েটি।

'এতটা ভাবলে কোন কাজ করা যাবে না। করণীয় যা তা করতে এগিয়ে যেতে হবে। ব্যস।' বলে আহমদ মুসা একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'এখানেই নামিয়ে দিন।'

গাড়ি থামাল মেয়েটি। আহমদ মুসা গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বলল, 'আপনার নাম কি জুলিয়া রবার্টস?'

'হ্যাঁ।' বলল মেয়েটি।

'থ্যাংকস।' আহমদ মুসা বলল।

'ওয়েলকাম।' মেয়েটির চোখে বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টি।

গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে বিল্লাহ চিৎকার করে বলে উঠল, 'ভাইয়া আমার জন্যে কোন নির্দেশ?'

'মিস জুলিয়ার ঠিকানায় তোমাদের খোঁজ করব।' চিৎকার করে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাকে নামিয়ে দিয়েই মেয়েটি গাড়ি ষ্টার্ট দিয়েছে। বিল্লাহ কথা শুরু করলেও সে গাড়ি স্লো করেনি। গাড়িটা যে থেমেছিল সেটা পেছনের গাড়িটাকে সে জানতে দিতে চায় না। আহমদ মুসা এটাই চেয়েছিল।

বাঁকটা একেবারেই এল প্যাটানের ছিল। তাছাড়া বাঁক এলাকায় ঝোপ ও গাছপালা ছিল বেশ বড় বড়। পেছনের গাড়িটা টের পেল না সামনের গাড়ির থামাটা।

পেছনের গাড়িটা বাঁকে আসার আগেই সড়কের পাশে ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে একটা মোটা গাছের আড়ালে পজিশন নিয়ে নিয়েছে আহমদ মুসা।

দুহাতে দু'রিভলবার রেডি।

পেছনের গাড়িটা ঝড়ের গতিতে বাঁকে এসে পৌছল। সামনের গাড়িটা বাঁকের কারণে আড়াল হওয়ার জন্যেই হয়তো তাদের বাড়তি এই তৎপরতা।

গাড়িটা আহমদ মুসার সোজাসোজি পজিশনে আসার আগেই গাড়ির সামনের চাকা লক্ষ্য করে দুহাত দিয়ে দু'টি গুলী ছুড়ল আহমদ মুসা। গুলী ব্যর্থ হওয়া এবং দ্বিতীয় গুলীর ঝুঁকি নিতে চায় না সে।

দুটি গুলীই অব্যর্থভাবে আঘাত করল গাড়ির সামনের টায়ারকে। মুহূর্তেই প্রচন্ড গতির গাড়িটা ছিটকে শূন্যে উঠে বেশ অনেকটা দূরে গিয়ে আছড়ে পড়ল। তারপর আরও কয়েকটা গড়াগড়ি খেল। পরে প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো গাড়িটা। আগুন ধরে গেল গাড়িতে।

আহমদ মুসা রিভলবার পকেটে পুরে বেরিয়ে এল ঝোপ থেকে।

সড়কের ধার ঘেঁষে হাঁটা শুরু করল সামনের দিকে। জ্বলন্ত গাড়ি পেরিয়ে যাবার সময় দেখল, কেউ বাঁচেনি। মনে হয় কেউ গাড়ি থেকে বের হবার চেষ্টা করারও সুযোগ পায়নি।

সড়কের প্রান্ত ঘেঁষে হেঁটে চলেছে আহমদ মুসা। এ সড়কের ওদিকে সমান্তরালে, ফেরার সড়ক। দুসড়কের মাঝখানে ঘাসে ঢাকা প্রশস্ত আইল্যান্ড।

প্রায় দশ মিনিট পার হয়ে গেছে। পথ চলছেই আহমদ মুসা। লিফট নেয়ার মত কোন গাড়ি পায়নি। কার্গো ভ্যান কয়েকটা গেছে, যাত্রী ভর্তি হায়ার্ড ট্যাক্সিও কয়েকটা গেছে। কিন্তু আহমদ মুসা ওদের কোন অনুরোধ করেনি।

হঠাৎ আহমদ মুসা তার নাম ধরে ডাক শুনে ডান দিকে রাস্তার ওপাশে ফিরে তাকাল। দেখল, আইল্যান্ডের ওপারে ফেরার সড়কের বেড়া বরাবর দাঁড়িয়ে গাড়ির সেই মেয়েটা ও বিল্লাহ তাকে ডাকছে। তাদের পাশে তাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

বুঝল আহমদ মুসা। ওরা নিশ্চয় পেছনের গাড়িটা ধ্বংস হওয়া দেখতে পেয়েছে। তাই কোথাও এক্সিট নিয়ে ফিরতি পথ ধরে তাকে নেবার জন্যে তারা ফিরে এসেছে।

আহমদ মুসা সড়ক ক্রস করে চলল ওদের দিকে।

জুলিয়া রবার্টসের বাড়ি। দুতলার ভিআইপি গেষ্ট রুম।

আহমদ মুসা একটি সোফায় বসে।

ঘরের ওপাশে সুসজ্জিত বেড। ক্লান্ত শরীরটা চাচ্ছে শুয়ে একটা লম্বা ঘুম দিতে। কিন্তু আহমদ মুসার কাছে এই লোভের চেয়ে একটা চিন্তা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসার চোখ ঘুরে ফিরে বার বার জানালা দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে বাড়ির এ্যাপ্রোচ রোডটা দেখা যায়।

ঘরে প্রবেশ করল বুমেদীন বিল্লাহ। আহমদ মুসাকে দেখে বলল, 'কি ব্যাপার, ভাইয়া এখনও কাপড়-চোপড় ছাড়েননি?'

আহমদ মুসা বিল্লাহর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'ড. হাইম হাইকেলের খবর নিয়েছ?'

ড. হাইম হাইকেলকে বাড়ির ওপাশের আরেকটি ঘরে রাখা হয়েছে।

আহমদ মুসার প্রশ্নের ধরণ দেখে বিল্লাহ বলল, 'কেন কিছু ঘটেছে? আপনি কি ভাবছেন?' বিল্লাহর চোখে-মুখে ভাবনার প্রকাশ।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু অস্পষ্টভাবে ভেসে আসা একটা শব্দের অনুসরণে জানালা দিয়ে ছুটে গেল তার দুচোখ। একটি কার এবং ছোট একটি মাইক্রো প্রবেশ করল জুলিয়া রবার্টসের বাড়িতে। চোখ ফিরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল আহমদ মুসা, রাত ৯টা।

'ভাইয়া, কারো কি অপেক্ষা করছিলেন? তারা কি এসে গেছে?' বলল বিল্লাহ।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'কারও অপেক্ষা করছি না। তবে কিছু একটা পাহারা দিচ্ছি।'

বসল বিল্লাহ। ভ্রুকুঞ্চিত হয়েছে তার। বলল, 'এখানে আবার কি পাহারা দিচ্ছেন ভাইয়া। কিছু ঘটেছে?'

'হয় তো ঘটতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

উদ্বেগ ফুটে উঠল বিল্লাহর চোখে মুখে। ছোট কোন ঘটনা নিয়ে আহমদ মুসা এভাবে মাথা ঘামায় না। কিন্তু কি ঘটেছে? জুলিয়া রবার্টসকে তো তার ভালই মনে হয়েছে। নি:সন্দেহে সে সহানভুতিশীল ও আন্তরিক। বলল বিল্লাহ, 'ভাইয়া আপনি কি ম্যাডাম জুলিয়া রবার্টসকে সন্দেহ করছেন?'

'সন্দেহ নয়, তিনি তার দায়িত্ব পালন করতে পারেন।' আহমদ মুসা বলল।

বিল্লাহ কিছু বলতে যাচ্ছিল। এ সময় দরজা নক করে ঘরে প্রবেশ করল জুলিয়া রবার্টস।

ঘরে ঢুকেই বলল, 'আমি বসব না মি. আহমদ মুসা। চলুন ড্রইং রুমে একটু বসি। আরও কয়েকজন এসেছে। জরুরি কথা আছে।'

'ওঁরা তো এফ.বি.আই-এর লোক। ওঁদের মধ্যে কি ডেট্রয়েটের এফ.বি.আই চীফ হেনরী শ্যারন রয়েছেন।' বলল আহমদ মুসা সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে।

জুলিয়া রবার্টসের দুচোখ ছানাবড়া। বলল, 'আপনি কি করে জানলেন ওঁরা এফ.বি.আই-এর লোক?'

'আপনি যেভাবে আমার পুরো নাম জেনেছেন, বলা যায় সে ভাবেই। আমার প্রশ্নের জবাব দেননি মিস জুলিয়া রবার্টস।'

'আরও কি জেনেছেন?' প্রশ্ন জুলিয়া রবার্টসের।

'আপনিও এফ.বি.আই-এর লোক।' বলল আহমদ মুসা।

'ওঁরা আসবেন তাও কি জানতেন? ওঁদের অপেক্ষাতেই কি কাপড়ও ছাড়েননি?' জুলিয়া রবার্টস বলল।

'জি হ্যাঁ, জানতাম।' বলল আহমদ মুসা।

তৎক্ষণাত আর কোন কথা বলল না জুলিয়া রবার্টস। বিস্ময়ের চিহ্ন তার চোখ-মুখ থেকে চলে গেছে। ঠোঁটে এক টুকরো মুগ্ধ হাসি। বলল অল্পক্ষণ চুপ

থাকার পর, 'আহমদ মুসর জন্যে কোন কিছুই বিস্ময়কর নয়, এ কথা ভুলে গিয়েছিলাম।'

বলে একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'হ্যাঁ মি. আহমদ মুসা, যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে ডেট্রয়েটের এফ.বি.আই. কর্মকর্তা হেনরী শ্যারনও রয়েছেন। চেনেন তাঁকে?'

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, 'নাম জানি।'

'ওকে, তাহলে আপনারা আসুন। আমি চলি।' বলে জুলিয়া রবার্টস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জুলিয়া রবার্টস বের হয়ে যেতেই বিল্লাহ বলে উঠল, 'আপনি কি করে জানলেন ভাইয়া যে, ওরা এফ.বি.আই.-এর লোক এবং ওরা আসবে এখানে। জুলিয়া রবার্টসের পরিচয়ই বা কি করে পেলেন?'

'এফ.বি.আই. এর লোকরা বিশেষ কোডে হর্ণ বাজায়। জুলিয়া রবার্টসের হর্ণ বাজানো দেখে চিনেছি। তার টেলিফোনের আলোচনা শুনে জানতে পেরেছি ডেট্রয়েটের এফ.বি.আই কর্মকর্তারা রাত ৯টায় এখানে আসছেন।' আহমদ মুসা বলল।

'জুলিয়া রবার্টসের নাম কিভাবে জেনেছিলেন? তাঁর ঠিকানায় আমাদের খোঁজ করবেন বলেছিলেন। ঠিকানা জানলেন কিভাবে?'

হাসল আহম মুসা। বলল, 'আমার সামনে গাড়ির ড্যাশবোর্ডের উপর একটা নেম কার্ড পড়েছিল। তাতেই ওঁর নাম-ঠিকানা লেখা ছিল। কার্ড ওঁর কিনা এজন্যেই গাড়ি থেকে নামার সময় ওঁর নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা দুপকেট থেকে দুরিভলবার বের করে লোড পরীক্ষা করল। তারপর বলল, 'চল।'

বিল্লাহর চোখে-মুখে বিস্ময়। এ সময় আহমদ মুসা রিভলবার পরীক্ষা করল কেন? বলল, 'ভাইয়া, এ সময় রিভলবার চেক করছেন কেন?'

'রুটিন চেক।' হেসে বলল আহমদ মুসা।

'আমিও রুটিন চেক করি তাহলে।' বলল বিল্লাহ এবং নিজের রিভলবার বের করল।

আহমদ মুসা তখন চলতে শুরু করেছে। বিল্লাহও আহমদ মুসার পেছন পেছন চলল। ড্রইংরুমে প্রবেশ করল আহমদ মুসা। ড্রইংরুমটা বিশাল ঘর। গোটা ঘরটাই সোফায় সাজানো। ড্রইংরুমের তিনটি দরজা।

পুব দিকের দরজা বাইরে থেকে প্রবেশের। উত্তরের দরজা গেষ্ট ও সাধারণ আবাসিক উইং-এর দিকে। আর দক্ষিণের দরজা ষ্টোর ও কিচেন উইং-এর সাথে যুক্ত।

আহমদ মুসা দুতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে ঘরের পশ্চিম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা দেখল, জুলিয়া রবার্টস ও মি. হাইম হাইকেলসহ ছয়জন ড্রইংরুমে বসে আছে। ওরা চারজন কেন? ওরা তো কারের চারজন। মাইক্রোর লোকজন কোথায়?

নিজেকে প্রশ্ন করে নিজের মনেই হাসল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে জুলিয়া রবার্টস। সে স্বাগত জানাল আহমদ মুসাকে।

ওরা চারজন যেমন বসেছিল, তেমনি বসে থাকল। শুধু ওদের ৮টি চোখ একসাথে গিয়ে স্থির হলো আহমদ মুসার উপর।

ওরা চারজন বসেছিল পুবমুখী ও উত্তরমুখী হয়ে দু'সোফায়। আর জুলিয়া রবার্টস ও ড. হাইম হাইকেল পশ্চিমমুখী এক সোফায়। ড্রইংরুমের সেন্ট্রাল সার্কেলেল দক্ষিণমুখী একটা সোফাই শুধু খালি আছে। সোফাটা বাইরের দরজার সোজাসুজি। খুশি হলো আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ও বুমেদীন বিল্লাহ গিয়ে সেই খালি সোফাটায় বসল।

আহমদ মুসারা বসার আগেই জুলিয়া সবাইকে সবার সাথে পরিচয় করে দিয়েছে।

আহমদ মুসা বসতেই ডেট্রোয়েটের এফ.বি.আই. চীফ হেনরী শ্যারন বলে উঠল, 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আহমদ মুসা। অনেক বিপদ পাড়ি দিয়ে, অনেক কষ্ট করে আপনি মি. হাইম হাইকেলকে উদ্ধার করেছেন।'

'ওয়েলকাম। তবে আমি আমার কাজ করেছি। এ জন্যে ধন্যবাদের প্রয়োজন হয় না।' একটু হেসে বলল আহমদ মুসা।

'এটা আপনার বদান্যতা।' বলে একটু থেমেই হেনরী শ্যারন আবার কথা বলে উঠল, 'মি. আহমদ মুসা, আমরা ড. হাইম হাইকেলকে নিয়ে যাচ্ছি। আপনাকেও আমাদের সাথে যেতে হবে।'

বিস্মিত হলো না আহমদ মুসা। এ ধরনের কথা আসবে, আগেই তা ভেবেছে সে। কিন্তু শুরুতেই এমন নগ্নভাবে আসবে ভাবেনি আহমদ মুসা।

ঠোঁটে এক টুকরো হাসি টেনে আহমদ মুসা বলল, 'কিন্তু ড. হাইম হাইকেলের সাথে আমার জরুরি কিছু কথা আছে, সেটা এখনও হয়নি।' খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে উত্তর দিল না হেনরী শ্যারন। দেখা গেল আহমদ মুসার কথায় তার চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেছে। একটু সময় নিয়ে বলল, 'আপনি তো তার সাথে পরিচিতও নন, সম্পর্কিত নন। সুতরাং তেমন কি আর কথা থাকবে। ঠিক আছে, আপনিও যাচ্ছেন। আপনাদের কথা বলার সুযোগ করে দেব।'

আহমদ মুসার ভেতরটা শক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু মুখে তার কিছুই প্রকাশ পেল না। সে পাশে বসা বিল্লাহকে কানে কানে কিছু বলল। সংগে সংগে বিল্লাহ উঠে দাঁড়াল।

বিল্লাহ যখন দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল, আহমদ মুসা তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'তাড়াতাড়ি ফিরে এস।'

বলেই জুলিয়া রবার্টসের দিকে ফিরে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'ওকে একটু বাইরে পাঠাচ্ছি মিস জুলিয়া রবার্টস।'

'ধন্যবাদ সৌজন্যের জন্যে।' বলল জুলিয়া রবার্টস।

জুলিয়া রবার্টস যখন আহমদ মুসার কথার জবাব দিচ্ছিল, তখন হেনরী শ্যারন তার মোবাইলে কথা বলছিল।

হেনরী শ্যারনের কথা শেষ হতেই আহমদ মুসার তার কথার উত্তরে বলল, 'আমি আপনাদের সাথে যাচ্ছিই এটা কিভাবে নিশ্চিত হলেন?'

সংগে সংগে উত্তর দিল না হেনরী শ্যারন। তার চোখে-মুখে ক্রোধের প্রকাশ। বলল শক্ত কণ্ঠে, 'এফ.বি.আই. কারো মর্জি মাফিক নয়, নিজের মর্জি মাফিক কাজ করে।'

জুলিয়া রবার্টসের চোখে-মুখে চরম বিব্রতভাব ফুটে উঠেছে। তাকাল হেনরী শ্যারনের দিকে। বলল, 'মি. শ্যারন, এমন তো কথা ছিল না? ড. হাইম হাইকেলকে তার পরিবারে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে, এটাই তো বলেছিলেন।'

'মিস জুলিয়া রবার্টস, সে সময়ের পর অনেক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। অনেক পরিবর্তনের জন্যে এই সময় যথেষ্ট।' বলেই হেনরী শ্যারন তাকাল ড. হাইম হাইকেলের দিকে। বলল, 'চলুন স্যার। আপনি ক্লান্ত। আপনার বিশ্রাম দরকার।'

'মি. শ্যারন, আমি তো যাবই। আপনারা আমাকে বাড়ি পৌছাবেন, এটাই আমার জন্যে নিরাপদ। কিন্তু তার আগে আহমদ মুসার সাথে আমার প্রয়োজন শেষ করতে চাই।' বলল ড. হাইম হাইকেল।

'স্যার সেটা হবে। আমরাই তার ব্যবস্থা করব। আহমদ মুসা আমাদের সাথে যাচ্ছেন।' হেনরী শ্যারন বলল।

'আমি যাচ্ছি না মি. শ্যারন। আমি আপনার মর্জির অধীন নই।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই স্প্রিং-এর মত উঠে দাঁড়াল হেনরী শ্যারন। উঠে দাঁড়াবার সাথেই তার হাতে উঠে এসেছে রিভলবার।

রিভলবার আহমদ মুসার দিকে তাক করে ক্রুদ্ধ হেনরী শ্যারন কিছু বলতে যাচ্ছিল।

এরই সুযোগে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সাথে আহমদ মুসার হাত রিভলবার সমেত বেরিয়ে এল এবং আগুন উদগীরন করল।

গুলী গিয়ে আঘাত করল শ্যারনের রিভলবারের নলকে। তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল রিভলবার।

আহমদ মুসার বাম হাতও তুলে নিল আর একটি রিভলবার।

অবশিষ্ট তিনজন ইতিমধ্যে পকেটে হাত দিয়েছিল তাদের রিভলবার বের করার জন্যে। কিন্তু ততক্ষণে তারা আহমদ মুসার টার্গেটে এসে গেছে। বলল আহমদ মুসা শ্যারনকে লক্ষ্য করে, 'মি. হেনরী শ্যারন, মানুষের সব ইচ্ছা পূরণ হয় না। আপনার ইচ্ছাও পূরণ হবার কোন উপায় নেই।'

ক্রোধে ফুসছিল হেনরী শ্যারন। আগুনে তেল পড়ার মত জ্বলে উঠল সে। চিৎকার করে উঠল, 'জন তোমরা এদিকে এস।'

কোন সাড়া এল না ওদিক থেকে।

আরও জোরে চিৎকার করল মি. শ্যারন।

'মি. শ্যারন এক সময় ঘুম থেকে তারা জাগতেও পারে।' মুখ টিপে হেসে বলল আহমদ মুসা।

চোখ দুটি ছানাবড়া হয়ে উঠেছে হেনরী শ্যারনের।

এ সময় ঘরে প্রবেশ করল বিল্লাহ।

আহমদ মুসা বলল, 'বিল্লাহ, তুমি মি. শ্যারনকে একটু বল কিভাবে তুমি জনদের ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছো।'

'তুমি এতটা এগুবে, সেটা বুঝিনি আহমদ মুসা। কিন্তু এটাই শেষ নয়। তোমার ঔদ্ধত্য সহ্য করা হবে না।' ক্রোধের চোটে কাঁপতে কাঁপতে বলল হেনরী শ্যারন।

'অপেক্ষা করুন মি. শ্যারন।' বলেই আহমদ মুসা বিল্লাহকে লক্ষ্য করে বলল, 'এদেরকেও ঘুম পাড়িয়ে দাও বিল্লাহ। শান্তিতে থাকবেন ওঁরা। তবে বিল্লাহ, মিস জুলিয়া রবার্টসের ডোজটা যেন একটু কম হয়। কারণ ওঁকে জেগে উঠে এদেরকে হাসপাতালে নিতে হবে। একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর হেনরী শ্যারনকে লক্ষ্য করে বলল, 'হ্যাঁ মি. শ্যারন, বিশেষ ধরনের এবং সিগারেট সাইজের এই ক্লোরোফরম আমরা পেয়েছি আপনার বন্ধু ব্রিগেডিয়ার শেরিল শ্যারনের বন্দীখানা থেকে। আমাদের সংজ্ঞাহীন করার জন্যে এনেছিলেন। আমাদের বাঁধতে গিয়ে একটা প্যাকেট পড়ে যায় ওদের পকেট থেকে। এ্যান্টিডোজ ব্যবহার না করলে এই ক্লোরোফরম ঘুম ভাঙে না।'

বিল্লাহ এক হাতে রিভলবার, অন্য হাতে ক্লোরোফরম স্প্রে নিয়ে ওদের কাছে পৌছে গিয়েছিল।

বিল্লাহ প্রথমে গেল হেনরী শ্যারনের দিকে। তার নাকের কাছে স্প্রে নিয়ে মাথায় রিভলবারের নল ঠেকিয়ে বলল, 'নিশ্বাস টানতে থাকুন, এক সেকেন্ড দেরী করলেই গুলী করব। নিশ্বাস টানুন।'

হেনরী শ্যারনের দুচোখ থেকে আগুন বেরুচ্ছে। কিন্তু সুবোধ বালকের মত নির্দেশ পালন করল সে। নি:শ্বাস টানল। আর তার সাথে সাথেই ঢলে পড়ল সংজ্ঞা হারিয়ে। ওদের চারজনেরই একই পরিণতি হলো।

বিল্লাহ ফিরে গিয়ে আহমদ মুসার পাশে বসল।

উঠে দাঁড়িয়েছে জুলিয়া রবার্টস। তার বিব্রত বেদনার্ত মুখ। বলল, 'মি. আহমদ মুসা, বিল্লাহ বসলেন কেন? আমি বাকি রয়ে গেছি।'

'আপনি বাকিই থাকবেন। আপনাকে ক্লোরোফরম করার প্রয়োজন নেই।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু আপনি তো বলেছেন।' বলল জুলিয়া রবার্টস।

'সেটা মি. হেনরী শ্যারনকে শুধু জানাবার জন্যেই।' আহমদ মুসা বলল।

'শুধু জানাবার জন্যে? বুঝলাম না।' জুলিয়া রবার্টস বলল।

'আপনাকে ক্লোরোফরম না করলে, তার অর্থ তারা বুঝত আপনি আমাদের সহযোগিতা করছেন। সেটা আপনার জন্যে বিপজ্জনক হতো। এজন্যেই তাদের জানিয়েছি যে আপনাকেও সংজ্ঞাহীন করা হবে।' বুঝিয়ে দিল আহমদ মুসা।

'কিন্তু সংজ্ঞাহীন করার প্রয়োজন নেই বলছেন যে!' জুলিয়া রবার্টস বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'ওরা জেনেছেন আপনিও সংজ্ঞাহীন হয়েছেন। কিন্তু ওরা জানবে না যে আপনি সংজ্ঞা হারাননি, আপনাকে ক্লোরোফরম করা হয়নি।'

বিস্ময়ে হা হয়ে উঠল জুলিয়া রবার্টসের মুখ। বলল, 'এতটা আট-ঘাট বেঁধে আপনি কথা বলতে পারেন?'

আহমদ মুসা উত্তর দিল না। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'যা ঘটে গেল তার জন্যে আমি দু:খিত মিস জুলিয়া রবার্টস। আপনি.....।'

আহমদ মুসার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল জুলিয়া রবার্টস, 'আপনার ব্যাপারে ওঁরা বাড়াবাড়ি করেছেন বলে আমি মনে করি। কিন্তু আপনি বাইরের লোকদের নিস্ক্রিয় করার আগাম ব্যবস্থা নিয়েছিলেন কি করে? ওঁদের মনোভাব আঁচ করতে পেরেছিলেন কিভাবে?'

'আমি নিউইয়র্ক থাকতেই খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম ডেট্রোয়েটের এফ.বি.আই. চীফ হেনরী শ্যারন ইহুদী এবং শ্যারন-আজর ওয়াইজম্যান নেটওয়ার্কের তিনি সদস্য। তারপর আপনার সাথে গাড়িতে আসার সময় যখন দেখলাম আপনি অধ্যাপক হাইম হাইকেলসহ আমার খবর তাকে জানালেন এবং ৯টায় ওঁরা আসছেন জানলাম, তখনই আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম ওরা যে কোন মূল্যে এই মহাসুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। আর যখন দেখলাম ওরা একটা কার ছাড়াও একটা মাইক্রো সাথে করে নিয়ে এসেছে, তখন এটা বুঝা গেল, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় জনশক্তি তারা নিয়ে এসেছে।' আহমদ মুসা বলল।

জুলিয়া রবার্টসের চোখে-মুখে বিস্ময়। বলল, 'আমিও যেহেতু ব্যাপারটার সাথে জড়িত, তাই বোধ হয় আপনি আমাকে কিছুই জানাননি।' কণ্ঠে কিছুটা অনুযোগের সুর।

'না, আপনাকে জড়িত মনে করিনি। আপনি যেটা করেছেন, সেটা আপনার রুটিন ডিউটি। আপনাকে না জানাবার কারণ হলো, আপনাকে বিব্রত না করা এবং আপনাকে অসুবিধায় না ফেলা।'

হাসল জুলিয়া রবার্টস। বলল, 'এতদিন আপনার কথা শুনেছি, আজ দেখলাম। নিজের লাভের চাইতে, অন্যের যাতে ক্ষতি না হয় সেটাকে আপনি বড় করে দেখেন। কিন্তু এই নীতি সমাজ সেবক, সমাজ সংস্কারকের হতে পারে, কিন্তু আপনার মত একজন যোদ্ধার এই নীতি কিভাবে?'

'এটা নির্ভর করে যুদ্ধ ও যোদ্ধার লক্ষ্যের উপর। যুদ্ধ যদি হয় মানব সেবা ও মানব সমাজের সংস্কারের জন্যে, তাহলে যুদ্ধ ও যোদ্ধার নিজের লাভের চেয়ে

মানুষের ক্ষতিকে বড় করে দেখা হয়। ইসলামে এই যুদ্ধকেই বলে 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' বা 'আল্লাহর জন্যে যুদ্ধ করা'। আল্লাহর জন্যে যুদ্ধ হলে সেটা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দেশ বা জাতির স্বার্থে হয় না, হয় মানুষের জন্যে।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি বা দেশ যুদ্ধ করবে কেন, ক্ষতি স্বীকার করবে কেন, জীবন দেবে কেন?' জুলিয়া রবার্টস বলল।

'এই ধরনের যুদ্ধ তারা করতে পারে যারা স্রষ্টাকে পালনকর্তা, বিচারকর্তা এবং পুরষ্কার দাতা বা শাস্তিদাতা মানে।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু এই বিশ্বাসের সাথে মানুষের জন্যে কাজ করার সম্পর্ক কি?' জুলিয়া রবার্টস বলল।

'সম্পর্ক স্রষ্টা, পালনকর্তা, বিচারকর্তা ও পুরষ্কার বা শাস্তিদাতার উদ্দেশ্যে সাথে। স্রষ্টা চান তাঁর চাওয়া অনুসারে মানুষ মানুষের শান্তি ও কল্যাণের জন্যে কাজ করুক।' বলল আহমদ মুসা।

'এটা তো সমাজ সেবা, খুব বেশি হলে সমাজ সংস্কারের কাজ। যুদ্ধের কোন প্রশ্নই তো এখানে ওঠে না। কিন্তু আপনি বলেছেন যুদ্ধের লক্ষ্য এটা হতে পারে।' জুলিয়া রবার্টস বলল।

'এই লক্ষ্যে যুদ্ধ নয়, কিন্তু যুদ্ধ হলে তার লক্ষ্য এটাই হওয়া উচিত।' বলে একটু থামল আহমদ মুসা। বলল আবার, 'মানুষের শান্তি ও মংগলের জন্যে কাজ করার দুটো দিক আছে। একটা হলো ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যে কাজ করা, অন্যটা হলো অন্যায়ের প্রতিরোধ করা। এই দুটি দিকের প্রথমটি দ্বিতীয়টির উপর নির্ভরশীল। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যেই অন্যায়ের প্রতিরোধ প্রয়োজন। তার মানে.......।'

'তার মানে মানুষের শান্তি ও মংগলের লক্ষ্যে অশান্তি ও অমংগলের প্রতিরোধের জন্যে যুদ্ধ প্রয়োজন। এর অর্থ আপনাদের ইসলামে যুদ্ধ একটা একান্ত আবশ্যকীয় অস্ত্র।' আহমদ মুসার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল জুলিয়া রবার্টস।

‘হ্যাঁ, যতদিন অশান্তি ও অমংগলের শক্তির হাতে এই অস্ত্র থাকবে।’ বলল আহমদ মুসা।

মুখ টিপে হাসল জুলিয়া রবার্টস। বলল, ‘এই দৃষ্টি কোণ থেকে সন্ত্রাস যুদ্ধকে আপনি বৈধ বলবেন? কারণ সবল পক্ষ যেটাকে যুদ্ধ বলে, সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের সেই যুদ্ধই সন্ত্রাস নামে অভিহিত হয়। দুর্বলের এই যুদ্ধ সংগত কারণেই কৌশলের দিক দিয়ে ভিন্নতর হয়ে থাকে। দুর্বল এক্ষেত্রে সবলের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে না গিয়ে গেরিলা পন্থা অনুসরণ করে।’

‘আপনার কথিত দুর্বল পক্ষ যদি বৈধ কোন ষ্টেট (যদি তা বিদ্রোহের মাধ্যমেও) হয় এবং ষ্টেট-অথরিটি যদি যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে সবল শত্রুর যতটা পারা যায় ক্ষতি করার জন্যে গেরিলা ধরনের আক্রমণ শুরু করে, তাহলে এটা সন্ত্রাস হবে না। কিন্তু ষ্টেট অথরিটি ছাড়াই যদি কোন গ্রুপ বা পক্ষ তার শত্রুর বিরুদ্ধে এই ধরনের আক্রমণ শুরু করে, তাহলে সেটা সন্ত্রাসের পর্যায়ে পড়বে। আমাদের নবী (স.) মক্কায় ১৩ বছর ষ্টেটলেস অবস্থায় মানুষের জন্যে শান্তি ও মংগলের বাণী, অর্থাৎ ইসলাম প্রচার করেছেন। এই তের বছর তিনি সবল শত্রুর দ্বারা অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কোনভাবেই তিনি শত্রুর উপর পাল্টা আঘাত হানেননি। অথচ মদিনায় গিয়ে ষ্টেট-অথরিট অর্জন করার পর প্রতিটি আঘাত-আক্রমণের তিনি মোকাবিলা করেছেন। শত্রুর প্রস্তুতিকে দুর্বল বা নস্যাত করার জন্যে অভিযান পরিচালনা করেছেন। সুতরাং আপনার প্রশ্নের জবাব হলো, ন্যায়সংগত হলেও আপনার কথিত সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের অথরিটি বিহীন সন্ত্রাস যুদ্ধকে বৈধ বলে মনে করে না ইসলাম। ‘ক’এর অপরাধে ‘খ’কে শাস্তি দেবার অনুমতি ইসলামে নেই। অথচ সন্ত্রাসের অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই ঘটে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কেন এটা আপনাদের ‘ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ’ তত্ত্বের মধ্যে পড়ে তো।’ জুলিয়া রবার্টস বলল।

‘ব্যক্তি পর্যায়ে অন্যায় প্রতিরোধে গিয়ে কোন সময় শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে। সে শক্তি প্রয়োগ যদি সামনাসামনি কোন অন্যায় থেকে কাউকে বিরত রাখার জন্যে হয়, তাহলে এটা সন্ত্রাস হবে না, কেউ একে সন্ত্রাস

বলবে না। কিন্তু কেউ যদি অন্যায়কারীকে এভাবে সামনাসামনি প্রতিরোধ করার প্রকাশ্য ও বাঞ্ছনীয় দায়িত্ব পালন না করে এক সময় গোপনে গিয়ে তার বাড়িতে আগুন লাগায়, তাহলে এটা সন্ত্রাস হবে। কারণ এর দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যায়টির প্রতিরোধ হয় না এবং এই কাজে অন্যায়কারী ছাড়াও আরও অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় খোদ এই কাজটিই অন্যায়ে পরিণত হয়।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু এর আগে আপনি বলেছেন, আপনাদের নবী ষ্টেট-অথরিটি বিহীন অবস্থায় মক্কা জীবনের তের বছরে কোন পর্যায়েই অন্যায় ও জুলুম নির্যাতনের প্রতিরোধ করেননি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। এখন বললেন ব্যক্তিপর্যায়ে অন্যায়ের প্রতিরোধে শক্তি প্রয়োগ করা যাবে। এটা ইসলাম সম্মত হলে আপনাদের নবী মক্কার জীবনে তা করেননি কেন?' জুলিয়া রবার্টস বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমি এখানে বলেছি ব্যক্তি বা বিচ্ছিন্ন গ্রুপ পর্যায়ের অন্যায়ের কথা এবং ব্যক্তি বা বিচ্ছিন্ন গ্রুপ পর্যায়ের প্রতিরোধের কথা। এটা মানুষের অপরিহার্য দায়িত্বশীলতার অংশ বলেই মানব সমাজে এই কাজ চলে আসছে এবং চলা উচিত। ইসলাম একে উৎসাহিত শুধু নয় অবশ্য পালনীয় করেছে। কিন্তু অন্যায় ও জুলুম নির্যাতনকারী যদি ষ্টেট-অথরিটি হয়, জুলুম-নির্যাতন-অন্যায় যদি ষ্টেট অথরিটির অধীনে চলে তাহলে এর বিরুদ্ধে ব্যক্তি বা বিচ্ছিন্ন গ্রুপ পর্যায়ের শক্তি প্রয়োগ বা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে ইসলাম অনুমোদন করেনি। আমাদের নবী (স.) মক্কা জীবনে এটা করেননি।'

'এর অর্থ হলো, ষ্টেট অথরিটির সব অন্যায় ও জুলুম অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হবে। এই কি?' জুলিয়া রবার্টস বলল।

'না, রাষ্ট্রের নাগরিকরা তা অবশ্যই মুখ বুজে সহ্য করবে না। প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মাধ্যমে তাদেরকে অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। এটাও ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ, যাকে আপনার পাশ্চাত্যের সবাই ভুল বুঝে থাকে।' বলল আহমদ মুসা।

জুলিয়া রবার্টস হাসল একটু মুখ টিপে। বলল, 'অস্ত্রের যুদ্ধও তো জিহাদ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু দুয়ের ক্ষেত্র আলাদা।' বলল আহমদ মুসা।

'বুঝেছি। কিন্তু বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে আপনার মত কি? ষ্টেট অথরিটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন কোন সময় বিদ্রোহ বা মুক্তি সংগ্রামের পর্যায়ে পৌছতে পারে।' জুলিয়া রবার্টস বলল।

'বিদ্রোহ বা মুক্তি সংগ্রাম ষ্টেট অথরিটির প্রতিপক্ষ আরেক ষ্টেট অথরিটি হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেক্ষেত্রে যে যুদ্ধ বা সংঘাতটা হয়, তা যেমন প্রকাশ্য ও ঘোষিত, তেমনি তা শুধু ষ্টেট অথরিটির নিয়ন্ত্রণে সংঘটিত হয়। এই ধরনের বিদ্রোহ বা মুক্তি সংগ্রামমুলক কাজ সন্ত্রাসের পর্যায়ে পড়ে না। এই বিদ্রোহ, মুক্তি সংগ্রাম যদি 'আল্লাহর জন্যে', মানে মানুষের শান্তি ও কল্যাণের জন্যে হয়, তাহলে ইসলাম একে অনুমোদন করে।'

'ধন্যবাদ।' বলল জুলিয়া রবার্টস।

থামল সে। হেসে উঠল। বলল আবার, 'আপনি আমেরিকায়, সুরিনামে, ক্যারিবিয়ানে, আফ্রিকায়, ইউরোপে যা করেছেন এবং করছেন, তা কোন পর্যায়ে পড়ে? আপনি অস্ত্র ব্যবহার করছেন, মানুষও মারছেন।'

হাসল আহমদ মুসাও। উত্তরের জন্যে মুখ খুলেছিল। এ সময় ড. হাইম হাইকেল আহমদ মুসাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'এই উত্তরটা আমি দিতে চাই।'

বলে একটু থামল। তারপর বলা শুরু করল, 'মি. আহমদ মুসা জিহাদকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। ব্যক্তি বা বিচ্ছিন্ন গ্রুপ পর্যায়ে অন্যায়ের প্রতিরোধ, ব্যক্তি বা সামষ্টিক নাগরিক পর্যায়ে প্রতিবাদ ও আন্দোলন, বিদ্রোহ বা মুক্তি সংগ্রাম পর্যায়ে সংঘাত ও যুদ্ধ এবং আন্তঃ ষ্টেট পর্যায়ের যুদ্ধ সংঘাত। আহমদ মুসা প্রথম ধরনের জিহাদ করছেন। অস্ত্রের ব্যবহার ও মানুষ মারা নিয়ে মিস জুলিয়া প্রশ্ন তুলেছেন। আপনাদের আলোচনায় পরিষ্কার হয়েছে, দ্বিতীয় প্রকারের জিহাদে ইসলামী নীতি অনুসারে অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ, কিন্তু প্রথম প্রকারের জিহাদে অস্ত্রের ব্যবহার প্রয়োজনীয় হতে পারে। কারণ অন্যায়কারীর হাতে যা থাকবে, তা নিয়েই তো তাকে প্রতিরোধ করতে হবে। আহমদ মুসা এটাই করছেন। মি. বুমেদীন বিল্লাহ এবং আমাকে উদ্ধার করতে এসে বন্দী খানাতেই আহমদ মুসার হাতে দু'ডজনের মত লোক মরেছে। এই লোকদের না মারলে তিনি আমাকে মুক্ত করতে পারতেন না। এটাই শুধু নয়, তাঁকেও নিহত হতে

হতো। তার এই যুদ্ধ বা জিহাদকে শুধু ইসলাম নয়, দুনিয়ার অন্য ধর্ম ও শাসন ব্যবস্থাও অনুমোদন করে।' থামল ড. হাইম হাইকেল।

'ধন্যবাদ স্যার। আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু সন্ত্রাস সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?' বলল জুলিয়া রবার্টস।

'মি. আহমদ মুসার সব কথা আমি ভালোভাবে শুনেছি। সন্ত্রাস সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তার সাথে আমি একমত। তিনি তার ধর্মের জিহাদের যে দৃষ্টিকোন তুলে ধরেছেন তার সাথে আমি কয়েকটা কথা যোগ করব। জিহাদ বা যুদ্ধের ব্যাপারে ইসলামের নীতি খুবই স্বচ্ছ, বিস্তারিত ও বাস্তবমুখী। এদিক থেকে ইসলাম অন্যান্য ধর্ম থেকে একেবারেই আলাদা। ইসলাম সর্বকনিষ্ঠ এবং নবুওতের ধারায় সর্বশেষ ধর্ম হওয়ার দাবীদার বলেই হয়তো। ইসলাম মানুষের মতামতের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কারো উপর ধর্মমত চাপিয়ে দেবার বিরোধী। ইসলামের নবী তার জীবদ্দশায় মদিনার মুনাফিকদের বিকৃত বিশ্বাসকে সহ্য করে গেছেন, কিন্তু তাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীকে সহ্য করেননি। যেমন তাদের ভিন্ন 'মসজিদ' তৈরির উদ্যোগ নস্যাত করে দিয়েছিলেন। মদিনার ইহুদীদের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির ভিত্তিতে মৈত্রী গড়েছিলেন। কিন্তু ইসলামের নবী নিজে যেমন চুক্তি লংঘন করেননি, তেমনি তিনি ইহুদীদের ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি লংঘনকে বরদাশত করেননি। বিচার ও বিচার কার্যকরী করার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইসলামের নবী মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু বিভ্রান্তি, অনর্থ, অশান্তি সৃষ্টিকারী উদ্যোগের প্রতিরোধকে একান্ত আবশ্যকীয় বলেছেন। ইসলাম অশান্তি বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসকে 'হত্যা'র চেয়ে মারাত্মক অপরাধ বলে অভিহিত করেছে। এমনকি একজন লোকের হত্যাকেও গোটা মানবজাতিকে হত্যা বলে আখ্যায়িত করেছে। এ কারণেই ইসলাম অপরাধের প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানে অত্যন্ত কঠোর। ইসলামের মানবিক রূপ আমাদের পশ্চিমী দেশসমুহে যুদ্ধবাদী, সহ অবস্থান বিরোধী, অশান্তি সৃষ্টিকারী বলে চিত্রিত হয়েছে। মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করার কসরত চলছে এই দৃষ্টিকোন থেকেই। পশ্চিমের এই চিন্তা বুঝার ভুল অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রসূত। নিরপেক্ষ ও নীতিনিষ্ঠ হয়ে একটু চিন্তা করলেই দেখা

যাবে ইসলামের মৌলবাদিতা অর্থাৎ মানবতা ও মানব সমাজ বিরোধী অপরাধের প্রতিরোধ, প্রতিবিধান ও বিচার প্রশ্নে ইসলামের অনড়তা, আপোষহীনতা মানব সমাজের শান্তি ও কল্যাণের জন্যেই প্রয়োজন। খোদ জাতিসংঘও এ বিষয়টা এখন উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। এক সময় জাতিসংঘ শুধু শান্তি রক্ষা করে চলাকেই তার কাজ মনে করতো, কিন্তু এখন শান্তি প্রতিষ্ঠাকেও তার কাজ হিসাবে গ্রহণ করছে। জাতিসংঘ তার এই লক্ষ্য বাস্তবায়িত করতে গেলে অন্যদের অমঙ্গলের শক্তির বিরুদ্ধে তাকে যুদ্ধ করতে হবে। জাতিসংঘ ইতিমধ্যেই যুদ্ধ শুরু করেছে। জাতিসংঘ তার কুয়েত যুদ্ধ ও আফগান যুদ্ধকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই অপরিহার্য করেছে। এমনকি আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অনেক আগ্রাসনকে অনুরূপ যুক্তিতে বৈধ মনে করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্রসহ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক দেশসমূহের নিরাপত্তার জন্যে প্রয়োজন হলে অশান্তি ও অমংগলের শক্তির বিরুদ্ধে আগাম আক্রমণকেও বৈধ করে নিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণ ও দখন তার এই নীতিরই একটা নগ্ন দৃষ্টান্ত। সুতরাং ইসলাম..........।'

ড. হাইম হাইকেলের কথায় বাধা দিল জুলিয়া রবার্টস। ড. হাইম হাইকেলের কথার মাঝখানেই সে বলে উঠল, 'স্যার, তাহলে তো দেখা যাচ্ছে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের যুদ্ধ নীতিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘ গ্রহণ করেছে।'

হো হো করে হেসে উঠল ড. হাইম হাইকেল। বলল, 'হ্যাঁ, গ্রহণ করেছে। ইসলামের বন্দুকটা নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু টার্গেট উল্টো দিকে স্থির করেছে। ইসলামের 'যুদ্ধ'কে নিলেও যুদ্ধের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে নেয়নি। মি. আহমদ মুসা বলেছেন, ইসলামের জিহাদ বা যুদ্ধ 'আল্লাহর জনে', মানে মানুষের মুক্তি, শান্তি ও কল্যাণের জন্যে, কিন্তু আমাদের আমেরিকার যুদ্ধ আমেরিকার জন্যে, তার নিজ সম্পদ ও সমৃদ্ধির জন্যে। মুসলমানদের 'আল্লাহর জন্যে' যুদ্ধকে মৌলবাদ বলে গালি দিলেও তা মানুষের জন্যে শান্তি আনে, কল্যাণ আনে, আর আমরা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের শ্লোগানের আড়ালে যুদ্ধ করি নিজের জন্যে। তাই অশান্তি ও অমংগলের সৃষ্টি করে এবং সংশ্লিষ্ট জনগণের কাছে আমরা দখলদার ও খুনি হিসেবে চিত্রিত হই। অথচ ইসলামের সোনালী যুগের মুসলিম বিজেতাদের

বিজিত দেশের মানুষ স্বাগত জানিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছে, আর বিজয়ীরাও বিজিতদের বিজিত হিসেবে নয় ভাই হিসেবে বুকে টেনে নিয়েছে। সুতরাং দুযুদ্ধই যুদ্ধ, তবে দুয়ের মধ্যে স্বর্গ ও নরকের মত ....।'

ড. হাইম হাইকেলের কথার মাঝে আবার বাধা দিয়ে জুলিয়া রবার্টস বলে উঠল, 'স্যার, আপনি কিন্তু দেশের বিরুদ্ধে কথা বলছেন।'

'না, দেশের বিরুদ্ধে নয়, আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফাউন্ডার ফাদারসদের স্বাধীনতা ও গনতন্ত্র নীতির পক্ষে কথা বলছি।' বলল ড. হাইম হাইকেল।

'আপনি তো ধর্মপ্রাণ ইহুদী, ইসলামকে আসলেই আপনি কেমন মনে করেন?' জিজ্ঞাসা জুলিয়া রবার্টসের।

'ইসলাম আধুনিক মানুষের জীবন-দর্শন।' জবাব দিলেন ড. হাইম হাইকেল।

'স্যার আমি জানি, আপনি আপনার আগের ইহুদী বিশ্বাস থেকে সরে এসে এখন এমন একটি ইহুদী বিশ্বাস অনুসরণ করেন যেখানে দয়া ও ভালোবাসাই মাত্র ধর্মের হাতিয়ার, যেখানে যুদ্ধ ও রক্তপাতের কোন স্থান নেই। কিভাবে আপনি তাহলে ইসলামকে আধুনিক মানুষের অনুসরণীয় ধর্ম বলেছেন যেখানে প্রতিরোধ-প্রতিবিধানের জন্যে যুদ্ধ অপরিহার্য?'

সংগে সংগে জুলিয়া রবার্টসের প্রশ্নের জবাব দিল না ড. হাইম হাইকেল। যেন দম নিচ্ছিল সে। একটু পর বলল, 'আমি আমার জীবনের এক বিশেষ অবস্থায় যে বিশ্বাস বেছে নিয়েছি, তা আমার মনের শান্তির জন্যে প্রয়োজনীয় হলেও সে বিশ্বাস দুনিয়ায় শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। কারণ দুনিয়ায় সবল ও ষড়যন্ত্র পটু অমংগলের শক্তি দুর্বল ও নীরিহ মংগল কামনাকে গলা টিপে মারছে ও মারতেই থাকবে। পথহারা দূর্বল ও নিরীহ মানুষের মুক্তির জন্যে আজ খোদায়ী বিধানের অধীন একমাত্র জীবন্ত ধর্ম ইসলামের প্রয়োজন। ইসলামের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের যুদ্ধই পারে মানুষের জন্যে শান্তি ও মংগল আনতে।' থামল ড. হাইম হাইকেল।

ড. হাইম হাইকেল থামতেই জুলিয়া রবার্টস বলে উঠল, 'স্যার, আপনি খুব বেশি হতাশ। কেন জাতিসংঘের মাধ্যমে তো আমরা মানুষের জন্যে এ শান্তি ও কল্যাণ আনতে পারি।'

হাসল ড. হাইম হাইকেল। বলল, 'মিস জুলিয়া রবার্টস, দুনিয়ায় সকল মানুষের জন্যে পক্ষপাতহীন শান্তি, সুবিচার ও মংগল প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজন ব্যক্তি-নিরপেক্ষ, দেশ-নিরপেক্ষ অনড় নীতিবোধ। এই নীতিবোধ জাতিসংঘ নয়, একমাত্র স্রষ্টাই দিতে পারেন। কারণ স্রষ্টা সব মানুষের এবং মানুষও স্রষ্টার। আর একটা মৌলিক কথা হলো, যিনি নীতি প্রণয়নকারী, তিনিই যদি আবার তার বাস্তবায়নকারী হন, তাহলে তিনি সময় ও অবস্থার পরিবর্তনে নীতি পাল্টাতে পারেন। সুতরাং মানুষ কিংবা মানুষের দ্বারা পরিচালিত জাতিসংঘ একই সাথে বিধান দাতা ও বিধানের অনুসরণকারী দুই-ই হতে পারে না। এ জন্যেই মানুষের জন্যে খোদায়ী বিধান প্রয়োজন যা সকলের উপর সমভাবে প্রযোজ্য এবং এই বিধানই মানুষের শান্তি ও কল্যাণের পাহারাদার হবে। আমার মত ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছে এটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও স্বীকার করতে হবে যে, এই খোদায়ী বিধান আজ শুধু ইসলামের কাছেই আছে।'

বিস্মিত, বিব্রত, মুগ্ধ জুলিয়া রবার্টস বলল, 'কেন, তাহলে স্যার আপনি ইসলাম গ্রহণ করেননি, করছেন না?'

হাসল ড. হাইম হাইকেল। বলল, 'আমি দুনিয়ার মানুষের কথা বলছি, নিজের কথা নয়। ব্যক্তিগত প্রসংগ থাক।' থামল ড. হাইম হাইকেল।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে আহমদ মুসা 'কম্পারেটিভ ফেইথ ষ্টাডিজ'-এর প্রবীণ প্রফেসর ড. হাইম হাইকেলের কথা গোগ্রাসে গিলছিল। ড. হাইম হাইকেল থামতেই সে বলে উঠল, 'ধন্যবাদ স্যার। আমার বিশ্বাসকে আপনি আরও মজবুত করছেন যে, ইসলাম একদিন অবশ্যই বিশ্বের সব মানুষের একমাত্র জীবন-দর্শন হয়ে উঠবে।'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর ড. হাইম হাইকেলকে 'মাফ করবেন স্যার' বলে জুলিয়া রবার্টসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিস জুলিয়া রবার্টস,

এদেরকে হাসপাতালে নিতে হবে। কিন্তু তার আগে আপনি এফ.বি.আই.-এর চীফ জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে একটু কথা বলুন।'

'সুপ্রীম বস জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে? আমি? কেন?' দুচোখ ছানা-বড়া করে বলল জুলিয়া রবার্টস।

'আমার কথা তাকে বলুন। সব ব্যাপার তাকে জানান?' বলল আহমদ মুসা।

'উনি তো সবই জানতে পারবেন। সবই তাকে জানানো হবে অফিসিয়ালি।' জুলিয়া রবার্টস বলল।

'সেটা তো পরে। আমি এখান থেকে যাওয়ার আগেই তাঁকে জানানো দরকার। যাতে অন্তত আপনার কাছে পরিষ্কার হয় যে, সুযোগ নিয়ে আমি আইনের হাত থেকে পালাচ্ছি না। এফ.বি.আই. চীফ যখন ইচ্ছা ডাকলেই আমাকে পেতে পারেন।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে আপনি কথা বলুন। আমি সরাসরি তাঁর সাথে কথা বলার এক্তিয়ার রাখি না।' জুলিয়া রবার্টস অনুরোধের সুরে বলল।

'ঠিক আছে, সংযোগ লাগিয়ে দিন, আমি কথা বলব।' বলল আহমদ মুসা।

ঠিক আছে। আমার পার্সোনাল ও অফিসিয়াল মোবাইল ছাড়াও নাম্বারহীন একটা মোবাইল আছে। সেটা নিয়ে আসি। আমি চাই, আমার সহযোগিতার কোন রেকর্ড স্যারের কাছে না থাক।' বলে উঠে এক দৌড়ে উঠে গেল দুতলায়। এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল সে মোবাইল নিয়ে।

আহমদ মুসা এফ.বি.আই.-চীফ জর্জ আব্রাহাম জনসনের পার্সোনাল মোবাইল নাম্বার জুলিয়া রবার্টসকে বলল।

জুলিয়া রবার্টস নাম্বারগুলো টিপে সংযোগ দিয়েই দ্রুত তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে।

টেলিফোন ধরে ওপারের কণ্ঠ শুনেই চিনতে পারল। বলল, 'গুড ইভিনিং। জনাব আমি আহমদ মুসা।'

ওপার থেকে কণ্ঠ ভেসে এল, 'আসসালামু আলাইকুম। তুমি তো ডেট্রয়েটে। কেমন আছ? নিশ্চয় কোন বিশেষ খবর?'

'ড. হাইম হাইকেলকে ওদের হাত থেকে মুক্ত করেছি জনাব।' আহমদ মুসা বলল।

ভেসে এল ওপার থেকে কণ্ঠ, 'থ্যাংকস গড। অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। কখন, কিভাবে কোত্থেকে তাকে উদ্ধার করা গেল?'

আহমদ মুসা সংক্ষেপে কাহিনীটি বলল। সেই সাথে বলল জুলিয়া রবার্টস কিভাবে তাদেরকে নিরাপদ স্থানে সরে আসতে সাহায্য করেন।

'থ্যাংকস গড। রীতিমত থ্রিলিং ব্যাপার? তুমি এখন কোথায়?' বলল ওপার থেকে জর্জ আব্রাহাম জনসন।

'এখন মিস জুলিয়ার ড্রইংরুমে। আমার সামনে ডেট্রয়েটের এফ.বি.আই.-চীফ হেনরী শ্যারনসহ তার ৮জন লোক সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে। আমি আপনাকে টেলিফোন করেছি একথা জানাবার জন্যে যে, আমি ডক্টর হাইম হাইকেলকে আমার সাথে নিয়ে যাচ্ছি। তিনি এ বাড়িতে মুহূর্তের জন্যেও নিরাপদ নন। আপনি তার নিরাপত্তা ও অবস্থানের জন্যে ব্যবস্থা করলে তাকে আপনাদের কাছে হাজির করব।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল আহমদ মুসা।

'থ্যাংকস। হেনরী শ্যারন কি তোমাদের আক্রমণ করেছিল? তোমাকে ও ড. হাইম হাইকেলকে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল?' ওপার থেকে বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

আহমদ মুসা জুলিয়া রবার্টসের গাড়ি করে আসার সময় থেকে যা ঘটেছে তার সব কথা বলল জর্জ আব্রাহাম জনসনকে।

'থ্যাংকস গড। তুমি ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে। হেনরী শ্যারনদের হাতে পড়া মানে আজর ওয়াইজম্যানদের হাতে পড়া। এবার ওদের হাতে পড়লে তোমার ও ড. হাইম হাইকেলের নিহত হওয়ার শতভাগ সম্ভাবনা ছিল। আর নিশ্চয় এই কারণেই হেনরী শ্যারন বিষয়টা আমাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছে। সে আজ রাত পৌনে ৯টায়, মানে সে তোমার ওখানে পৌছার মাত্র পনের মিনিট আগে আমার অফিসের সাথে কথা বলেছে। কিন্তু সে তোমাদের সম্পর্কে, তার

অভিযান সম্পর্কে কিছুই জানায়নি। ভাল হয়েছে, তুমি ওদের সংজ্ঞাহীন করে আত্মরক্ষা করেছ, কাউকে হত্যা করতে হয়নি। থ্যাংকস গড।' বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

'জনাব, আমিও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যে, আমি আপনাকে ও জুলিয়া রবার্টসকে বিব্রত অবস্থার মধ্যে ফেলিনি।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক, আমাদেরকে বিব্রত অবস্থা থেকে বাঁচিয়েছ। মিস জুলিয়া রবার্টস কি তোমার পাশে আছে? ওকে টেলিফোনটা দাও।'

'দিচ্ছি স্যার। এইসাথে আমি আপাতত বিদায় নিচ্ছি। আমি কি করছি আপনাকে জানাব। থ্যাংকস। বাই।'

আহমদ মুসা মোবাইলটি তুলে জুলিয়া রবার্টসের হাতে নিল।

জুলিয়া রবার্টস মোবাইল হাতে নিয়ে মুখের সামনে ধরে 'গুড ইভিনিং স্যার' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল। কথা বলল তার চীফ বস জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে।

কথা শেষ করে ধপ করে সোফার উপর বসে পড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'আজ দ্বিতীয়বার কথা বললাম তার সাথে। একবার বলেছিলাম চাকুরিতে যোগ দেবার সময়। আর আজ।'

এই স্বগোতোক্তির পর তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'স্যার বলেছেন, আপনারা আমার সাথে বেরুবেন। আমি হেনরী শ্যারনদেরকে হাসপাতালে রেখে আপনাদের নিয়ে যাব এয়ারপোর্টে। এয়ারপোর্টে আপনাদের জন্যে তিনটা টিকিট থাকবে ফিলাডেলফিয়ার জন্যে। আপনাদের বিমানে তুলে দিয়ে তারপর আমার ছুটি। তবে এখান থেকে বেরুবার আগে আপনাদের ছদ্মবেশ নিতে হবে, স্যার বলেছেন।'

'ফিলাডেলফিয়া কেন? আমি তো তাকে বলেছি, ড. হাইম হাইকেল তার বাড়িতে একদিনের জন্যেও নিরাপদ নন।' বলল আহমদ মুসা।

হাসল জুলিয়া রবার্টস। বলল, 'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। আপনারা ড. স্যারের বাড়ি যাচ্ছেন না। আপনারা ফিলাডেলফিয়া এয়ারপোর্টে যাওয়ার পর পার্কিং নাম্বার ওয়ানে একটা নীল রংয়ের গাড়ি পাবেন। নাম্বার 'FA

1876' এবং সে গাড়ির ড্রাইভার থাকবেন একজন তরুণী। তরুণীটি একটি বিশেষ কোডে হর্ণ দিয়ে আপনাদের স্বাগত জানাবেন। সে কোড আপনি জানেন। গাড়ি যেখানে আপনাকে নিয়ে যাবে সেটা হবে, স্যার বলেছেন, আমেরিকায় আপনার জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। ব্যস। এবার চলুন ছদ্মবেশ নেবেন।'

জুলিয়া রবার্টসসহ আহমদ মুসারা তিনজন উপরে উঠে গেল। একটু পর চারজন নিচে নেমে এল। সবাই ধরাধরি করে সংজ্ঞাহীন দেহগুলো বাইরে মাইক্রোতে নিয়ে তুলল। তারপর বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

গাড়ির কাছে গিয়ে জুলিয়া রবার্টস বলল, 'মি. আহমদ মুসা, আপনি ড. স্যার ও বিল্লাহকে নিয়ে আমার গাড়িতে উঠুন। আর আমি হেনরী শ্যারনদের মাইক্রোতে ওঁদেরকে নিয়ে ওটা আমি চালিয়ে নেব।'

জুলিয়া রবার্টস নিজের গাড়ির চাবি আহমদ মুসার হাতে দিয়ে মাইক্রোতে গিয়ে উঠল।

আহমদ মুসারাও গিয়ে জুলিয়া রবার্টসের কারে উঠল।

গাড়ি ষ্টার্ট দিতে দিতে জুলিয়া রবার্টস গাড়ির জানালা দিয়ে আহমদ মুসাকে বলল, 'আপনি আমাকে ফলো করবেন। হাসপাতাল থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত পার্কিং-এ আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। গুড লাক। বাই।'

জুলিয়া রবার্টসের গাড়ি চলতে শুরু করল। তার পেছনে আহমদ মুসার গাড়িও।

গাড়িটা যেমন যান্ত্রিক। ড্রাইভার তরুণীটাও তেমনি যন্ত্রের মত। সামনে তাকিয়ে স্থির বসে আছে ড্রাইভিং সিটে। হাত দুটি তার ড্রাইভিং হুইলে। হুইলটার মাঝে মাঝে নড়া-চড়া ছাড়া আর সবকিছুই স্থির। গাড়িতে তোলার সময় যান্ত্রিক কণ্ঠে স্বাগত জানানো ছাড়া মেয়েটি আর একটা কথাও বলেনি। আহমদ মুসা ভাবল, মেয়েটি বোধ হয় এফ.বি.আই.-এর কেন্দ্রীয় স্পেশাল ফোর্সের সদস্য। বলা হয়, এরা বলেও না, শুনেও না, শুধুই হুকুম তামিল করে।

গাড়ির ম্যাপ স্ক্রীনে গাড়ির চলার পথ সুন্দরভাবে ফুটে উঠছে। গাড়িটা ফিলাডেলফিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে উত্তর-পূর্বমুখী পেনরস এ্যাভেনিওতে প্রবেশ করেছিল। পেনরস এ্যাভেনিউ থেকে প্রবেশ করেছে বিখ্যাত ব্রডষ্ট্রিটে। ব্রডষ্ট্রিট থেকে গাড়ি এখন ওয়ালমাট ষ্ট্রিটে প্রবেশ করে পুব দিকে এগিয়ে চলেছে।

ড. হাইম হাইকেল আহমদ মুসার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'আমরা দেলোয়ার নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমার মনে হয়, দেলোয়ার নদী ও সিটিহলের মাঝখানের পুরানো অফিসিয়াল এলাকার কোথাও আমাদের নিয়ে যাচ্ছে।'

ড. হাইম হাইকেলের কথা শেষ হতেই গাড়িটা উত্তর দিকে টার্ণ নিয়ে ষষ্ঠ ষ্ট্রিট ধরে এগিয়ে চলল। কিন্তু মাত্র ১০০ মিটার গিয়েই গাড়ি পুবদিকে বাঁক নিয়ে ষ্ট্রিট থেকে নেমে সামনে এগুলো। তারপর আরও পঞ্চাশ মিটার গিয়ে পাঁচিল ঘেরা একটা বাড়ির গেটে গিয়ে দাঁড়াল।

দাঁড়িয়েই ড্রাইভার তরুণী আহমদ মুসাদের দিকে তাকিয়ে 'এক্সকিউজ মি স্যার' বলে গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

তরুণী এগুলো গেটের দিকে।

গেটের সিকিউরিটিকে কি যেন সে বলল। সংগে সংগে সিকিউরিটি লোকটি মোবাইল তুলে কথা বলল।

মিনিটখানেকের মধ্যেই ভেতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এল। সে সিকিউরিটির সাথে কথা বলেই ছুটে এল গাড়ির কাছে। গাড়ির দরজা খুলে বলল, 'ওয়েলকাম স্যার, আসুন।'

লোকটি চল্লিশোর্ধ। সুন্দর সাদাসিধা পোশাক। সরল, হাসিমাখা মুখ।

গাড়ি থেকে বেরুল প্রথম আহমদ মুসা। তারপর ড. হাইম হাইকেল এবং শেষে বুমেদীন বিল্লাহ।

লোকটি সবার সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, 'আমি হেনরিক হফম্যান। ম্যাডামের কর্মচারী। এই বাড়ির কেয়ারটেকার। আপনাদের ব্যাপারে সবকিছু আমাকে বলা হয়েছে।'

একটু দম নিয়ে ড. হাইম হাইকেলে দিকে ইংগিত করে বলল, 'ইনি নিশ্চয় ড. মুর হ্যামিল্টন। ম্যাডামের শিক্ষক। অসুস্থ। আর.............।'

তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'আর আমি জোসেফ জন।' তারপর বুমেদীন বিল্লাহকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি ক্রিশ্চিয়ান কার্টার।'

'জানি স্যার। আসুন। ওয়েলকাম।' বলে গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

ড্রাইভার তরুণী এগিয়ে এল আহমদ মুসাদের দিকে। স্যালুট দিয়ে বলল, 'হ্যাভ অ্যা নাইস টাইম। বাই স্যার।'

'থ্যাংক ইউ ম্যাডাম।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসারা হফম্যানের সাথে গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

গেটের ডানপাশে বাড়ির একটা নেম প্লেট। কাঠের ব্রাউন প্লেটের উপর সাদা অক্ষরে বড় করে লেখা 'জেফারসন হাউজ।' তার নিচে ব্র্যাকেটের মধ্যে ছোট অক্ষরে 'ব্যক্তিগত মালিকানা' শব্দ দ্বয় লেখা।

বাড়িটার নাম পড়ে ভ্রু কুঁচকালো আহমদ মুসা। কোন জেফারসন? টমাস জেফারসন নিশ্চয়। না হলে আর কোন জেফারসনের নামে এমন হাউজ হবে এবং এই খানে? ভাবনা বাড়ল আহমদ মুসার। এটা জেফারসন হাউজ হলে ম্যাডাম কে? বিরাট পরিবার, অনেক শাখা। ম্যাডাম অনেকেই হতে পারে। ফিলাডেলফিয়ার 'জেফারসন হাউজ'-এর কথা আহমদ মুসা সারাহ জেফারসনের কাছে কোনদিনই শোনেনি।

আহমদ মুসারা গেট পার হয়ে প্রবেশ করল ভেতরে।

গেট থেকে লাল পাথরের একটা সুন্দর রাস্তা এগিয়ে গেছে বাড়ির দিকে। দুধারে ফুলের বাগান। বাগানটা বাড়ির চারদিক ঘিরেই। চারদিকের ফুল বাগানের মাঝখানে লাল পাথরের সুন্দর তিনতলা বাড়িটি।

লাল পাথরের রাস্তাটি বাড়ি থেকে একটু সামনে বেরিয়ে আসা গম্বুজাকৃতির ছাদে ঢাকা সুন্দর সাদা পাথরের চত্বরে গিয়ে শেষ হয়েছে। এটা গাড়ি বারান্দা হিসেবেই ব্যবহার হয়। তিনটা ধাপ পেরিয়েই সে বারান্দায় উঠা

যায়। ছোট্ট অর্ধ চন্দ্রাকৃতি বারান্দার পরেই বাড়িতে প্রবেশের বিরাট দরজা। হেনরিক হফম্যানকে অনুসরণ করে ঐ দরজা পথে আহমদ মুসা বাড়িতে প্রবেশ করল।

দরজার পরে ছোট্ট একটা করিডোর পথ। তার পরেই বিশাল একটা লাউঞ্জ। তাঁরা লাউঞ্জে পৌঁছল।

হেনরিক হফম্যান বলল, 'স্যার এটা বাড়ির পার্টি কর্ণার। এই নিচের তলাতেও আগে অফিস রুম ছিল, এখন তার কিছু অংশে কিচেন ও ষ্টোর করা হয়েছে। আমরা যারা আছি তাদেরও থাকার ব্যবস্থা এই ফ্লোরে। একতলা ও দুতলা রিমডেলিং হয়ে গেছে। তিনতলার কাজ বাকি। আপনাদের থাকার জায়গা দুতলায়। চলুন স্যার।'

দাঁড়িয়ে এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে দুতলায় উঠার সিঁড়ির দিকে আবার হাঁটা শুরু করল হেনরিক হফম্যান।

আহমদ মুসারা চলল তার পেছনে পেছনে।

দুতলায় উঠে হেনরিক হফম্যান আহমদ মুসাদের প্রত্যেককে তার ঘরে নিয়ে গেল। সবাইকে বলল, 'ফ্রেশ হয়ে দুতলার লাউঞ্জে আসুন স্যার। ওখানেই চা-নাস্তা দিতে বলেছি। নাস্তার সাথে কথাও বলা যাবে। আর কাপড় ছাড়ার দরকার হলে আলমারিতেই সব পাবেন স্যার। প্রয়োজনীয় সব জামাকাপড় সেখানে রাখা আছে। কোন কিছুর দরকার হলে বলবেন।'

হেনরিক হফম্যান দুতলার লাউঞ্জে ফিরে এল। লাউঞ্জটা দুতলার সিঁড়ির মুখেই।

মিনিট পনেরোর মধ্যে আহমদ মুসা, ড. হাইম হাইকেল ও বুমেদীন বিল্লাহ লাউঞ্জে চলে এল।

গরম নাস্তা ও গরম চায়ের জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে ড. হাইম হাইকেল বলল, 'নাইস লোকেশান বাড়িটার। বাড়ির পুব পাশে ফিলোসফিক্যাল হল, উত্তর পাশে ইনডিপেনডেন্স হল এবং তার পাশেই কংগ্রেস হল। বলা যায় ফিলাডেলফিয়ার প্রাণকেন্দ্র এটা।'

বলে একটু থেমেই ড. হাইম হাইকেল তাকাল হেনরিক হফম্যানের দিকে। বলল, 'মি. হফম্যান, এ বাড়িটার নাম 'লিবার্টি হাউজ' এবং এ বাড়িটা 'ন্যাশনাল চাইল্ড ফাউন্ডেশন'এর অফিস ছিল। এ পরিবর্তনটা কি করে হলো?'

'আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। দুমাস আগে এই পরিচয়ই ছিল। দুমাস হলো এই পরিবর্তন ঘটেছে। বাড়ির মালিকই এ পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।' বলে একটু থেমেই হফম্যান আবার বলা শুরু করল, 'স্যার, এই বাড়িটা তৈরি করেন দুবার নির্বাচিত সাবেক প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন। ফিলাডেলফিয়ায় থাকাকালিন সময়ে এ বাড়িতে তিনি বাসও করেন। তিনিই বাড়িটির নাম দেন 'লিবার্টি হাউজ'। এই বাড়িতে বসেই তিনি মার্কিন সংবিধান 'বিল অব রাইটস'এর খসড়া তৈরি করেন। বোধ হয় এ কারণেই তিনি বাড়িটার নাম 'লিবার্টি হাউজ' রাখেন। তিনি ওয়াশিংটনে চলে গেলে বাড়িটা ভাড়ায় চলে যায়। সর্বশেষ ভাড়ায় ছিলেন ন্যাশনাল চাইল্ড ফাউন্ডেশন। দুমাস আগে তারা চলে যান। তারা চলে যাওয়ার পর বর্তমান মালিক ম্যাডাম মানে টমাস জেফারসনের গ্রান্ড গ্রান্ড ডটার মিস সারা জেফারসন সিদ্ধান্ত নেন বাড়িটা আর ভাড়া দেবেন না। বাড়িটাকে তিনি তার গ্রান্ড গ্রান্ড ফাদার টমাস জেফারসনের 'ফ্যামিলি মেমোরিয়াল' বানাবেন। ভার্জিনিয়ায় টমাস জেফারসনের বাড়ি এখন প্রকৃত অর্থে পাবলিক প্লেসে পরিণত হয়েছে। ওখানে কোন ফ্যামিলি প্রাইভ্যাসি আর সম্ভব নয়। এ কারণেই তিনি জেফারসনের 'ফ্যামিলি মেমোরিয়াল, হিসেবে এই বাড়ি বেছে নিয়েছেন। নামও পরিবর্তন করেছেন উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে।'

সবাই যখন হফম্যানের কথা শোনায় বুঁদ হয়ে গিয়েছিল, তখন আহমদ মুসার একটা ভিন্ন অস্বস্তি। মনের একটা চিন্তা থেকেই এই অস্বস্তি। সারাহ জেফারসনের মায়ের মন্তব্য তার মনে আছে। অতীতের সব কিছু মুছে ফেলার জন্যে সারা জেফারসনের সময় ও সুযোগ প্রয়োজন। আহমদ মুসা কোনভাবেই আর তার বিব্রত হওয়ার কারণ হতে চায় না। যে কারণে আহমদ মুসা এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে সারার সাথে কোন যোগাযোগ করেনি। সারা জেফারসন তার খবর রাখছে জানতে পেরেও তার সাথে সৌজন্যমূলক কথা বলা থেকেও আহমদ মুসা বিরত থেকেছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও সে আজ সারা জেফারসনের

বাড়িতে এসে উঠেছে। এফ.বি.আই. চীফ জর্জ আব্রাহাম জনসন বিষয়টা জেনেও কেন এটা করলেন? এটা তিনি ঠিক করেননি। মনে কিছু ক্ষোভেরই সৃষ্টি হলো তার।

ওদিকে গল্প চলছিল। কিন্তু আহমদ মুসার কানে ওদের গল্প ঢুকছে না। অস্বস্তিকর বিষয় তার মনকে অসুস্থ করে তুলেছে।

ওদের কথা বলার মাঝখানেই আহমদ মুসা অনেকটা বেসুরোভাবে বলে উঠল, 'সকলে মাফ করবেন, আমি একটু রেষ্টে যেতে চাই।'

'অবশ্যই, অবশ্যই। আপনারা ক্লান্ত। আমি উঠি। আমি নিচে আছি। ডাকলেই পাবেন।' বলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল হেনরিক হফম্যান।

সবাই উঠে দাঁড়াল।

ড. হাইম হাইকেলের রুমটা আহমদ মুসার রুমের সামনেই। আর বুমেদীন বিল্লাহর রুম ড. হাইম হাইকেলের রুমের পাশে।

আহমদ মুসা ড. হাইম হাইকেলকে তার কক্ষে পৌছে দিয়ে বলল, 'স্যার, ঘরটা সব সময় লক করে রাখবেন। আপনি একা দয়া করে বেরুবেন না। রুম টেলিফোনে আমাকে ডাকবেন।'

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা। আমাদের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি।' বলে একটু থামল ড. হাইম হাইকেল। তারপর বলল, 'আপনার কাছে আমার অনেক জিজ্ঞাসা আছে। আপনি তো আমার বাড়িতে গেছেন।'

'স্যার, আমি আপনার ছেলের মত। আমাকে সেইভাবে কথা বললে বাধিত হবো।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি তো মাথায় থাকার মত।' ড. হাইম হাইকেল বলল।

'না স্যার, মাথা থেকে বুকটা মনে হয় আরও কাছে।' বলে আহমদ মুসা একটা দম নিয়েই ড. হাইম হাইকেলকে তার বাড়ির কিছু খবর দিয়ে বলল, 'যা ঘটেছে তা বিস্তারিত বলার জন্যে আজই সুযোগ নেব।'

আহমদ মুসা থামতেই ড. হাইম হাইকেল বলল, 'তুমি বলেছিলে, আমার কাছে তোমার কিছু কাজ আছে, সেটা কি?'

‘খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ স্যার। আপনার সাহায্য আমি চাই। সব বলব আপনাকে। এখন যাই স্যার। আপনি রেষ্ট নিন।’

আহমদ মুসা বেরুবার জন্যে পা বাড়াল।

‘আহমদ মুসা, তোমাকে সাহায্য করতে পারা আমার জন্যে গৌরবের ব্যাপার হবে।’ বলল ড. হাইম হাইকেল।

‘অনেক ধন্যবাদ স্যার।’ বলে আহমদ মুসা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা রুম থেকে বেরুতেই তার দিকে ছুটে আসতে দেখল হেনরিক হফম্যানকে। তার হাতে একটা মোবাইল। তার কাছে কোন টেলিফোন এসেছে কি, ভাবল আহমদ মুসা।

হেনরিক হফম্যান তার কাছে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, ‘স্যার, আপনি আপনার মোবাইল ফেলে এসেছিলেন। ড্রাইভার মেয়েটা দিয়ে গেল।’

বলে সে তার হাতের মোবাইল আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল।

আহমদ মুসা মোবাইলটি হাতে নিয়ে বলল, ‘কোন ড্রাইভার?’

‘স্যার, আপনাদের ড্রাইভার। আপনি যে গাড়িতে আসলেন সেই গাড়ির ড্রাইভার। ’ বলল হেনরিক হফম্যান।

ভ্রুকুঞ্চিত হল আহমদ মুসার। মুখে বলল, ‘ঠিক আছে, ধন্যবাদ মি. হফম্যান।’

হেনরিক হফম্যান চলে গেল।

আহমদ মুসা তাকাল মোবাইলটার দিকে। দেখল, মোবাইলের স্ক্রীনে জলজল করছে তার নতুন নাম ‘জোসেফ জন’। ভাবল সে, এটাও এফ.বি.আই. চীফ জর্জ আব্রাহামেরই কীর্তি। তিনি নিশ্চয় চান না আমি সাধারণ টেলিফোনে তার সাথে বা কারো সাথে কথা বলি। তবু একবার টেলিফোন করে বিষয়টা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

খুশি হলো আহমদ মুসা। ঘরে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা হ্যাংগারে কোটটি খুলে রেখে প্রথমেই দুরাকাত নামাজ পড়ল। শোকরানার নামাজ। আল্লাহ কঠিন কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছেন। ড. হাইম হাইকেলকেও দিয়েছেন সহযোগিতাকারী হিসাবে। ধ্বংস টাওয়ারের

তলায় লুকানো ষড়যন্ত্রের রূপ কেমন, তার উদ্ধারকেও আল্লাহ সহজ করে দিন। এই প্রার্থনা আহমদ মুসা জানাল আল্লাহর কাছে।

আহমদ মুসা বিছানায় গা এলিয়ে দিল। বিরাট ধকল গেছে শরীরের উপর দিয়ে গত দুদিনে। শয্যাকে মনে হচ্ছে ভীষণ মধুর। মনটাকে বাইরের জগত থেকে ফিরিয়ে এনে আত্মস্থ হতে চেষ্টা করল নিশ্চিন্ত রেষ্টের জন্যে। কিন্তু আত্মস্থ হতেই মন চারপাশের জগত থেকে অন্য এক জগতে চলে গেল। মনের আকাশ জুড়ে ভেসে উঠল ডোনা জোসেফাইনের মুখ, হাসি মাখা প্রাণবন্ত একটি মুখ। মুখে এক চির বসন্তের রূপ। ওতে শীতের বিশীর্ণতা কিংবা বর্ষার কালো মেঘের ঘনঘটা কোনদিন সে দেখিনি। শত বেদনাতেও কোন অনুযোগ, অভিযোগ তার নেই। হঠাৎ বাঁধ ভাঙা এক আবেগ এসে আছড়ে পড়ল তার হৃদয়ে। আবেগটা অশ্রু হয়ে বেরিয়ে এল তার দুচোখ দিয়ে।

চোখ মুছল না আহমদ মুসা। গড়াতে লাগল অশ্রু তার দুগন্ড বেয়ে। এ অশ্রু তাকে যন্ত্রণা নয়, দিল প্রশান্তি।

আহমদ মুসা হিসেব করে দেখল নিউইয়র্ক থেকে ডোনা জোসেফাইনের সাথে কথা বলার পর আজ ৯ম দিন পার হয়ে যাচ্ছে। তার সাথে ওয়াদা আছে টেলিফোন করার ক্ষেত্রে কোনক্রমেই সাতদিন অতিক্রম করবে না। গত কিছুদিনের মধ্যে প্রথম ব্যতিক্রম এবার ঘটল। সাতদিনের পর আরও দুদিন চলে গেছে। নিশ্চয় সে অস্থির হয়ে উঠেছে। তাকে তো এখন এমন অস্থির হওয়া চলবে না। বাচ্চা হওয়ার সময়টা ঘনিয়ে আসছে। ঘড়ির দিকে তাকাল আহমদ মুসা। এখন হয় তো সে ঘুমিয়ে পড়েছে। থাক। সন্ধ্যার দিকে মানে সউদি আরবের সকাল বেলায় ভাল হবে টেলিফোন করা।

পাশ ফিরল আহমদ মুসা। কিন্তু ঘুমানোর চেষ্টা সফল হলো না। মোবাইল বেজে উঠল।

উঠে বসে টেনে নিল মোবাইল টেবিল থেকে। মোবাইলের স্ক্রীনের উপর চোখ রাখতেই দেল নাম্বারটি এফ.বি.আই. চীফ জর্জ আব্রাহাম জনসনের।

মোবাইলটি কানের কাছে তুলে ধরতেই ওপার থেকে জর্জ আব্রাহাম জনসন বলে উফল, ‘আসসালাম জোসেফ জন, সব ঠিকঠাক? কোন অসুবিধা হয়নি তো?’

‘জি জনাব, সব ঠিক-ঠাক। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু...........।’ কথা শেষ না করেই আহমদ মুসা থেমে গেল কিভাবে বলবে সেটা ভেবে নেবার জন্যে।

‘কিন্তু কি, জোসেফ জন?’

‘আপনি যে স্থানকে আমাদের জন্যে আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান বলে আমাদের এখানে এনেছেন। কিন্তু সে স্থানের মালিক এ বিষয়টা জানেন বলে আমার মনে হচ্ছে না।’

হো হো করে হেসে উঠল জর্জ আব্রাহাম জনসন। বলল, ‘ঠিকই বলেছ জোসেফ জন। তার অনুমতি ছাড়াই আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে ঠিক অনুমতি ছাড়াও নয়। ক’দিন আগে আমাকে সারাহ জেফারসন বলেছিল যে, তোমার মিশনের জন্যে তোমাকে অনেক দূর যেতে হতে পারে। তার জন্যে তোমাকে লম্বা একটা সময় আমেরিকায় থাকতে হবে। তোমার জন্যে নিরাপদ একটা ঠিকানা দরকার। এই কথা বলার সাথে সাথে সে বলেছিল তার ঐ ফিলাডেলফিয়ার বাড়ির কথা। ‘ফ্যামিলি মেমোরিয়াল’ গড়ে তোলার কাজ শুরু করতে বেশ সময় লাগবে। তার আগে বাড়িটা খালিই পড়ে থাকবে। গতকাল তোমার সাথে আলোচনা করার পর আমি চিন্তা করলাম ড. মুর হ্যামিল্টনকে নিয়ে তুমি কোথায় যেতে পার! কোন জায়গাটা তোমাদের জন্যে নিরাপদ হতে পারে! এটা চিন্তা করতে গিয়েই সারা জেফারসনের সেদিনের কথা মনে পড়েছিল। সংগে সংগেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে জুলিয়া রবার্টসকে এ ব্যবস্থার করথা জানিয়ে দিয়েছিলাম। পরে আমি সারা জেফারসনকে আমার গৃহিত ব্যবস্থার কথা বলি। সে খুশি হয়ে বলে, আংকেল, আমি যা করতাম, আপনি তাই করেছেন।’ সুতরাং জোসেফ জন, মালিকের অনুমতি নেই তা বলতে পার না।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমন্ত্রণ আর বাধ্য হয়ে আতিথ্য দান বোধ হয় এক জিনিস নয় জনাব।’

‘জোসেফ জন, তুমি জান তুমি ঠিক বলছ না।’ বলে একটু থেমেই সে আবার বলে উঠল, ‘আমি বুঝতে পারছি না তোমাদেরকে। তুমি যেমন সত্যকে পাশ কাটাতে চাচ্ছ, হাসির ছলে হলেও, তেমনি তার ব্যাপারটাও আমাকে বিস্মিত করেছে। আজ সাত সকালে সারা আমাকে টেলিফোন করে বলল, ‘সে ইউরোপ চলে যাচ্ছে তিন মাসের সফরে। তুরস্কের বসফরাস, মর্মরা ও কৃষ্ণ সাগর আর ইস্তাম্বুলের অলিতে-গলিতে প্রাণ খুলে ঘুরে বেড়াবে তিন মাস ধরে। তার একটা স্বপ্ন এটা। অথচ গত রাতে ১৫ মিনিট ধরে কথা হলো তার সাথে, কিছুই সে বলেনি। এত বড় একটা স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রোগ্রাম রাতের অবশিষ্ট কয়েক ঘণ্টায় কেন, কিভাবে সম্ভব হলো! যাক, এসব কথা জোসেফ জন। কাজের কথায় আসি। তোমাকে অবশিষ্ট কাজের ব্যাপারে দ্রুত হতে হবে। ড. মুর হ্যামিল্টনকে এভাবে বেশি দিন রাখা যাবে না। আর ওখানে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। হেনরিক হফম্যান লোকটা সবদিক দিয়েই ভাল এবং যোগ্য। মনে কর বাড়িটার এখন আমিই মালিক। আইনিসহ এর সবরকম তত্বাবধানের দায়িত্ব তিন মাসের জন্যে সারা আমাকেই দিয়ে গেছে।’ থামল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

আহমদ মুসা একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল। জর্জ আব্রাহামের শেষ কথায় সে সম্বিত ফিরে পেল। তাড়াতাড়ি কথা গুছিয়ে হাসার চেষ্টা করে বলল, ‘সুখবর জনাব, এখন ভাড়া দাবী না করলেই আমরা বাঁচি।’

‘জোসেফ জন, তোমরা আমেরিকার বাইরেটাই দেখ, অন্তর দেখ না।’ বলল আব্রাহাম জনসন।

‘অস্ত্রের কোন অন্তর থাকে না। আর ‘আমেরিকা’ আজ হৃদয়হীন সে অস্ত্রই হয়ে দাঁড়িয়েছে জনাব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক বললে না জোসেফ জন। আমেরিকার শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহায্য-সহযোগিতার বিশ্বব্যাপী ভূমিকা তুমি অস্বীকার করতে পারো না।’

‘ঠিক জনাব। তবে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকার শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহায্য-সহযোগিতা আমেরিকার শক্তির কাঁধে সোয়ার, অথবা আমেরিকার শক্তি তার শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহায্য-সহযোগিতার কাঁধে সওয়ার। সুতরাং শক্তি মানে অস্ত্রই আজ সবদিক থেকে আমেরিকার ইমেজ, অবয়ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।’

‘কিন্তু জোসেফ, আমেরিকা এটা নয়। এই অবয়ব আমেরিকার নেই। এক রাহুর গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসছে জর্জ ওয়াশিংটন, জেফারসন ও আব্রাহাম লিংকনের আমেরিকা। তোমার সাহায্য নতুন সূর্যের উদয় ঘটিয়েছে আমেরিকায়। তোমার বর্তমান অনুসন্ধান যদি সফল হয়, তাহলে আলোর পথে আমেরিকার আরেকটা উল্লস্ফন ঘটবে।’ জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল।

‘আমিন।’ আহমদ মুসা উচ্চারণ করল। তারপর বলল, ‘আমি কৃতজ্ঞ আপনার অমূল্য সহযোগিতার জন্যে।’

‘না জোসেফ জন। আমি তোমাকে সাহায্য করছি না, সাহায্য করছি আমাকে, আমার প্রিয় আমেরিকাকে।’

‘ঠিক বলেছেন জনাব। কিন্তু আমি কাজ করছি সত্যের জন্যে, আমার জাতির জন্যে। ধ্বংস টাওয়ারের তলদেশে যে সত্য লুক্কায়িত আছে তা যদি উদ্ধার হয়, তাহলে বিজয় হবে সত্যের। কিন্তু তার চেয়ে বড় বিষয় হলো বাঁচবো আমরা সন্ত্রাসী হওয়ার দায় থেকে। এ দায়-মুক্তিই আমার কাছে আজ সবচেয়ে বড়। এই বড় কাজে আপনার সাহায্য চাওয়ার চেয়েও অনেক বেশি। ধন্যবাদ আপনাকে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওয়েলকাম, জোসেফ জন। এখন বিদায় নেই জোসেফ।’ জর্জ আব্রাহাম বলল।

‘অশেষ ধন্যবাদ জনাব। বাই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আসসালাম। গুড বাই।’ বলে ওপার থেকে লাইনটা কাট করল জর্জ আব্রাহাম।

আহমদ মুসা মোবাইলটি রেখে দিয়ে আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

সব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চোখ বন্ধ করতে চেষ্টা করল।

আবার রুম টেলিফোন বেজে উঠল।

তুলল টেলিফোন আহমদ মুসা।

‘স্যরি জোসেফ, একটা জরুরি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। এখান থেকে আমার বাড়ি তো খুব কাছে। আমি মুর হ্যামিল্টন নাম নিয়ে অপরিচিতের মতই

কথা বলতে চাই। আমার বাড়ির সাথে কথা বলতে পারি?' বলল ওপ্রান্ত থেকে ড. হাইম হাইকেল।

'আমি বুঝতে পারছি আপনার মনের অবস্থা। কিন্তু না পারেন আপনি নিজ নাম নিয়ে টেলিফোন করতে, না পারেন মুর হ্যামিল্টন নাম নিয়ে, কারণ আপনার বাসার টেলিফোন মনিটর করা হয়। এখন আরও বেশি হচ্ছে। তারা ধরে ফেলবে।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু আমি মুর হ্যামিল্টন নাম নিয়ে করলে তারা চিনবে কি করে?' বলল ড. হাইম হাইকেল।

'জনাব, গত রাতে আপনি ডেট্রোয়েট থেকে উধাও হওয়ার পর একজন ড. মুর হ্যামিল্টন বিমানে ফিলাডেলফিয়া এসেছেন। সেই ড. মুর হ্যামিল্টন ড. হাইম হাইকেলের বাসায় টেলিফোন করেছেন, এর অর্থ ওদের কাছে কি দাঁড়াবে? তারা নিশ্চিত ধরে নিতে পারে ডেট্রোয়েট থেকে আসা মুর হ্যামিল্টনই আসলে ড. হাইম হাইকেল।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ, তুমি ঠিক বলেছ। এদিকটা আমার মাথায় আসেনি। সত্যিই তুমি অসাধারণ। গড ব্লেস ইউ।' বলল ড. হাইম হাইকেল।

'ধন্যবাদ। চিন্তা করবেন না। আমিই ওদের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেব।' আহমদ মুসা বলল।

'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। রাখছি টেলিফোন। ডিষ্টার্ব করার জন্যে দুঃখিত। বাই।'

বলে ওপার থেকে টেলিফোন রেখে দিল ড. হাইম হাইকেল।

আহমদ মুসা টেলিফোন রেখে আবার শুয়ে পড়ল।

শরীরটাকে নিঃশেষে ছেড়ে দিল বিছানার উপর নিরংকুশ এক বিশ্রামের সন্ধানে।

ড. হাইম হাইকেলের বেডরুম।

আহমদ মুসা একটা সোফায় বসে। তার মুখোমুখি সোফায় বসে ড. হাইম হাইকেল। আহমদ মুসা কথা বলছিল।

বলছিল পেছনের বিশাল কাহিনীটা। বলছিল ইউরোপের গোয়েন্দা সংস্থা 'স্পুটনিক'-এর ধ্বংস থেকে শুরু করে আজোরস দ্বীপের কথা, আজর ওয়াইজম্যানের সাথে সংঘাত সংঘর্ষের কথা, স্পুটনিকের গোয়েন্দাদের উদ্ধারের কথা এবং আজর ওয়াইজম্যান ড. হাইম হাইকেলের কনফেশন টেপ নিয়ে আসার কথা। বলছিল ড. হাইম হাইকেলের সন্ধানে আহমদ মুসার নিউইয়র্কে আসার কথা এবং তাকে সন্ধান করতে গিয়ে বিপদ ও ষড়যন্ত্রের চক্রজালে জড়িয়ে পড়ার কথা। বলছিল তার ফিলাডেলফিয়া যাওয়া এবং সেখানকার ঘটনা-দূর্ঘটনার কথা। সবশেষে বলেছিল তার ডেট্রোয়েটে আসা, বিপদে পড়া ও ড. হাইম হাইকেলকে উদ্ধারের কথা। সুদীর্ঘ কাহিনী সংক্ষেপে বলার পর ইতি টানতে গিয়ে বলল, 'স্যার, কাহিনীর এসব ভূমিকা, আসল কাহিনী শুরুই হয়নি।'

আহমদ মুসার কাহিনীর মধ্যে ডুবে গিয়েছিল ডক্টর হাইম হাইকেল। তার চোখে-মুখে আনন্দ, বেদনা ও বিস্ময় যেন একসাথে এসে আছড়ে পড়েছে।

আহমদ মুসা থামলেও ড. হাইম হাইকেল কোন কথা বলল না। তার চোখ দুটো যেন আঠার মত লেগে আছে আহমদ মুসার উপর। তার বোবা দৃষ্টিতে বিস্ময়-বিমুগ্ধতা।

এক সময় মুখটা নত হয়ে গেল ড. হাইম হাইকেলের। মুহূর্ত কয় পরে মুখ তুলে বলল, 'তুমি আরেক আরব্য রজনী শোনালে আহমদ মুসা! আনন্দের বিষয় হলো, এ আরব্য রজনী কল্পনার নয়।'

বলে থামল ড. হাইম হাইকেল। মুখটি আবার নিচু হলো তার। একটু পরেই মুখ তুলল। চোখ দু্ু্টি তার ছলছল করছে। বলল, 'বাস্তব এই আরব্য

রজনীর তুমি সিন্দাবাদ। আমার জন্যে, আমার পরিবারের জন্যে যা করেছ তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দেব না। শুধু প্রার্থনা করব, সিন্দাবাদের কিস্তি যেন কূলে ভিড়ে।'

একটু থামল আবার ড. হাইম হাইকেল। রুমাল দিয়ে চোখ দুটি মুছে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি আহমদ মুসা তোমার মিশন কি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, আমার কনফেশন টেপ স্পুটনিকের গোয়েন্দাদের হাতে গেল কি করে?'

আহমদ মুসা বলল, 'ঐ মহলের সাধারণ একটা ধারণা সেটা স্পুটনিক আপনার কাছ থেকে পেয়েছে। প্রথমে আমিও এটাই মনে করতাম। পরে আমি কামাল সুলাইমানের কাছে ঘটনা শুনেছি। কামাল..........।'

ড. হাইম হাইকেল কথা বলে ওঠায় আহমদ মুসা থেমে গেল। ড. হাইম হাইকেল বলছিল, 'মাফ করবেন, কে এই কামাল সুলাইমান?'

'তিনি স্পুটনিকের প্রধান গোয়েন্দা। আজর ওয়াইজম্যানের হাতে বন্দী সাত গোয়েন্দার তিনিও একজন।' আহমদ মুসা বলল।

'স্যরি, বলুন।' বলল ড. হাইম হাইকেল।

আহমদ মুসা শুরু করল, 'কামাল সুলাইমান বিশ বছর আগের টুইনটাওয়ার ধ্বংসের সেই কাশুন্দি ঘেঁটে সত্যটা বের করার জন্যে ওয়াশিংটন এসেছিলেন। এখানেই তিনি দেখা পেয়েছিলেন বৃদ্ধ এক ইহুদী পরিবারের। আর সেই ইহুদী পরিবারের এক বৃদ্ধের কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন কনফেশন টেপ।'

'তার নাম কি? রাব্বী উইলিয়াম কোলম্যান কোহেন?' জিজ্ঞাসা ড. হাইম হাইকেলের।

'জি।' বলল আহমদ মুসা।

কিছুটা বিস্ময় ফুটে উঠল ড. হাইম হাইকেলের চোখে-মুখে। বলল, 'অবিশ্বাস্য ঘটনা! এ ধরনের কনফেশন সিনাগগের বাইরে যাওয়ার বিধান নেই। তার উপর রাব্বী উইলিয়াম কোহেনের মত লোক এমন কিছু করতে পারেন না। তিনি কোন নীতি-বিরুদ্ধ কাজ করবেন বলে তা বিশ্বাস করা মুষ্কিল।'

'বিশ্বাস করা মুষ্কিল হলেও এটাই ঘটেছে এবং ঘটাটাই ছিল স্বাভাবিক।' আহমদ মুসা বলল।

'কি রকম?' বলল ড. হাইম হাইকেল।

'সে ছিল এক মজার ঘটনা। কামাল সুলাইমান একটু অসুস্থতা নিয়ে ওয়াশিংটনের একটা ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছিলেন। তার কক্ষের মুখোমুখি কক্ষটিতে ভর্তি হলেন একজন বৃদ্ধ রাব্বি। বয়সের ভারে অত্যন্ত দূর্বল, তার উপর অসুস্থ। একা হাঁটা তার জন্যে কষ্টকর ছিল। তার কোন এ্যাটেনডেন্ট ছিল না। ক্লিনিকের নার্স তাকে দেখাশুনা করতো, কিন্তু সবসময়ের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। মুখোমুখি দুঘরের দরজা ও জানালা একটু খোলা রাখলে দুঘর প্রায় এক হয়ে যেত। বৃদ্ধ রাব্বি ভর্তি হওয়ার প্রথম দিনেই যখন নার্স তাকে হুইল চেয়ার থেকে তুলে শুইয়ে দিতে হিমশিম খাচ্ছিল, তখন কামাল সুলাইমান তাকে সাহায্য করে। তারপর থেকে কামাল সুলাইমান বৃদ্ধের খোঁজ খবর রাখত এবং প্রয়োজনে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করতো। ব্যাপারটা অবশেষে তার রুটিন কাজে পরিণত হয়ে যায়। প্রথম দিকে এভাবে সহযোগিতা নিতে বৃদ্ধ সংকোচ বোধ করত, কিন্তু পরে কামাল সুলাইমানের আন্তরিকতায় তা দূর হয়ে যায়। বৃদ্ধ তাকে একদিন জিজ্ঞেস করে, তোমাদের সমাজে, দেশে ছেলে-সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনরা কি এভাবেই পিতা-মাতার সেবা করে? কামাল সুলাইমান বলেছিল, জ্বি হ্যাঁ। আর এটা ছেলে-সন্তানদের শুধু দায়িত্ব হিসেবে করা হয় না, এটা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তাদের ভালোবাসার অংশ। এইভাবে দুজনের মধ্যে পিতা-পুত্রের মত একটা হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়। এরই মধ্যে বৃদ্ধ রাব্বীর রোগের অবস্থা খারাপের দিকে যায়। তার সাথে দুজনের সম্পর্কও আরও গভীর হয়। বৃদ্ধ রাব্বীর আত্মীয় বলতে তেমন কেউ ছিল না। রুটিন খবরাখবর সিনাগগের লোকরাই নিত। স্বজন না থাকায় বিরাট শূন্যতার কিছুটা যেন বৃদ্ধের পূরণ হয় কামাল সুলাইমানকে দিয়ে। কামাল সুলাইমান মুসলমান এ কথা বৃদ্ধ শুরুতেই জেনে ফেলে। পরে বৃদ্ধের কক্ষেও কামাল সুলাইমান মাঝে মাঝে নামাজ পড়ত। কামাল সুলাইমান ধার্মিক বলে তার প্রতি বৃদ্ধের ভালোবাসা যেন আরও বেড়ে যায়। ধর্ম নিয়েও তাদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়। একদিন বৃদ্ধ তাকে বলে, 'এখনকার অবস্থা যাই হোক, ইহুদী ধর্ম

বা জুদাইজমের সবচেয়ে কাছের ধর্ম ইসলাম। ধর্ম অনুশীলনের দিক দিয়েও ইহুদী ও মুসলমানরা পরষ্পরের খুব কাছাকাছি। বিশ্বাস কর, আমি ইহুদী না হলে মুসলমান হতাম।' এধরনের কথায় কথায় একদিন বৃদ্ধ রাব্বী উইলিয়াম কোহেন কামাল সুলাইমানকে জিজ্ঞাসা করল, 'চাকুরি, ব্যবসা কোন উদ্দেশ্যই তোমার নেই, তাহলে কেন তুমি আমেরিকা এসেছ? তোমার মত কাজের ছেলে শুধু ঘুরে বেড়িয়ে দিনের পর দিন সময় নষ্ট করবে, এটা স্বাভাবিক নয়।' এইভাবে কথার প্যাঁচে পড়ে কামাল সুলাইমান তার উদ্দেশ্যের কথা বৃদ্ধকে বলে ফেলে এবং জানায় যে, সে নিশ্চিত নিউইয়র্কের টুইনটাওয়ার মুসলমানরা ধ্বংস করেনি। কে করেছে, সেটা উদ্ধার করতে তার সারা জীবনও যদি ব্যয় করতে হয় তবু সে করবে।' কামাল সুলাইমানের কথা বৃদ্ধ শুধু শোনে, কিছুই বলে না। ধীরে ধীরে প্রসংগটি সে এড়িয়ে যায় অন্য কথার ছলে। বৃদ্ধের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যায়। মুমূর্ষু অবস্থায় পৌছে যায় বৃদ্ধ রাব্বী উইলিয়াম কোহেন। মাঝে মাঝেই সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতে শুরু করে। জ্ঞান ফিরে পেলেই সে দেখত কামাল সুলাইমান শিয়রের কাছে বসে। এমনি একটা মুহূর্তে একদিন বৃদ্ধ কামাল সুলাইমানের একটা হাত তুলে নিল হাতে। বৃদ্ধের চোখ দুটি অশ্রু সজল হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধ বলে, 'প্রভুর কাছে যাওয়ার সময় আসন্ন। জানি না, প্রভুর সন্তুষ্টি আমি পাব কিনা। তাঁর জন্যেই আমি শেষ একটি কাজ করে যেতে চাই।' থামে বৃদ্ধ। কামাল সুলাইমান বলে, 'কি কাজ?' বৃদ্ধ বলে, 'তোমাকে সাহায্য করতে চাই।' 'কি সাহায্য?' বিস্মিত কণ্ঠে বলে কামাল সুলাইমান। বৃদ্ধ কোন উত্তর না দিয়ে বলে, 'ঐ আলমারিতে গতকাল সিনাগগ থেকে আনা যে ছোট্ট বাক্সটি আছে, সেটা আমার কাছে নিয়ে এস।' বাক্সটি কামাল সুলাইমান নিয়ে এলে বৃদ্ধ বাক্স থেকে ভেলভেটের একটা ছোট্ট থলে বের করে কামাল সুলাইমানের হাতে তুলে দেয়। ক্লান্ত কণ্ঠে ধুঁকতে ধুঁকতে বলে বৃদ্ধ, 'বেটা, তোমার জীবন তোমার কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, এই থলেটাও তোমার কাছে ততটাই গুরুত্বপূর্ণ।' বৃদ্ধ দম নেবার জন্যে থেমে যায়। কামাল সুলাইমান বিস্মিত কণ্ঠে বলে, 'জনাব এতে কি আছে?' বৃদ্ধ কষ্ট করে টেনে টেনে বলে, 'তোমরা যা খুঁজছ বেটা......।' কথাগুলো উচ্চারণ করেই বৃদ্ধের ক্লান্ত কণ্ঠ থেমে যায়, বুজে যায় চোখ দুটি। কয়েক মুহূর্ত পরে বৃদ্ধ

আবার চোখ খুলে বলে ক্ষীণ কণ্ঠে, 'বেটা, কোরআনের সুরা ইয়াসিন কি তোমার মুখস্থ আছে?' 'আছে।' বলে কামাল সুলাইমান। বৃদ্ধ উজ্জ্বল চোখে অস্ফুট কণ্ঠে বলে, 'তুমি ওটা পড়তে থাক, আর সাক্ষী থাক.....। আমি ঘুমাব।' বলে বৃদ্ধ চোখ বুজে। কামাল সুলাইমান তাড়াতাড়ি উঠে ডাক্তার, নার্সদের ডাকে। তারা ছুটে আসে। যখন ডাক্তার, নার্সরা বৃদ্ধকে নিয়ে ব্যস্ত, তখন কামাল সুলাইমান বৃদ্ধের শিয়রে দাঁড়িয়ে মনে মনে সুরা ইয়াসিন পাঠ করছিল। বৃদ্ধ আর চোখ খোলেনি। কামাল সুলাইমান ভেলভেটের সেই থলেতে পেয়েছিল আপনার কনফেশন টেপ।' থামল আহমদ মুসা।

নিরব রইল ড. হাইম হাইকেল। তার সমগ্র চেহারা বেদনায় পাংশু। আর অশ্রুর প্রস্রবণ বইছে তার চোখ থেকে। নত মুখে অনেকক্ষণ অশ্রু মোচনের পর মুখ তুলল। বলল, 'এখন আর আমার কোন বিস্ময় নেই আহমদ মুসা। মহান রাব্বী ঠিকই করেছেন। আর ইসলাম গ্রহণ করে তিনি তার বিজ্ঞতারই প্রমাণ রেখে গেছেন।'

'স্যার, সুরা ইয়াসিন পাঠ করতে বলা এবং সাক্ষী থাকতে বলার অর্থ আপনিও এটাই করেন?' বলল উৎসাহিত কণ্ঠে আহমদ মুসা।

'এর আর কোন অর্থ নেই বৎস।' বলল ড. হাইম হাইকেল।

'আল হামদুলিল্লাহ।' আহমদ মুসা বলল।

ড. হাইম হাইকেল মুখ তুলল। তাকাল আহমদ মুসার আনন্দিত মুখের দিকে। তারও মুখে একটু স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল। সোফায় হেলান দিয়ে বসল সে। বলল, 'এবার আহমদ মুসা, তোমার কথা বল।'

আহমদ মুসা একটু ভাবল। তারপর বলল, 'স্যার, রাব্বী উইলিয়াম কোহেন যে অমূল্য সাহায্য করেছেন, তার পরের সাহায্য আপনার কাছ থেকে চাই।'

'তার মানে আমার কনফেশনে প্রয়োজনীয় যে কথা নেই, তা জানতে চাও, তাতে যে ফাঁকগুলো আছে তা পূরণ করতে চাও। এক কথায় কনফেশনে যা বলা হয়েছে তাকে প্রমাণ করার উপকরণ চাও। এই তো?' বলল ড. হাইম হাইকেল।

আহমদ মুসার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'ঠিক স্যার।'

'কেন চাও? প্রতিশোধ নেবার জন্যে?' জিজ্ঞাসা ড. হাইম হাইকেলের।

'প্রতিশোধ নয় স্যার। সত্য উদ্ধার করতে চাই। বিশ্ববাসীকে সত্যটা জানাতে চাই। জাতির কপাল থেকে সন্ত্রাসী হওয়ার কলংক মুছে ফেলতে চাই।' আহমদ মুসা বলল।

'তোমার চাওয়া যুক্তিসংগত। আমার পাপ সাংঘাতিক কেউ জানুক। সত্যটা বাইরে যাক, এটাও আমার মনের একটা চাওয়া ছিল, যদিও মূলত আমার মানসিক শান্তির জন্যেই আমি কনফেশন করেছিলাম। আমি আনন্দিত যে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করছি, অন্যদিকে সত্যটা প্রকাশেরও একটা পথ হয়েছে। আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব।'

বলে একটু থেমেই ড. হাইম হাইকেল আবার বলে উঠল, 'তবে আমি বলার আগে তোমার কাছে কিছু শুনতে চাই। বিশ বছর আগের ঘটনা তো! তোমরা কতটুকু জান, জানার ক্ষেত্রে কতটা এগিয়েছ, ঘটনা সম্পর্কে কি ধরনের সিদ্ধান্তে পৌছার পরে তোমরা সত্য-সন্ধানের ফাইনাল ষ্টেজে নেমেছ, তা আমি জানতে চাই। প্রথমে বল, ঘটনার পেছনে কারা আছে বলে তোমরা মনে কর?'

'এ ব্যাপারে গত বিশ বছরে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। তার মধ্যে আমার মতে সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি হলো রুশ গবেষক ড. তাতিয়া কোরাজিনার কথা। তিনি এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, 'ঘটনা ঘটাবার জন্যে যে ১৪ জনকে দায়ী করা হয়েছিল, তারা এ ঘটনা ঘটায়নি। বরং ঘটনার সাথে জড়িত আছে বড় একটা গ্রুপ যারা পৃথিবীর রূপ পাল্টে দিতে চায়। এরা সাংঘাতিক শক্তিশালী। এদের আয়ত্বে আছে ৩০০ ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদ। গ্লোবাল গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এরা এদের ক্ষমতাকে বৈধতা দিতে চায়।' আহমদ মুসা বলল।

'তিনি তো সেই ক্ষমতাধরের নাম করেননি। কে সেই ক্ষমতাধর?' বলল ড. হাইম হাইকেল।

‘সেই শক্তিকে চিহ্নিত করার জন্যে দুটি বিষয়ের আলোচনা দরকার। এক. এই ঘটনার দ্বারা কে বা কারা লাভবান হয়েছে? দুই. ঘটনা সম্পর্কে কারা আগাম জানত?’

‘লাভবান হওয়ার বিষয়ে বলা যায়, এই ঘটনার দ্বারা দুনিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে লাভবান হয়েছে ইসরাইল। টুইনটাওয়ার ধ্বংসের আগে পশ্চিমী জনমতের মধ্যে ইসরাইলের প্রতি বিরক্তি এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভুতি বাড়ছিল। নাইন-ইলেভেনের দায় মুসলমানদের বিশেষ করে আরবদের ঘাড়ে চাপানোতে রাতারাতি অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। আরবদের প্রতি সন্দেহ-সংশয় যতটা বেড়েছে, ততটাই সহানুভুতি বেড়েছে ইসরাইলের জন্যে। অন্যদিকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আড়ালে ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কণ্ঠরোধ করার সুযোগ পেয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলে আফগানিস্তান ও ইরাক ধ্বংস হওয়া, সিরিয়া, লেবানন, মিসর, সউদি আরবের মত দেশের স্বাধীন গতি শৃঙ্খলিত হওয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিপুল পরিমাণ মার্কিন সৈন্য অনির্দিষ্টকালের জন্যে আসন গেড়ে বসায় ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে এবং মার্কিনীদের কাছে ইসরাইলের মূল্য আরও বেড়েছে। অনুরূপভাবে টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ফলে সীমাহীনভাবে লাভবান হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা যুদ্ধবাদী গোষ্ঠীর রাজনীতি। সবাই বলেছে টাওয়ার ধ্বংসের আগের পৃথিবী এবং পরের পৃথিবী এক পৃথিবী নয়। পৃথিবীর এই পরিবর্তন আমেরিকার ঐ যুদ্ধবাদী গ্রুপের পক্ষে গেছে। টাওয়ার ধ্বংসের জন্যে এমন এক শক্তিকে আমেরিকার তদানিন্তন সরকার দায়ী করে, যারা নির্দিষ্ট কিছু মানুষ কিংবা নির্দিষ্ট কোন দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মার্কিনীরা যখন যেখানে চাইবে, তাদের হাজির করবে এবং সেখানে হামলা তাদের জন্যে বৈধ হয়ে যাবে। আমেরিকা আফগানিস্তান ধ্বংস করেছে, কিন্তু অদৃশ্য শত্রু অদৃশ্যই রয়ে গেছে। যাদেরকে সন্দেহাতীতভাবে দোষী সাব্যস্ত করে সকল আইনের নাগালের বাইরে এক দ্বীপে বন্দী করে নির্যাতন চালিয়ে গেছে, তাদের টাওয়ার ধ্বংসের ব্যাপারে কোন দোষ পাওয়া যায়নি। সেই শক্তিকে অন্য এক রূপে ইরাকে আনা হয়েছে। তারপর ইরাক ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু সেই শক্তিকে পাওয়া গেল না ইরাকে, অদৃশ্য হয়ে

গেল। এইভাবে অদৃশ্য শত্রুকে আমেরিকার ক্ষমতাসীনরা যেখানে ইচ্ছা আবিষ্কার করেন এবং সেখানে আগাম আক্রমণ করা তার জন্যে বৈধ হয়ে যায়। এই সর্বব্যাপী শত্রুর ভয় আমেরিকান জনগণের মধ্যে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, আমেরিকান জনগণেরও মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয় আভ্যন্তরীন নিরাপত্তার নামে। একটি একক গ্লোবাল পাওয়ার লাভেল জন্যে যে সুযোগ তার প্রয়োজন ছিল, সেই সুযোগ নিউইয়র্কের লিবার্টি ও ডেমোক্রাসি টাওয়ার ধ্বংসের পর আমেরিকার যুদ্ধবাদী গোষ্ঠীর হাতে এসে যায়। সুতরাং টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে ইসরাইল এবং আমেরিকার একটি গোষ্ঠী লাভবান হয়। ঠিক এই ভাবেই ঘটনা থেকে লাভবান হওয়া এই দুপক্ষেরই জানা ছিল ঘটনা সম্পর্কে আগাম খবর। টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার আগের দুএকদিন শেয়ার মার্কেটে অস্বাভাবিক লেন-দেন হয়। যে ক্ষমতাধররা এর মাধ্যমে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার কামাই করে, তারা টাওয়ার ধ্বংস সম্পর্কে জানত। আমেরিকার সি.আই.এ, এফ.বি.আই-এর কাছে টাওয়ার ধ্বংস সম্পর্কে ইতিবাচক তথ্য ছিল, কিন্তু তারা প্রতিকারের পদক্ষেপ বা প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে সাহস করেনি। এ নিয়ে পরে লোক দেখানো তদন্ত কমিটিও গঠিত হয়। তদন্ত কমিটিও ফলপ্রসূ কিছু করেনি। সম্ভবত যে সাহস সি.আই.এ, এফ.বি.আই-এর ছিল না, সে সাহস তদন্ত কমিটিরও থাকার কথা নয়। অন্যদিকে টাওয়ার ধ্বংসের ব্যাপারে ইসরাইলের পুরোপুরি জানা ছিল। টুইনটাওয়ারে চার হাজার ইসরাইলী কাজ করত, কিন্তু কেউ ঘটনার দিন কাজে যায়নি। কোন দেশের কত লোক মারা গেছে তার একটা তালিকা প্রকাশ পায় ঘটনার পরপরই, তাতে কোন ইসরাইলীর নাম ছিল না। পরে অবশ্য এ তথ্য গোপন করার চেষ্টা করা হয়। ঘটনার একদিন পর জেরুসালেম পোষ্ট লিখে, চার হাজার ইসরাইলী নিখোঁজ। অন্যদিকে ঘটনার ৮ দিন পর ওয়াশিংটন পোষ্ট লিখে ১১৩ জন ইসরাইলী মারা গেছে। ওয়াশিংটন পোষ্ট এই কথা বলার একদিন পর সে সময়ের মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার বক্তব্যে বলেন ১৩০ জন ইসরাইলী নিহত হয়েছে। কিন্তু সবশেষে টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ১১ দিন পর নিউইয়র্ক টাইমস মাত্র তিনজন ইসরাইলী নিহত হবার খবর লিখে। তারাও আবার ছিল ভ্রমণকারী, টুইনটাওয়ারের চাকুরে নয়। দ্বিতীয়ত ঃ টুইন টাওয়ার এলাকায়

ঐ দিন ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রীর একটা প্রোগ্রাম ছিল। সব ঠিকঠাক ছিল, শেষ মুহূর্তে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থার নিষেধের কারণে প্রধানমন্ত্রী সেই প্রোগ্রাম বাতিল করেন। এফ.বি.আই. নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া সত্ত্বেও তিনি যাননি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইহুদীরা, ইসরাইলী গোয়েন্দা বিভাগ পুরোপুরি এবং আমেরিকার সি.আই.এ ও এফ.বি.আই-এর একটা অংশ টাওয়ার ধ্বংস সম্পর্কে জানত। এফ.বি.আই, সি.আই.এ শুধু জানত নয়, তারা ঘটনা ঘটার সময় প্রতিরোধ প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাই করেনি। মাঠ পর্যায়ের এফ.বি.আই কর্মীরা যে তথ্য উপরে পাঠিয়েছিল, তা চাপা দেয়া হয়। শুধু তাই নয়, দুনিয়ার সবাই জানে টাওয়ার ধ্বংসের আক্রমণকেও প্রতিরোধ করা হয়নি। প্রথম টাওয়ারে আক্রমণের পর দ্বিতীয় টাওয়ারে আক্রমণ করার মাঝে সময়ের যে ব্যবধান ছিল তাতে আমেরিকার সব জংগি বিমান, সব ক্ষেপণাস্ত্র সেখানে হাজির হতে পারতো। কিন্তু একটিও আসেনি। অথচ খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রথম টাওয়ারে আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে টিভিতে তার ছবি দেখেন, কিন্তু নিস্ক্রিয় থাকেন। আক্রমণ যেন হতে দেয়া হয়েছে। কেন তা করা হয়েছে? উত্তর একই রকম। কোন শক্তিমানের প্রতি ভয়ই সম্ভবত এই নিস্ক্রিয়তার কারণ।' থামল আহমদ মুসা।

থামতেই ড. হাইম হাইকেল বলে উঠল, 'কিন্তু বল, সেই শক্তিমান পক্ষ কে বলে তোমরা মনে কর?'

'কোন ব্যক্তি নয়, কোন বড় গ্রুপের কাজ এটা। এ গ্রুপের কোন বিশেষ নাম আছে কিনা, জানি না। এ গ্রুপের পরিচয়মূলক আরও কিছু তথ্য সামনে আনলে তাদের চিহ্নিত করা সহজ হতে পারে।' বলে একটু থামল আহমদ মুসা। সোজা হয়ে বসে আবার বলা শুরু করল, 'বলা হয় এই যুদ্ধবাজ গ্রুপের বিদেশ নীতি Neo-colonialism এর সমার্থক। এরা আমেরিকার সামরিক শক্তি বা গোয়েন্দা শক্তি ব্যাবহার করে ডিক্টেটর শাসক, ধনী রাজনৈতিক পরিবার, দুর্নীতি সৃষ্ট গণতান্ত্রিক দলকে কাজে লাগিয়ে বা তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে পৃথিবীর জাতিসমূহকে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। পেছনে তাকিয়ে আমেরিকার আগ্রাসন ও হস্তক্ষেপমূলক রেকর্ডের ও তৎপরতার দিকে নজর দিলে এর ডজন ডজন প্রমাণ পাওয়া যাবে, নাম উল্লেখ করে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই স্যার। কিন্তু

এর চেয়েও এই গ্রুপের ভয়ংকর কাজটা হলো অন্তর্ঘাত। এই গ্রুপের একটা পলিসি হলো, ধ্বংসাত্মক সন্ত্রাসী ঘটনা নিজেরা ঘটিয়ে তার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েতার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের বৈধতা দাঁড় করানো। ঠিক হিটলারের জার্মানীর পার্লামেন্ট পোড়ানোর ঘটনার মত। হিটলার তার পার্লামেন্টে আগুন দেয়ার জন্যে কম্যুনিষ্টদের দোষারোপ করেছিল। কম্যুনিষ্ট কার্ডধারী একজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল। সে লোক আগুন দেয়ার অপরাধ স্বীকারও করেছিল। কিন্তু পরে দুনিয়া জেনেছে এই পার্লামেন্ট পোড়ানোর কাজ খোদ হিটলার করিয়েছিল। প্রমাণ হয়েছিল হিটলারের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগী হারমান গোয়েরিং-এর অফিস থেকে পার্লামেন্ট ভবন পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই সুড়ঙ্গ পথে গিয়ে হিটলারের লোকরাই পার্লামেন্টে আগুন দিয়েছিল। মনে করা হচ্ছে হিটলারের এই কৌশলটাকেই আমেরিকার একটি গ্রুপ এবং ইসরাইল তার রাষ্ট্রীয় পলিসি হিসাবে গ্রহণ করেছে। আমেরিকার এই যুদ্ধবাজ গ্রুপটির 'নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রাভঙ্গ' করার মত এক জঘন্য ষড়যন্ত্র প্রেসিডেন্ট কেনেডি ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। সম্প্রতি এই গোপন কর্মকান্ডের বিবরণ তুলে ধরেছে আমেরিকার 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি'র উপর লেখা জেমস বামফোর্ড-এর বই 'Body of secrets : Anatomy of the Ultra-Secret National Security Agency'-এর লেখক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গোপন দলিলের ভিত্তিতে লিখেন যে, পৃথিবী কাঁপানো 'ইধু ড়ভ চরমং' ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা শক্তিমান গ্রুপ কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন জনমতকে খেপানো এবং কিউবার বিরুদ্ধে যুদ্ধে মার্কিন জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ধ্বংসাত্মক কিছু সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটানো ও তার দায় কিউবার উপর চাপানোর একটা পরিকল্পনা তৈরি করে। এই পরিকল্পিত সন্ত্রাসী ঘটনার মধ্যে ছিল আকস্মিক এক দাঙ্গা ও রায়ট সৃষ্টির মাধ্যমে কিউবা সন্নিহিত মার্কিন ঘাঁটি গুয়ানতানামোর জংগি বিমান, যুদ্ধ জাহাজ ও অস্ত্র-গুদাম উড়িয়ে দেয়া, ফ্লোরিডার মিয়ামী এরিয়া, এমন কি খোদ ওয়াশিংটন এলাকায় কম্যুনিষ্ট কিউবার নাম জড়িত করে সন্ত্রাসী অভিযান, ফ্লোরিডা উপকূলে কিউবান রিফুজী ভর্তি একটা বোট ডুবিয়ে দেয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাছাইকৃত

কিছু এলাকায় বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো এবং এর সাথে কিউবার সম্পর্ক থাকার দলিল তৈরি করে জনসমক্ষে প্রকাশ করা, 'মেকি রাশিয়ান বিমান' দ্বারা মার্কিন বেসামরিক বিমানকে হেনস্থা করা, মার্কিন বেসামরিক বিমান ও জলজাহাজ হাইজ্যাক, এমন কি বেসামরিক বিমান গুলী করে ভূপাতিত করা। এই সন্ত্রাস-পরিকল্পনা প্রেসিডেন্ট কেনেডির কাছে পেশ করা হলে তা এক কথায় তিনি বাতিল করে দেন। কেনেডি নিহত হবার পর 'Assassination Record Review Board' এই দলিল আবিষ্কার করে এবং 'ন্যাশনাল আরকাইভস' এই দলিল প্রকাশ করেছে।'

এ পর্যন্ত বলে আহমদ মুসা একটু থামল।

গম্ভীর ড. হাইম হাইকেল আহমদ মুসার দিকে পানির একটা গ্লাস ঠেলে দিয়ে বলল, 'গলা একটু ভিজিয়ে নাও।'

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা একটু পানি খেয়ে আবার বলা শুরু করল, 'প্রেসিডেন্ট কেনেডির আমলে শক্তিমান এই গ্রুপ যতটা শক্তিশালী ছিল, মনে হয় তারা পরে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়। টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার জলজ্যান্ত অনেক তথ্যকে তারা বেমালুম হজম করে ফেলেছে এবং ছয়কে নয়, আর নয়কে ছয় করতে সমর্থ হয়েছে। দুটাওয়ারের সাথে তৃতীয় একটা টাওয়ার সমূলে ধ্বংস হয়, অথচ বিমান তাকে আঘাত করেনি। এই টাওয়ার নিয়ে হৈ চৈ উঠেনি, কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাও দেয়া হয়নি এবং তদন্তও করা হয়নি। কোন সিভিলিয়ান এয়ার লাইনারের পক্ষে অত নিচুতে অমন গতিতে এগিয়ে গিয়ে ঐ রকম নিখুঁতভাবে আঘাত করা সম্ভব নয়। মার্কিন সামরিক বাহিনীর 'গ্লোবাল হক' (যা দেখতে বোয়িং ৭৩৭-এর মত) হাই আলটিচুড বিমান তার ভয়ানক শক্তিশালী 'দূর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা'র মাধ্যমেই মাত্র সিভিল এয়ারলাইনার দিয়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে। এই প্রবল সন্দেহ সম্পর্কেও তাদের কোন বক্তব্য নেই। তাছাড়া টাওয়ার বালি দিয়ে তৈরি ঘরের মত মাটির সাথে মিশে যায় প্লেনের আঘাতে নয়, বরং গোড়ায় সংঘটিত বিশেষ ধরনের বিস্ফোরণের মাধ্যমে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিল্ডিং এক্সপার্টরা এই ধরনের বক্তব্য দিয়েছে। কিন্তু অন্য সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের মত এ তথ্যও মানুষের কাছে পৌছতে পারেনি। অনুরূপভাবে সংশ্লিষ্ট

এয়ারলাইনগুলো প্রথমে যে যাত্রী-তালিকা প্রচার করে, তার মধ্যে কোন মুসলিম নাম ছিল না। পরে ১৪টি মুসলিম নাম তালিকায় আসে। কেন আসে, কিভাবে আসে, তার কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি। এমনি হাজারো তথ্যকে ঐ শক্তিমান গ্রুপটি দিনের আলোর মুখ দেখতে দেয়নি। এই গ্রুপটি এতই শক্তিশালী যে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকে, নিউইয়র্ক টাইমস-এর ভাষায়, আমেরিকান পলিসি কার্যত এদেরই হাতে রয়েছে।' থামল আবার আহমদ মুসা।

সোফায় হেলান দিয়ে বসা ড. হাইম হাইকেল সোজা হয়ে বসল। বলল, 'শক্তিমান পক্ষটির কাজ বললে, পরিচয় কিন্তু চিহ্নিত হলো না।'

ম্লান হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'কি নামে তাদের আমি ডাকব। পরোলোকগত মার্কিন লেখিকা গ্রেস হারসেলের কথা মনে পড়ছে। তিনি ছিলেন একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গ্রন্থকার। তিনি ইসরাইল সফর করেন। তার ভিত্তিতে একটা বই লেখেন। বইয়ের নাম হলো, 'জেরুসালেম সফর'। তিনি এ বইতে ইসরাইলী একজন সাংবাদিকের একটি গর্বিত উক্তি উদ্ধৃত করেন এবং সে উক্তি হলো, 'আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, বর্তমানে হোয়াইট হাউজ আমাদের হাতে, সিনেট আমাদের হাতে, নিউইয়র্ক টাইমস আমাদের হাতে, এমতাবস্থায় আমাদের প্রাণের সাথে আর কারও প্রাণের তুলনা হয় না।' লেখিকা গ্রেস হারসেল তার উক্ত বই সম্পর্কে একটা অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন তার অন্য একটি লিখায়। বলেছেন, 'আমার এ বই অনেক বাধা-বিপত্তি, চক্রান্তের বেড়াজাল পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হলো ১৯৮০ সালে। এরপর বেশ কয়েকটি গীর্জায় বক্তৃতা দেয়ার আমন্ত্রণ পেলাম। সাধারণ খৃষ্টানরা বিশ্বাস করতে চাইল না আমার পরিবেশিত তথ্যসমূহ। কারণ, তৎকালে ফিলিস্তিনীদের উপর ইসরাইলের বিভিন্ন অত্যাচার, ভূমি দখল, বাড়িঘর বিধ্বস্ত করা, যখন-তখন গ্রেফতার ও অন্যান্য নির্যাতন সম্পর্কে আমেরিকান প্রচার মাধ্যমে কোন খবরই থাকত না। বিভিন্ন গীর্জায় বক্তৃতাকালে আমি যখন শ্রোতাদের আমার নিজের দেখা ঘটনাবলীর বর্ণনা দিতাম, আমাকে প্রশ্ন করা হত 'আমরা তো সংবাদপত্রে এসব খবর পাই না?' অথচ ইসরাইলের মত ছোট দেশে যত আমেরিকান সাংবাদিক কাজ করে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেশেও এই পরিমাণ আমেরিকান সাংবাদিক নেই। এসব বিষয়

আমাকে মনে করিয়ে দিল, নিউইয়র্ক টাইমস, দি ওয়াল ষ্ট্রিট জার্নাল, দি ওয়াশিংটন পোষ্ট, আর আমাদের দেশের অন্যান্য প্রায় সব সংবাদপত্র হয় ইহুদী মালিকানাধীন অথবা ইহুদী নিয়ন্ত্রিত। আর এসব সংবাদপত্র ইসরাইলের সমর্থক। এতসব সাংবাদিক ইসরাইলে কাজ করে শুধু ইসরাইলীদের দৃষ্টিকোন থেকে সংবাদ প্রচারের জন্য।' লেখিকা গ্রেস হারসেলের এই মন্তব্য তার What Christians dorit know about Israil শীর্ষক প্রবন্ধে ছাপা হয়। গ্রেস হারসেলের এই বক্তব্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ফোর্থ ষ্টেট' অর্থাৎ মিডিয়া জগতকে যে অক্টোপাশের হাতে বন্দী দেখা গেছে, সেই অক্টোপাশই সেদিন হোয়াইট হাউজ ও পার্লামেন্টকে পুতুলে পরিণত করেছিল। এই অক্টোপাশ ইহুদী লবী এবং সরকার, সিনেট ও প্রশাসনে কর্মরত তাদের অনুগতরা এবং নব্যঔপনিবেশিক যুদ্ধবাজ এক গ্রুপ নিয়ে গঠিত ছিল বলে আমি মনে করি। এই অক্টোপাশই সেদিন টুইনটাওয়ার ধ্বংস করে তার দায় মুসলিম মৌলবাদী পরিচয়ের অদৃশ্য এক গ্রুপের ঘাড়ে চাপিয়ে পৃথিবীর সম্পদ, শক্তিকেন্দ্র দখল করার জন্যে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ার অবারিত সুযোগ করে নিয়েছিল। আমার কথা এ পর্যন্তই। এই কাজ সেদিন তারা কিভাবে করেছিল, সেটা আপনি বলবেন।' থামল আহমদ মুসা।

ড. হাইম হাইকেল চোখ বুজে সোফায় হেলান দিয়ে বসেছিল। সোজা হয়ে বসে বলল, 'ধন্যবাদ তোমাকে। দেখছি, কোন দিক দিয়েই তুমি কারও পেছনে নও। সব দিকেই তোমার চোখ আছে। জটিল একটা বিষয়কে সরল অবয়বে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছ। এখন তুমি একটা মডেল দাঁড় করাও যে ধরনের ছবি তুমি আঁকলে, তারা কিভাবে ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে।'

'এ ব্যাপারে নতুন কথা নেই। যে সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তাই আমি বলতে পারি।'

বলে একটু থামল। তারপর আবার বলা শুরু করল, 'আমার বিশ্বাস সিভিল এয়ার লাইনার বিমান টুইন টাওয়ারে আঘাত করেনি, আঘাত করানো হয়েছে। হয় মার্কিনী বিমান গ্লোব হক'-এর বিমান হাইজ্যাক-এর অপ্রতিরোধ্য টেকনলজি কিংবা টুইনটাওয়ারে রিমোর্ট কনট্রোল ব্যবস্থা সিভিল এয়ার লাইনের

বিমানকে টুইনটাওয়ারে টেনে নিয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত ঃ বিমান হামলায় টুইনটাওয়ার ধ্বংস হয়নি। বিল্ডিং এক্সপার্টদের যেমন, তেমনি আমারও বিশ্বাস, টুইনটাওয়ারের বটমে বিশেষ বিস্ফোরক পাতা হয়েছিল। তৃতীয়ত ঃ টুইনটাওয়ার আক্রমণকারী কোন বিমানই হাইজ্যাক হয়নি। বিমানের যাত্রী ও ক্লুরা বুঝতেই পারেনি বিমানের কি হয়েছে, কোথায় যাচ্ছে। বিমানের কম্যুনিকেশন নেটওয়ার্ক নষ্ট করার কারণে বিমান বন্দরের সাথে কোন যোগাযোগ করতে পারেনি। বিমানের ব্ল্যাকবক্স থেকে এর সাক্ষী পাওয়া যাবে বলে ব্ল্যাক বক্স গায়েব করা হয়। চতুর্থত ঃ বিমান হাইজ্যাক ও টুইনটাওয়ার ধ্বংসের জন্যে যে ১৫ জন মুসলমানকে দায়ী করা হয়েছে, তারা বিমানে থাকলেও তারা নির্দোষ যাত্রী ছিল মাত্র। এরা ছিল এফ.বি.আই অথবা ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের রিক্রুট। মিডিলইষ্ট, আফগানিস্তানসহ মুসলিম বিশ্বকে প্রাথমিকভাবে ঘটনার সাথে জড়াবার জন্যে এদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে। মুসলিম নামের অনেক মানুষকে তারা এ ধরনের কাজের জন্যে তৈরি করা রেখেছে।' থামল আহমদ মুসা।

গ্লাস থেকে একটু পানি খেল ড. হাইম হাইকেল। বলল, 'ধন্যবাদ আহমদ মুসা। তুমি অনেক ব্যাপারে অনেক কথা বলেছো। কিন্তু সব ব্যাপারে আমি বলতে পারবো না। কারণ ষড়যন্ত্রটা ছিল বেশ কয়েকভাগে বিভক্ত। একটার সাথে আরেকটার কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল না। যারা বিমানের দায়িত্বে ছিল, তাদের কাজ ছিল টাওয়ার আঘাতকারী বিমান এবং এই বিমানকে টাওয়ারের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে টেনে নেবার জন্যে 'গ্লোব হক' বিমানের ব্যবস্থা করা। অন্যদিকে টুইনটাওয়ারের দায়িত্ব যাদের ছিল, তাদের কাজ ছিল তিনটি। এক. টুইনটাওয়ারের আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরে ঠিক সময়ে 'সেফ ডেমোলিশন ডেভাইস' (SDD)-এর বিস্ফোরণ ঘটানো, দুই. টাওয়ারে আঘাতকারী বিমান যখন এক মাইলের মধ্যে আসবে তখন টুইনটাওয়ারে বসানো বাড়তি চুম্বকীয় রিমোট কনট্রোল ব্যবস্থাকে সক্রিয় করা যাতে টুইনটাওয়ারে আঘাত নিশ্চিত হয় এবং তিন. টুইনটাওয়ারে আঘাত-পরবর্তী সময়ে বিমানের ব্ল্যাকবক্সসহ নেগেটিভ ডকুমেন্ট গায়েব করা, জাল ডকুমেন্ট ছড়িয়ে রাখা। আর যারা 'গিনিপিগ' -এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল, তাদের কাজ ছিল 'গিনিপিগ'দের নাম নির্দিষ্ট দিনে

নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট এয়ার লাইনসের যাত্রী তালিকায় সন্নিবেশিত করা এবং টুইনটাওয়ারের ঘটনায় তাদের মৃত্যুর ব্যাপারটা প্রকাশ পাবার পর এদের হত্যা করা ও গায়েব করে ফেলা। এই তিনটি বিভাগ ছাড়াও..............।'

আহমদ মুসা ড. হাইম হাইকেলের কথার মাঝখানে বলে উঠল, 'গিনিপিগ' বলতে কাদের বুঝিয়েছেন? কথিত বিমান হাইজ্যাককারী মুসলমানদের?'

'হ্যাঁ, আহমদ মুসা।' বলল ড. হাইম হাইকেল।

'ধন্যবাদ স্যার। গত ২০ বছরে তাদের ক্ষেত্রে কেউ এই 'গিনিপিগ' শব্দ ব্যবহার করেনি। আপনিই মাত্র হতভাগ্যদের সঠিক অবস্থা তুলে ধরেছেন এই 'গিনিপিগ' শব্দ দ্বারা। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। স্যরি, কথার মাঝখানে কথা বলার জন্যে। বলুন স্যার।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ষড়যন্ত্রের যে তিনটি গ্রুপের কথা বলেছি, তা ছাড়াও ছিল আরেকটা গ্রুপ। এর নাম 'মিডিয়া গ্রুপ'। যার কাজ ছিল আমেরিকান এবং আমেরিকায় কার্যরত বিদেশী, বিশেষ করে ইউরোপীয় ও অষ্ট্রেলিয়ান মিডিয়াম্যানদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা এবং টাওয়ার ধ্বংসের পরপরই তাদের মাধ্যমে পরিকল্পিত নিউজ প্রচারের ব্যবস্থা করা। এই গ্রুপেরই আরেকটা বড় কাজ ছিল প্রশাসন, সরকার ও পার্লামেন্টের যে সব দায়িত্বশীল লোক অবাঞ্ছিত, বেফাঁস বা বৈরি কথা বলতে পারে তাদের কাছে ভুয়া তথ্য সরবরাহসহ সবরকম পন্থা প্রয়োগ করে তাদের মুখ বন্ধ রাখা বা বাঞ্ছিত কথা আদায় করা।' থামল ড. হাইম হাইকেল।

'কিন্তু স্যার, এই সব ভাগ বা গ্রুপ মিলে যে দল তার নাম তো বলেননি।' আহমদ মুসা বলল।

'দলের কোন নাম ছিল না। ইসরাইল সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ, আমেরিকার ইহুদীবাদী লবীর কেন্দ্রীয় একটা গ্রুপ এবং আমেরিকার সরকার, সেনাবাহিনী, প্রশাসন ও পার্লামেন্টে তাদের অনুগতদের সমন্বয়ে গড়া ছিল এই দল। তবে তাদের ষড়যন্ত্র-কর্মসূচীর একটা নাম ছিল। নামটা হলো, 'অপারেশন মেগা ফরচুন' সংক্ষেপে OMF । তাদের অপারেশন সংক্রান্ত সব দলিলে সংক্ষিপ্ত

'OMF' নাম ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের এই অপারেশনের নাম অনুসারে তাদের আমরা 'অপারেশন মেগা ফরচুন গ্রুপ' 'OMF Group' নামকরণ করতে পারি।' থামল ড. হাইম হাইকেল।

'তারপর স্যার।' তাকিদ আহমদ মুসার।

'তারপর তোমার জানার বিষয়টা কি?' ড. হাইম হাইকেলের জিজ্ঞাসা।

'অপারেশনের বিবরণ এবং তাদের অপরাধ প্রমাণ করার উপায়।' আহমদ মুসা বলল।

'বলেছি আহমদ মুসা, অপারেশন কয়েক ভাগে বিভক্ত ছিল। আমার ভাগের বিবরণই আমার জানা।' বলে একটু থামল ড. হাইম হাইকেল। মাথা নিচু করে একটু ভাবল বোধ হয়। তারপর মুখ তুলে কথা শুরু করল, 'আমি যাদের 'গিনিপিগ' বলেছি, তাদের দায়িত্বে আমি ছিলাম। তুমি ঠিকই বলেছ, শতশত মুসলিম নামের মানুষ ওদের হাতে রয়েছে, তাদেরকে সুবিধামত ব্যবহার করে ওরা মুসলমানদের ফাঁসাবার জন্যে। তুমি যেটা জান না সেটা হলো, বিশেষ করে আরব বিশ্ব ও আফ্রিকা থেকে সংগৃহীত হতাশ ও ভোগ-পাগল মুসলিম যুবকদের রিক্রুট করে এদের ব্রেনওয়াশ করা হয়েছে। এদেরকে পুতুলের মত কাজে লাগানো হয়েছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এরা উপকরণ হয়েছে। সন্ত্রাসের বিরদ্ধে যুদ্ধ জিইয়ে রাখার জন্যে সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রয়োজনে এদেরকেও ব্যবহার করা হয়েছে। আমার হাতে যাদের অর্পণ করা হয়েছিল, তারাই এদের কয়েকজন। এদের সংখ্যা ছিল উনিশ। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের প্রয়োজন চৌদ্দ জনের। সতর্কতার জন্যে ছয়জন বাড়তি লোক আনা হয়েছিল। ১৯ জনের প্রত্যেককেই আলাদাভাবে রাখা হয়েছিল স্বাধীনভাবে একটা সেট প্রোগ্রাম দিয়ে। কিন্তু তারা ছিল অদৃশ্য পাহারার অধীনে। এদের সবার জন্যে টিকিট করা হয় এবং বোর্ডিং কার্ড নেয়া হয়। কিন্তু এরা কেউ বিমানে ওঠেনি। বিশেষ ব্যবস্থায় এদের ডিপারচার লাউঞ্জ থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। টাওয়ার ধ্বংসের পর এয়ারলাইন্স প্রথমে যে যাত্রী তালিকা দেয় তা বিমানে উঠা যাত্রীদের কাছ থেকে সংগৃহীত বোর্ডিং কার্ডের কাউন্টার পার্টের ভিত্তিতে। পরে আমাদের 'মিডিয়া টিম'-এর হস্তক্ষেপে

এয়ারলাইন্স তাদের তালিকা সংশোধন করে বোর্ডিং কার্ড ইস্যুর ভিত্তিতে নতুন তালিকা প্রকাশ করে। যাতে আমাদের 'গিনিপিগ'দেরও নাম এসে যায়।'

থামল ড. হাইম হাইকেল। সোজা হয়ে বসে কয়েক ঢোক পানি খেল। বলতে শুরু করল আবার, 'ওদেরকে এয়ারপোর্ট থেকে বের করে এনে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী একটা কনটেইনারে তোলা হয়। তারপর শুরু হয় সোয়া তিনশ মাইলের দীর্ঘ পথ যাত্রা। যাত্রার লক্ষ্য বোষ্টনের উত্তর-পূর্বে মাউন্ট মার্সি এলাকার দুর্গম রেডইন্ডিয়ান বসতি। মাউন্ট মার্সি পর্বতটি অ্যাপালাচিয়ান পর্বতমালার উত্তর অংশের পশ্চিম ঢালে অবস্থিত। মাউন্ট মার্সির দক্ষিণ দিক অ্যাডিরমডাক পর্বতমালায় ঘেরা। আর পশ্চিমে মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে লেক অনটারিও এবং কানাডা সীমান্ত। লেক অনটারিও ও কানাডা সীমান্ত পশ্চিম দিক হয়ে উত্তর দিক ঘুরে অ্যাপালাচিয়ান পর্বতমালায় গিয়ে মিশেছে। এই বিচ্ছিন্ন, দূর্গম অঞ্চলে মাউন্ট মার্সির পশ্চিম পাদদেশে ঘনবনাকীর্ণ এক সবুজ উপত্যকা। এই উপত্যকা রেডইন্ডিয়ানদের জন্যে নির্দিষ্ট একটা স্থান। ঔপনিবেশিক বৃটিশদের সাথে ১৬৭৫-৭৬ সালে সংঘটিত বিখ্যাত 'কিলফিলিপ যুদ্ধে' পরাজিত ও বিতাড়িত রেডইন্ডিয়ানদের একটা ক্ষুদ্র অংশ চিড়িয়াখানার মত এই উপত্যকায় বাস করে। আমাদের টার্গেট ছিল এই রেডইন্ডিয়ানদের গোরস্থানের লাগোয়া পূর্ব নির্দিষ্ট একটা জায়গা। ভূ-তাত্বিক কর্মীর ছদ্মবেশে আমাদের লোকরা এখানে আগে থেকেই একটা গর্ত করে রেখেছিল। রাতের অন্ধকারে এখানেই পৌছা আমাদের লক্ষ্য। অ্যাপালাচিয়ান পর্বতমালার উত্তরাংশের মাউন্ট মার্সি বরাবর পৌছে সড়ক থেকে আমাদের গাড়ি রাস্তার চিহ্নহীন পাথুরে ভূমিতে নেমে যায়। তারপর পাহাড়ের উপত্যকা, সুড়ঙ্গ ধরে ২০ কিলোমিটার যাওয়ার পর আমাদের গাড়ি পৌছল রেডইন্ডিয়ানদের সেই গোরস্থানের কাছে। দিনটা ছিল ইন্ডিয়ানদের বাৎসরিক সম্মিলিত প্রার্থনা দিবস। রেডইন্ডিয়ান বসতির ওয়ান টু অল গিয়ে জড়ো হয়েছে তাদের সর্দারের বাড়িতে। এই সুযোগ নেয়অর জন্যেই দিনটা আমরা ঠিক করেছিলাম। গোরস্থান থেকে নিরাপদ দূরত্বে আমাদের গাড়ি দাঁড়াবার পর রাতের জন্যে অপেক্ষা করা হয়। অপেক্ষাকালীন এই সময়েই কনটেইনারে বিশেষ এক ধরনের গ্যাস প্রয়োগ করে

তাদের হত্যা করা হয়। তারপর রাতের অন্ধকারে রেডইন্ডিয়ানদের কবর লাগোয়া গর্তে ওদের গণকবর দিয়ে আমাদের গাড়ি ফিরে আসে বোষ্টনে। আমার দায়িত্বাধীন ভাগের কাজের এভাবেই ইতি হয়।'

থামল ড. হাইম হাইকেল। তার মুখ গম্ভীর। অপরাধ ও যন্ত্রণার কালো ছায়া তাতে।

'আপনার মধ্যে এই অন্যায়ের প্রতিক্রিয়া কবে শুরু হয়?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'তখন আমি ছিলাম কঠোর মনোভাবের এক ইহুদীবাদী কর্মী। আমি তখন মনে করতাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদী স্বার্থ রক্ষা ও গোটা দুনিয়ায় ইহুদী ইমেজ রক্ষা এবং ইহুদীদের উপর উদ্যত কৃপাণ সরিয়ে মুসলমানদের উপর ঘুরিয়ে দেবার জন্যে এই কাজের কোন বিকল্প নেই। নিরপরাধ লোকদের কন্টেইনারে তুলে নৃশংসভাবে হত্যা করা থেকেই আমার মনে প্রতিবাদ দানা বাঁধতে থাকে। এর সাথে যোগ হলো নিরপরাধ বিমানযাত্রীদের মর্মান্তিক মৃত্যু। কিন্তু এ সবের চেয়েও আমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল সর্বব্যাপী সীমাহীন বীভৎস মিথ্যাচার এবং মিথ্যার উপর ভর করে মুসলিম নামের নিরপরাধ লাখো বনি আদমের উপর হত্যা, ধ্বংস ও দখল চাপিয়ে দেবার বিষয়টি। 'অপারেশন মেগা ফরচুন'কে আমি আমার ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবেই গ্রহণ করেছিলাম। পরে সব দেখে আমার মনে হলো আমরা আমাদের ধর্মকেই হত্যা করছি। আমার আরও মনে হলো, ইহুদীদের 'হাসকালা' ধর্মমত বৈষয়িক উন্নতি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আমাদেরকে ধর্মহীন করে দিয়েছে। এই চিন্তা থেকেই ইহুদী বিশ্বাসের 'হাসিডিক' ধর্মমত আমি গ্রহণ করি। 'হাসিডিক' ধর্মমত 'দয়া' ও সানন্দ উপাসনার দিকেই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে বেশি। এই ধর্মমত গ্রহণের পরেই আমি মনের পাপ-যন্ত্রণা লাঘবের জন্যে সিনাগগে গিয়ে ঈশ্বরের কাছে কনফেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমি মনে করছি, ঈশ্বর আমার কনফেশন গ্রহণ করেছেন। কনফেশনকে কেন্দ্র করে আমার যে দুঃখ-কষ্ট তা আমি মনে করছি ঈশ্বরেরই দেয়া আমার পাপ মোচনের জন্যে। সবশেষে তোমার আগমন,

আমাকে উদ্ধার, আমার কাছে সাহায্য চাওয়া সবই ঈশ্বরই করাচ্ছেন। সুতরাং আমি তোমাকে সাহায্য করব, এটা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা।'

দীর্ঘ বক্তব্যের পর থামল ড. হাইম হাইকেল।

'ধন্যবাদ স্যার', বলে শুরু করল আহমদ মুসা, 'কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহৃত কজনকে কবর দেবার জন্যে অত দূরের স্থান বেছে নিলেন কেন?'

'দুটি বিবেচনায় আমরা এটা করেছি। এক. রেডইন্ডিয়ানদের এই এলাকাটা দূর্গম ও নিরাপদ। কারও পক্ষে ওখানে যাওয়া এবং খোঁজ করা দুই-ই কঠিন। দুই. কোন কারণে সন্দেহ হলেও গণকবর খোড়াখুড়ি করা সম্ভব হবে না। রেডইন্ডিয়ানরা এটা করার কাউকে সুযোগ দেবে না। কারণ তারা সংগতভাবেই ভয় করবে গণকবর ও গণহত্যার সাথে ওদের সম্পর্কিত করার চেষ্টা করা হবে। দ্বিতীয়ত. এই খননকে তাদের গোরস্থানের শান্তি ও সম্মানের খেলাফ মনে করবে রেডইন্ডিয়ানরা।' বলল ড. হাইম হাইকেল।

ড. হাইম হাইকেল থামতেই আহমদ মুসা বলল, 'ষড়যন্ত্রের আরও বিভাগ আছে বলেছেন আপনি। কিন্তু তাদের কাউকেই আপনি চেনেন না?'

'হ্যাঁ অনেককেই চিনি। ইহুদী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কট্টর ইহুদীবাদী অধ্যাপক এবং একটি ঐতিহাসিক ইহুদী পরিবারের সন্তান হিসেবে 'ও.এম.এফ গ্রুপ' (OMF Group)-এর কাছে আমার বিশেষ একটা মর্যাদা ছিল। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে অনেকের কাছে আমার অবাধ যাতায়াত ছিল। বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত হলেও অনেক কিছুই আমি শুনতাম ও জানার সুযোগ হতো।' ড. হাইম হাইকেল বলল।

'তাহলে অন্যান্য গ্রুপের ব্যাপারেও আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন।' বলল আহমদ মুসা।

'তোমার কি প্রয়োজন, কি জানতে চাও সেটা বললে বুঝা যাবে আমি ঐ বিষয় জানি কিনা।' ড. হাইম হাইকেল বলল।

'ধন্যবাদ স্যার। আমার অনুসন্ধানের বিষয় হলো টাওয়ার ধ্বংসের কাজ কারা করেছে, তা বের করা এবং তার পক্ষে প্রমাণ যোগাড় করা। এখন দেখা

যাচ্ছে ‘ও.এম.এফ গ্রুপ’ এটা করেছে। এই সত্যের পক্ষে আমি প্রমাণ যোগাড় করতে চাই।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথার তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না ড. হাইম হাইকেল। সে সোফায় গা এলিয়ে দিল। তার চোখে-মুখে ভাবনার প্রকাশ ঘটল। অল্পক্ষণ পর সোফা থেকে গা না তুলেই বলল, ‘আহমদ মুসা, এই বিষয়টা আমি কোনদিন চিন্তা করেই দেখিনি। ঘটনার বিবরণ বর্ণনা করা যায়, কিন্তু তা প্রমাণ করা কঠিন। ‘ও.এম.এফ গ্রুপ’ টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা ঘটিয়েছে, এই সত্য তোমার কথায় এসেছে, ঘটকদের একজন হিসাবে আমিও বলেছি, কিন্তু প্রমাণ করাটা বলার মত সহজ নয়।’ থামল ড. হাইম হাইকেল।

আহমদ মুসা গম্ভীর। সোজা হয়ে সোফায় বসল। বলল, ‘কিন্তু প্রমাণ করার মিশন নিয়েই আমি আমেরিকায় এসেছি। এ মিশন সম্পূর্ণ করেই আমি ফিরব ইনশাআল্লাহ।’

সোফায় সোজা হয়ে বসল ড. হাইম হাইকেল। তার ভ্রুকুঞ্চিত। ভাবছে সে মুখ নিচু করে। এক সময় মুখ তুলে বলল, ‘তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি আহমদ মুসা। তোমার কথা আমার মধ্যে সাহসের সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে, অসম্ভব বলে কিছুই নেই। কিন্তু আমার সামনে অথৈ অন্ধকার সমুদ্র, বাতিঘরের আলো কোথাও দেখি না।’

ভাবছিল আহমদ মুসাও। বলল, ‘স্যার, প্রমাণের বহু বিষয় আছে। কিন্তু অত কিছুর প্রয়োজন নেই। মৌলিক ধরনের কয়েকটা বড় বিষয় প্রমাণ করতে পারলেই আমাদের হয়ে যায়।’

‘সে বিষয়গুলো কি?’ জিজ্ঞাসা ড. হাইম হাইকেলের।

‘প্রথম বিষয় হলো, ষড়যন্ত্রের যে অংশটা আপনি সম্পাদন করেছেন, তা থেকে প্রমাণ করা যে, হাইজ্যাকাররা বিমান হাইজ্যাক করে তা দিয়ে টাওয়ার ধ্বংস করেছে, এ কথা মিথ্যা এবং কথিত হাইজ্যাকারদেরকে টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার ১২ ঘণ্টা পর হত্যা করে গণকবর দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত. প্রমাণ করা যে, হাইজ্যাকাররা নয়, ‘গ্লোব হক’ ও টুইনটাওয়ারে পাতা চুম্বকীয় রিমোট কনট্রোল ব্যবস্থার সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে যাত্রী বিমান টুইনটাওয়ারে আঘাত করতে সমর্থ

হয়। তৃতীয়ত. টুইনটাওয়ার যাত্রী বিমান দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয় ঠিকই, তবে টুইনটাওয়ার গুড়িয়ে ধ্বসে পড়ে টুইনটাওয়ারের গোড়ায় পাতা 'সেফ ডেমোলিশ ডেভাইস'-এর বিস্ফোরণ ঘটানোর ফলে। এটা প্রমাণ করতে হবে। এই তিনটি বিষয়ের প্রমাণই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।'

ড. হাইম হাইকেল হা করে তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বলল, 'ধন্যবাদ তোমাকে আহমদ মুসা। ঠিকই বলেছ তুমি। এখন আমার মনে হচ্ছে এই সহজ বিষয়টি আমার মাথায় আসেনি কেন?'

বলে ড. হাইম হাইকেল মুহূর্তের জন্যে একটু থামল। পরক্ষণেই আবার শুরু করল, 'কিন্তু প্রমাণ হওয়া এবং গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার কাজ কিভাবে হবে? ধর প্রথমটার কথাই। গণকবরে যাদের হাড়গোড় আছে, তারাই ও.এম.এফ গ্রুপ কথিত বিমান হাইজ্যাককারী তা প্রমাণ করতে হবে। কিভাবে করবে? গোপনে ওখানে গিয়ে কবর থেকে হাড়গোড় তুলে আনা খুবই কঠিন। তার পরেও না হয় গেলে, হাড়গোড় তুললে, নিয়ে এলে, কার্বন টেষ্ট, ফরেনসিক টেষ্টসহ বিভিন্ন আইডেনটিফিকেশন টেষ্ট দ্বারা না হয় প্রমাণ করলে ওগুলোই সেই বহুল কথিত হাইজ্যাকারদের দেহ এবং ওদেরকে হত্যা করা হয়েছে গ্যাস প্রয়োগে (যে গ্যাস বিমানে থাকে না) আর হত্যার সেই ঘটনা ঘটেছে টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ১২ ঘণ্টার পর। কিন্তু তোমার দাবীগুলো অথেনটিসিটি পাবে কিভাবে, দুনিয়ার মানুষ গ্রহণ করবে কেন?'

চিন্তা করছিল আহমদ মুসা। এক সময় তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। ড. হাইম হাইকেল থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'স্যার আমি যা ভাবছি তা যদি আমি করতে পারি, তাহলে গণকবর আবিষ্কারের কথা গোটা দুনিয়া জানবে এবং তাদের ফরেনসিক টেষ্ট, দাঁত টেষ্ট, ইত্যাদি সব কিছুই গোটা দুনিয়াকে জানিয়েই করা হবে। অতএব বিশ্বাসযোগ্যতা না পাবার প্রশ্ন নেই।'

'এই অসাধ্য সাধন কিভাবে সম্ভব?' জিজ্ঞাসা ড. হাইম হাইকেলের।

'আল্লাহর সাহায্য থাকলে সবই সম্ভব। আপনাকে সব বলব স্যার।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা কথা শেষ করেই ড. হাইম হাইকেলের কিছু বলার আগেই আবার মুখ খুলল। বলল, 'স্যার, প্রমাণের দ্বিতীয় বিষয়টা নিয়ে আমি চিন্তায় আছি। এ ব্যাপারে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা ভেবে দেখতে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।'

আহমদ মুসার কথা ড. হাইম হাইকেল মনোযোগ দিয়ে শুনল। কিন্তু কোন উত্তর দিল না। তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। ভাবছে সে। অনেকক্ষণ পর মুখ তুলল। বলল, 'প্রমাণের জন্য অন্তত প্রয়োজন ঐ দিন ঐ কাজে 'গ্লোব হক'-এর 'অফিসিয়াল লগ' ও 'অর্ডার শীট' উদ্ধার করা। আর............।'

ড. হাইম হাইকেলের কথা মাঝখানেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'এ 'লগ' ও 'অর্ডার শীট' কোথায় পাওয়া যাবে?'

'দৃশ্যত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'এয়ার সেফটি সার্ভিস' (ASS) ডিভিশনে এটা থাকার কথা। কিন্তু আমি বিষয়টা সম্পর্কে নিশ্চিত নই।' বলল ড. হাইম হাইকেল।

একটা দম নিয়েই আবার বলে উঠল, 'টাওয়ার ধ্বংসে 'সেফ ডেমোলিশন ডেভাইস' যে ব্যবহার হয়েছিল, সেটা প্রমাণ করার জন্যে ধ্বংস টাওয়ারের ডাষ্ট-এর বিশেষ ধরনের পরীক্ষা প্রয়োজন।'

'কিন্তু ধ্বংস টাওয়ারের ডাষ্ট এখন এত বছর পর কোথায় পাওয়া যাবে? টুইনটাওয়ারের জায়গায় তো নতুন টাওয়ার গড়ে তুলে ঐ এলাকা ঢেকে ফেলা হয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

'নিউইয়র্কের তিনটি প্রতিষ্ঠানে এই ডাষ্ট পাওয়া যাবে। ইন্টারন্যাশনাল টেরর মিউজিয়াম (ITM), 'বিল্ডিং হিষ্টরী মিউজিয়াম' (BHM) এবং ধ্বংস টাওয়ারের স্থানে নির্মিত নতুন টাওয়ার কমপ্লেক্সের 'লিভিং মেমরি ল্যাবরেটরী'তে পাওয়া যাবে।' কিন্তু এই ডাষ্ট পাউডারটাই বড় কথা নয়, এর প্রামাণ্য টেষ্ট রেজাল্ট প্রয়োজন।' বলল ড. হাইম হাইকেল।

'ধন্যবাদ স্যার আপনার দেয়া তথ্যগুলো অমূল্য।' আহমদ মুসা বলল।

‘কি অমূল্য বলছ। তুমি চেষ্টা করলেও এ তথ্যগুলো যোগাড় করতে পারতে। আসলেই তোমাকে সাহায্য করার মত তেমন কিছু আমার কাছে নেই।’ বলল ড. হাইম হাইকেল।

‘বলেন কি স্যার! আপনার প্রধান যে তথ্যের জন্য এসেছিলাম তা পেয়ে গেছি। তথাকথিত বিমান হাইজ্যাকারদের সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন, এই একটা তথ্যই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। শুধু একেই যদি আমরা সত্য প্রমাণ করতে পারি, তাহলে মুসলমানদের কপাল থেকে সন্ত্রাসী হওয়ার কলংক তিলক মুছে ফেলা যায়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু ‘ও.এম.এফ গ্রুপ’-এর সর্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করতে হলে গোটা ষড়যন্ত্রকেই দিনের আলোতে আনতে হবে এবং এটা তুমিই পারবে আহমদ মুসা। আমেরিকান জনগণও তোমার কাছে আরও বেশি কৃতজ্ঞ হবে। তুমি আগেও তাদের অমূল্য উপকার করেছ। এই উপকার যদি তুমি করতে পার, তাহলে আমেরিকান জনগণ পুরোপুরিই মুক্ত হবে কুগ্রহের কবল থেকে।’ বলল ড. হাইম হাইকেল।

এ কথাগুলোর খুব অল্পই আহমদ মুসার কানে প্রবেশ করেছে। আহমদ মুসা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তার মোবাইল নিয়ে।

ড. হাইম হাইকেল থামতেই আহমদ মুসা বলল, ‘এক্সকিউজ মি স্যার, আমি কয়েকটি টেলিফোন করে নিতে চাই।’

বলে আহমদ মুসা প্রথমে টেলিফোন করল কামাল সুলাইমানকে জার্মানীতে। বলল, ‘কামাল জার্মানীর ‘মিউজিয়াম অব ওয়ার্ল্ড ইভেন্টস’-এর প্রেসিডেন্ট মি. ব্রেম্যান তোমার বন্ধু, তাই না?’

‘হ্যাঁ।’ ওপার থেকে বলল কামাল সুলাইমান।

‘তুমি মিউজিয়ামের তরফ থেকে মি. ব্রেম্যানের একটি করে চিঠি নিয়ে এস নিউইয়র্কের ‘ইন্টারন্যাশনাল টেরর মিউজিয়াম’-এর প্রেসিডেন্ট, ‘বিল্ডিং হিষ্ট্রি মিউজিয়াম’-এর প্রেসিডেন্ট এবং গ্রাউন্ড ফরচুন’-এর নতুন টাওয়ার কমপ্লেক্সের ‘লিভিং মেমরী ল্যাবরেটরী’-এর ডিরেক্টরের নামে। এই পৃথক পৃথক চিঠিতে মিউজিয়ামের তরফ থেকে লিখতে হবে মিউজিয়ামের রেকর্ড ও প্রদর্শনী

বস্তু হিসাবে পৃথক দু'প্যাকেটে ৫ গ্রাম করে টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ডাষ্ট ডোনেট করার জন্যে। তিনটি চিঠি নিয়ে মিউজিয়ামের প্রতিনিধি হিসাবে তোমাকে এক সপ্তাহের মধ্যে নিউইয়র্ক আসতে হবে।' বলল আহমদ মুসা।

'বুঝেছি ভাইয়া। আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে। ড. মুর হ্যামিল্টনের সাথে আসল কথাটা হয়েছে?' ওপার থেকে বলল কামাল সুলাইমান।

'হ্যাঁ। তার প্রেক্ষিতেই তো এ জিনিসগুলোর প্রয়োজন। কথা শেষ। এস। আস্সালামু আলাইকুম।'

আহমদ মুসা কল অফ করে দিয়ে নতুন আরেকটা নাম্বারে ডায়াল করল।

ডায়াল করল ইলিনয় ষ্টেটের রেডইন্ডিয়ান রিজার্ভ কাহোকিয়ার অধ্যাপক আরাপাহোর কাছে।

ওপার থেকে প্রফেসর আরাপাহোর কণ্ঠ শুনেই আহমদ মুসা সালাম দিয়ে বলল, 'স্যার আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

প্রফেসর আরাপাহো আহমদ মুসাকে সালাম দিয়ে বলল, 'তোমাকে চিনব না? তোমার কণ্ঠের একটা শব্দ কানে আসাই যথেষ্ট তোমাকে চেনার জন্যে। কেমন আছ তুমি? কেমন আছে বউমা? তুমি কি আমেরিকায়? না আমেরিকার বাইরে? তুমি আজোরাস আইল্যান্ডে এসেছ তা জানিয়েছ। তারপর আর কোন খবর জানি না।'

'আমরা সবাই ভাল আছি জনাব। আমি নিউইয়র্ক থেকে বলছি। ওগলালা বোধ হয় কাহোকিয়ায়। কেমন আছে সে?' আহমদ মুসা বলল।

'ওগলালা আমার পাশে বসে। টেলিফোনটা নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে আছে। তাকে দেব টেলিফোন। তবে তার আগে তোমার কথা শুনি। নিউইয়র্কে কোন কাজে এসেছ নিশ্চয়?' বলল প্রফেসর আরাপাহো।

'জি, কাজ নিয়ে এসেছি এবং আপনার সাহায্য চাই।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ তোমাকে এজন্যে যে, আমার কথা তুমি চিন্তা করেছ। বল তোমার কি প্রয়োজন, আমার সব কিছু তোমার জন্যে।' বলল প্রফেসর আরাপাহো।

'ধন্যবাদ স্যার।' বলে একটু থামল। তারপর বলল, 'আপনার কাছে মাউন্ট মার্সি'র ইন্ডিয়ান রিজার্ভ-এর কথা শুনেছিলাম।'

'হ্যাঁ শুনেছিলে। কি হয়েছে? হঠাৎ একথা তুলছ কেন?'

'মাউন্ট মার্সি'র ইন্ডিয়ান রিজার্ভ-এর সাথে আপনার পরিচয় কেমন স্যার?'

'ভাল। ওখানে এক অনুসন্ধান কাজে আমি তিনমাস ছিলাম। তাছাড়াও বেশ কয়েকবার গেছি আমি সেখানে।'

'স্যার আপনাকে আবার এক অনুসন্ধানে যেতে হবে।' বলল আহমদ মুসা সোৎসাহে।

'আমাকে যেতে হবে এক অনুসন্ধানে? অনুসন্ধানটা তোমার এবং সেটা খুব বড় বিষয় হবে নিশ্চয়? কারণ তোমার হাতযশ বড় বিষয়কেই সব সময় টানে।' বলল প্রফেসর আরাপাহো। তার কণ্ঠে আনন্দের সুর।

'ঠিক ধরেছেন স্যঅর, সেটা হবে আমার অনুসন্ধান এবং তা বড় বিষয়ও।' বলল আহমদ মুসা।

'তোমার যদি বিষয় হয়,তাহলে আমি একবার নয় একশ'বার যেতে রাজি আছি। কারণ তোমার বিষয় মানেই হলো মানুষের কোন কল্যানের কাজ, এখন বল কবে যেতে হবে?' প্রফেসর আরাপাহো বলল।

'এক সপ্তাহ পর যে কোন দিন আপনার সুবিধা অনুসারে। আমিও আপনার সাথী হতে চাই।'

'তুমিও যাবে? চমৎকার। দিনগুলো তাহলে তো উৎসবের হবে। তাহলে সপ্তাহ পর দিন ঠিক করে তোমাকে জানাব। কিন্তু কাজটা কি বললে না তো?'

'সাক্ষাতে ছাড়া বলা যাবে না। তবে আপনাকে মাউন্ট মার্সি'র রেডইন্ডিয়ান রিজার্ভে যেতে হবে প্রতœতাত্বিক অনুসন্ধানের এক মিশন নিয়ে, যাতে স্বাভাবিকভাবে খোঁড়া-খুঁড়িরও প্রোগ্রাম থাকবে। সেখানকার সবার এটা জানা উচিত।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে। আমি বুঝেছি। তোমার কাজ যাই হোক, কাজের প্রকৃতি বুঝেছি। আমি আজই মাউন্ট মার্সি'র কমিউনিটি সরদারকে লিখে জানাচ্ছি যে,

আমার গবেষণার প্রয়োজনে কিছু প্রতœতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্যে আমি আমার কয়েকজন লোককে নিয়ে মাউন্ট মার্সিতে আসছি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার।'

'ওয়েলকাম। রাখলাম। ওয়াস্সালাম।'

আহমদ মুসা 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলতেই ওপার থেকে লাইনটা কট করে কেটে গেল।

আহমদ মুসা কল অফ করে দিয়ে ওয়াশিংটনে ডায়াল করল ঈগল সান ওয়াকারের কাছে।

ওপার থেকে সান ওয়াকারের কণ্ঠ পেতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'আসসালামু আলাইকুম, সান ওয়াকার। চিনতে পেরেছ?'

ওপার থেকে সান ওয়াকার আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'চিনব না মানে? আপনি......।'

সান ওয়াকারকে কথা সমাপ্ত করতে না দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'থাক, নাম শুনতে চাই না তোমার কাছ থেকে। বল কেমন আছ? মেরি রোজ কেমন আছে?'

'ভাল আমরা আহ.......।' কথা শেষ করতে পারলো না সান ওয়াকার।

আহমদ মুসা আবার তাকে থামিয়ে দিল। বলল, 'থাক বড়দের নাম নিতে নেই। শোন, মাউন্ট মার্সি'র রেডইন্ডিয়ান রিজার্ভে তোমার একটা ফ্রেন্ড ছিল না?'

'ছিল নয়, আছে। সান ইয়াজুনো।' বলল সান ওয়াকার ওপাশ থেকে।

'সে এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'মাউন্ট মার্সিতে। সে মাউন্ট মার্সির রেডইন্ডিয়ান রিজার্ভের ফেডারেল কমিশনারের অফিসে চাকুরি করে। সেখানকার সিভিল এ্যাফেয়ার্স অফিসার সে। কিন্তু ভাইয়া হঠাৎ তাকে মনে পড়ল কেন?' সান ওয়াকারের কণ্ঠ শেষ দিকে গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

'সান ওয়াকার, তুমি কি তোমার বন্ধুর সাথে দেখা করবে?' বলল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে উত্তর এল না সান ওয়াকারের কাছ থেকে। একটু পর ওপ্রান্ত থেকে সে বলে উঠল, 'ব্যাপার কি বলুন তো ভাইয়া। অন্য কেউ এমন কথা বললে রসিকতা মনে করতাম। কিন্তু আপনার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি উচ্চারণের মূল্য আছে। আমার ভয় হচ্ছে বড় কিছু ঘটেছে কিনা!'

'ঘটনা বড় সান ওয়াকার, কিন্তু তোমার উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। তোমাকে আগামী সপ্তাহে সান ইয়াজুনোর ওখানে যেতে হবে। আমিও সে সময় ওখানে থাকব। ভয় করো না সান ইয়াজুনোর সাথে এ ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। তুমি ওখানে যাবে মাত্র। বলবে প্রতœতাত্বিক অনুসন্ধান প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে তুমি ওখানে যাচ্ছ। ওখানে গিয়েই সব তোমাকে বলব।' আহমদ মুসা বলল।

'বুঝেছি ভাইয়া। ঠিক আছে। কবে যাচ্ছি আপনাকে জানাব। মাফ করবেন ভাইয়া, আমি কিন্তু ইচ্ছা করেই আপনার সাথে যোগাযোগ করিনি।' বলল সান ওয়াকার।

'জানি। কিন্তু তুমি কি জান আমার টেলিফোন নাম্বার?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'ঘটনাক্রমে জেনে গেছি ভাইয়া। সেদিন এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম এক আত্মীয়কে বিদায় জানাতে। লাউঞ্জে দেখা হলো সারা জেফারসন আপার সাথে। তিনি ইউরোপ যাচ্ছিলেন। ক'মিনিট কথা হয়েছিল লাউঞ্জে বসে তার সাথে। তিনিই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমরা তাঁর খবর রাখ?' আমি বলেছিলাম, তিনি এসেছেন, কিন্তু ওয়াশিংটনে আসেননি। আমি যোগাযোগের সুযোগ পাইনি।' আমার কথার পর তিনি আমাকে একটা নাম্বার দিয়ে বলেছিলেন, তাঁর সাথে যোগাযোগ রেখ। তার নিজের প্রয়োজন তিনি জানান না, জানতে হয়।' টেলিফোন নাম্বার পেলেও আমি যোগাযোগ করতে সাহস পাইনি ভাইয়া।' বলল সান ওয়াকার।

'সারা তোমাকে নাম্বার দিয়েছে? কিভাবে পেল? যেদিন সকালে সে ইউরোপ গেছে, তার আগের রাতে মাত্র আমি টেলিফোনের নতুন সেট পেয়েছি! এ নাম্বার তো তার জানার কথা নয়। বলত নাম্বারটা?' আহমদ মুসা বলল।

নাম্বারটা নিয়ে দেখল তার টেলিফোনেরই নাম্বার। ভাবল আহমদ মুসা, নাম্বারটা নিশ্চয়ই এফ.বি.আই চীফ জর্জ আব্রাহাম জনসন সারাকে দিয়েছে। বলল আহমদ মুসা সান ওয়াকারকে, 'ঠিক আছে সান ওয়াকার। তাহলে এই কথা থাকল, তুমি যাওয়ার আগে টেলিফোন করছ। আসি। আস্সালামু আলাইকুম।'

আহমদ মুসা কল অফ করে দিয়েই ফিরল ড. হাইম হাইকেলের দিকে। বলল, 'মাফ করবেন স্যার, আর একটা কল করব।'

'আহমদ মুসা তুমি যা করছ, তাতে শত কল করলেও শোনার প্রতি আগ্রহ আমার উত্তরোত্তর বাড়বে। আমি বুঝতে পারছি না এত পরিকল্পনা তুমি কখন করলে? এইমাত্র তো আমার কাছে ঘটনা শুনলে!' ড. হাইম হাইকেল বলল।

'পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়নি। আপনার দেয়া সুনির্দিষ্ট তথ্যগুলোই এ কাজগুলোকে টেনে নিয়ে এসেছে। ধন্যবাদ স্যার।' বলেই আহমদ মুসা তার মোবাইলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

মোবাইলের ডিজিটাল প্যানেলে কয়েকটা অংকে নক করল। সংগে সংগেই ওপার থেকে একটা ভারি কণ্ঠ ভেসে এল, 'বল, জোসেফ জন, নিশ্চয় ড. হ্যামিল্টনের সাথে তোমার কথা হয়ে গেছে?'

'জি জনাব। কথা হয়েছে, কিন্তু ইতি হয়নি।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে না পৌছে তো তুমি আমাকে টেলিফোন করনি!' জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল ওপার থেকে।

'তা ঠিক। কিন্তু আমরা দুজন বসে এখনও কথা বলছি। কথার মাঝখানেই কয়েকটা টেলিফোন করলাম। শেষ টেলিফোনটা আপনাকে করেছি।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ। তুমি দ্রুত আগাচ্ছ। এটাই দরকার। আমার কেমন সহযোগিতা দরকার বল।' এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল।

'কয়েকটা জিজ্ঞাসা।' আহমদ মুসা বলল।

'বল।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘সেফ এয়ার সার্ভিসেস (SAS) কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন। এর সদর দফতর কোথায়? ‘সেফ এয়ার সার্ভিসেস’-লগ রাখার দায়িত্ব কার?’ প্রশ্ন কয়েকটা করে থামল আহমদ মুসা।

ওপার থেকে জর্জ আব্রাহামের উত্তর আসতে কয়েক মুহূর্ত দেরি হলো। একটু সময় পর ওপার থেকে ভেসে এল জর্জ আব্রাহামের কণ্ঠ, ‘আরেকটা প্রশ্ন তোমার বাদ পড়েছে। সেটা হলো, ওল্ড লগগুলো রক্ষার রীতি-বিধান কি? তাই কিনা জোসেফ জন?’

‘ধন্যবাদ জনাব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওয়েলকাম, জোসেফ জন। উত্তরের জন্যে আমাকে ভাবতে হবে। এক ঘণ্টার মধ্যে উত্তরগুলো তোমার হাতে পৌছে যাবে। আর কোন বিষয়?’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘ধন্যবাদ জনাব, আপাতত এ পর্যন্তই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘শোন জোসেফ জন, তুমি তোমার প্রজেক্টের চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছ। তোমাকে প্রয়োজনের অগ্রাধিকার সিলেকশন আগে করতে হবে। তারপর প্রথম কাজ প্রথমে।’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘ধন্যবাদ জনাব। বুঝেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওকে। রাখলাম। বাই।’ ওপার থেকে বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

আহমদ মুসা তার মোবাইলের কল অফ করে দিল এবং ফিরে বসল ড. হাইম হাইকেলের দিকে।

আহমদ মুসা তার দিকে ফিরতেই ড. হাইম হাইকেল বলল, ‘তাহলে আগামী সপ্তাহেই মাউন্ট মার্সিতে যাচ্ছ? যাদের সাথে নিচ্ছ তারা বিশ্বস্ত? প্রফেসর আরাপাহো ও সান ওয়াকার দুজনেরই নাম আমি শুনেছি। তোমার বাছাই ঠিক। রেডইন্ডিয়ানরা সাথে থাকলে ওদের সোসাইটিতে মেশবার সুবিধা পাবে তুমি। ঈশ্বর তোমাকে সফর করুন। তবে ধ্বংস টাওয়ারের ডাষ্ট সংগ্রহের কৌশল তোমার চমৎকার হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে SAS এর লগ পাওয়াটাই তোমার জন্যে কঠিন হবে। তবে ঈশ্বর তোমার প্রতি খুব সদয়। তোমার কয়েকটা

টেলিফোনই প্রমাণ করে ঈশ্বর যেন তোমাকে হাত ধরে সামনে এগিয়ে নিচ্ছে। গড ব্লেস ইউ মাই বয়।’

ড. হাইম হাইকেল থামতেই আহমদ মুসা বলল, ‘অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আমি এখন উঠতে চাই।’

‘অবশ্যই। কিন্তু আরেকটা কথা শোন। তুমি খুবই হুশিয়ার, তবু বলি। যাকে আমরা ‘অপারেশন মেগা ফরচুন গ্রুপ’ (OMF-Group) বলছি, তারা কিন্তু ছড়িয়ে আছে সবখানে। আমাদের পুলিশ, এফ.বি.আই এবং সি.আই.এ’র মধ্যে মনে করা হয় প্রতি দুজনের একজন লোক ওদের। কথাটার মধ্যে খুব অতিরঞ্জন আছে বলে আমি মনে করি না।’

ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। বলল, ‘ব্যাপারটা আমিও জানি স্যার, কিন্তু আপনার দেয়া অংকটা উদ্বেগজনক।’

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। তার মোবাইলটা আবার বেজে উঠল। মোবাইলের স্ক্রীনে চোখ বুলাতেই দেখল জর্জ আব্রাহাম জনসনের নাম্বার। কি ব্যাপার তাঁর টেলিফোন কেন? এক ঘণ্টার মধ্যে উত্তর আমার হাতে পৌছে দিয়ে তারপর টেলিফোন করার কথা। আহমদ মুসা মোবাইল তুলে নিয়ে ‘গুড ইভিনিং স্যার’ বলে সাড়া দিতেই ওপার থেকে জর্জ আব্রাহাম জনসন ‘গুড ইভিনিং’ জানিয়ে বলল, ‘তোমার ঘড়িতে এখন সময় কত?’

‘ঠিক সাড়ে তিনটা।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক আছে তোমার ঘড়ি। শোন, এখন থেকে ঠিক আধা ঘণ্টার মাথায় তুমি গাড়ি নিয়ে ফিলোসফিক্যাল হলের উত্তর পার্শ্বের রোড সাইড কার পার্কিং-এর ১৫০০ নাম্বার পার্কিং ষ্ট্যান্ডে তোমার গাড়ি দাঁড় করাবে এবং গাড়িতেই বসে থাকবে। ঠিক পাঁচ মিনিট পর, একটা লাল গাড়ি এসে তোমার গাড়ির বাম পাশে দাঁড়াবে। গাড়ি দাঁড় করিয়েই গাড়ির ড্রাইভার থেকে বেরিয়ে আসবে এবং তোমাকে ‘হ্যাল্লো মি. জে জে’ বলে সম্বোধন করে ছুটে এসে একান্ত বন্ধুর মত তোমার গাড়িতে উঠবে। তোমাকে প্রায় অদৃশ্য JAJ জলছাপ ওয়ালা নাম ঠিকানাবিহীন একটা সাদা বন্ধ ইনভেলাপ দেবে। তারপর কিছু কথা বলে সে বেরিয়ে যাবে। তুমি চলে আসবে। আর শোন তোমার গাড়ির নাম্বার প্লেট চেঞ্জ

করে ওখানে যাবে। নাম্বার প্লেট তোমার রুমের খাটের নিচে পাবে। ওকে। কথা শেষ। রেখে দিলাম। বাই।'

ওপ্রান্ত থেকে লাইন কেটে দিল আহমদ মুসাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই।

আহমদ মুসা কল অফ করে দিয়ে ড. হাইকেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসি স্যার। আমাকে এখনই একটু বাইরে বেরুতে হবে।'

'উইশ ইউ গুডলাক।' বলল ড. হাইম হাইকেল।

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা বেরিয়ে এল ড. হাইম হাইকেলের কক্ষ থেকে।

আহমদ মুসা ১৫০০ নাম্বার কার পার্কিং ষ্টান্ডে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করছে।

এ রোড সাইড কার পার্কিংটা ফিলোসফিক্যাল হল থেকে পঞ্চাশ গজের মত দূরে হবে। সোজা মাথার সামনে একটা ছোট বাগান। প্রাচীর ঘেরা। প্রাচীরটা ফিলোসফিক্যাল হলকেও বেষ্টন করেছে। বাগানটা হলেরই অংশ বুঝল আহমদ মুসা।

পার্কিং-এর পার্ক ষ্টান্ড আছে ৭টা। সবগুলোই শূন্য। একটি মাত্র গাড়ি দাঁড়িয়ে, সেটা আহমদ মুসার।

ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় একটা লাল গাড়ি এসে পার্ক করল আহমদ মুসার গাড়ির বাম পাশে।

গাড়ির জানালা পথে আহমদ মুসা দেখতে পেল শক্ত ও লম্বা গড়নের এক বুদ্ধিদীপ্ত যুবককে।

গাড়ি দাঁড়াতেই যুবকটি তাকাল আহমদ মুসার গাড়ির দিকে। চোখা-চোখি হয়ে গেল আহমদ মুসার সাথে। যুবকটির চোখে ছিল অনুসন্ধানী দৃষ্টি এবং সেই সাথে প্রথম দৃষ্টিতেই ছিল একটা চমকে ওঠা ভাব। কিন্তু পরক্ষণেই যুবকটির

মুখ উজ্জ্বল হাসিতে ভরে গেল। হাসতে হাসতেই গাড়ি খুলে বেরিয়ে এল। বলে উঠল চিৎকার করে, 'হ্যাল্লো মি. জে জে।'

ছুটে এল যুবকটি আহমদ মুসার গাড়ির দিকে।

গাড়ির কাছে আসতেই আহমদ মুসা গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে তাকে স্বাগত জানাল।

যুবকটি গাড়িতে ঢুকে সিটে বসে দরজা টেনে বন্ধ করে দিল। তারপর কোটের পকেট থেকে একটা ইনভেলাপ বের করে আহমদ মুসার হাতে দিয়ে বলল, 'বোধ হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি। পাওয়ার পর মুহূর্ত নষ্ট না করে ছুটতে হয়েছে।'

ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। কথাগুলোকে অপ্রয়োজনীয় ও কৈফিয়ত ধরনের বলে মনে হলো তার কাছে।

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা ইনভেলাপটিকে উল্টে-পাল্টে দেখল। আবারও ভ্রুকুঞ্চিত হলো তার। ইনভেলাপের কোথাও JAJ -এর জলছাপ নেই।

আহমদ মুসা তাকাল যুবকটির দিকে। বলল, 'ইনভেলাপ বদল হয়েছে। আমার ইনভেলাপ কোথায়?' শান্ত কিন্তু শক্ত কণ্ঠস্বর আহমদ মুসার।

যুবকটি হেসে উঠে আহমদ মুসার কথা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বলল, 'আপনি কি জ্যোতিষী নাকি যে, ইনভেলাপ খোলার আগেই এমন কথা বলছেন। ইনভেলাপ খুলে দেখুন।'

'ইনভেলাপের ভেতরটা পরে দেখব। আগে বলুন ইনভেলাপটা কোথায়?' আগের মতই স্থির কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। ইনভেলাপ তো দিয়েছি। কি আছে দেখুন। তারপর তো বলবেন!' বলল যুবকটি অনেকটা কৈফিয়তের সুরে।

আহমদ মুসা তার দুচোখের সবটুকু দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল যুবকটির মুখের উপর। ভাবনা তার মনে, যুবকটি বারবার ভেতরটা দেখতে বলছে কেন? এ ইনভেলাপ আসল ইনভেলাপ সে দাবী কিন্তু করছে না সে। তার মানে ভেতরটা

ঠিক থাকা সম্পর্কে সে নিশ্চিত। আর এর অর্থ হলো ভেতরটা সে দেখেছে। আর তার দেখার অর্থটা কি?'

কঠোর হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ। বলল যুবকটিকে, 'মেসেজের ফটোকপি যেটা আপনি করেছেন, সেটা দি.........।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারলো না। যুবকের ডান হাতটা যেটা ওপাশে ছিল, ছুটে এল রিভলবার নিয়ে। আহমদ মুসার মাথা লক্ষ্যে তাক করল সে রিভলবার। বলল, 'যা আমি কল্পনা করেছিলাম, তার চেয়েও তুমি চালাক। কিন্তু বেশি চালাকের......।

যুবকটিও কথা শেষ করতে পারলো না। আহমদ মুসার বাম হাত চোখের পলকে উঠে এসে যুবকটির রিভলবার ধরা হাতের কব্জী ধরে উপর দিকে পুশ করল, অন্যদিকে আহমদ মুসার মাথা তীরের মত নেমে গিয়ে আঘাত করেছে যুবকটিকে।

আকস্মিক আঘাতে যুবকটি ছিটকে গিয়ে গাড়ির দরজার সাথে ধাক্কা খেল। অন্যদিকে তার রিভলবার ধরা হাতকে উপর দিকে পুশ করার সময়ই যুবকটি গুলী করল। গুলীটা গিয়ে আঘাত করল গাড়ির ছাদকে।

যুবকটি সিট ও দরজার মাঝখানে কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল। তাকে শামলাতে গিয়ে আহমদ মুসার ডান হাত ওদিকে এনগেজ হয়ে পড়েছিল। আর বাম হাত যুবকটির রিভলবার ধরা ডান হাতের সাথে লড়াই করছিল। যুবকটি তার ডান হাতকে আহমদ মুসার দিকে এনে তাকে রিভলবারের টার্গেটে আনবার চেষ্টা করছিল। দুহাতের লড়াই-এ সুবিধা পাচ্ছিল যুবকটিই বেশি। কারণ আহমদ মুসার শক্তি ও মনোযোগের বিরাট অংশ ব্যয় হচ্ছিল যুবকটিকে চেপে রাখতে গিয়ে। অন্যদিকে কোনঠাসা অবস্থা থেকে মুক্তির চেষ্টা না করে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল আহমদ মুসাকে কোনোভাবে গুলীর আওতায় আনার জন্যে।

এক সময় আহমদ মুসা যুবকটিকে ডান হাতে চেপে রেখে নিজের দেহটাকে আলগা করে নিল। তারপর চোখের পলকে ডান হাতটা তুলে নিয়ে দুহাত দিয়ে যুবকের রিভলবার ধরা ডান হাত চেপে ধরে জোরে ঠেলে দিল যুবকের দিকেই। রিভলবারের নলও ঘুরে গেল যুবকের দিকেই। যুবকটি তার

হাতের চাপ বাড়িয়ে দিল হাত ঘুরিয়ে নেবার জন্যে। এটা করতে গিয়ে রিভলবারের ট্রিগারের উপর তার তর্জনি আকস্মিকভাবে চেপে বসল ট্রিগারের উপর। সংগে সংগে একটা গুলী বেরিয়ে তার বুককে এফাড়-ওফোড় করে দিল।

আহমদ মুসা চারদিকে চেয়ে দেখল আশেপাশে কেউ নেই।

আহমদ মুসা যুবকটির রিভলবার ধরা হাত বাম হাত দিয়ে ধরে রেখে ডান হাত দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ফেলল। ওদিকে যুবকটির গাড়ির দরজা খোলাই ছিল।

আহমদ মুসা দ্রুত যুবকটিকে গাড়িতে নিয়ে যুবকটির পকেটগুলো সার্চ করল। তার কোটের ভেতরের পকেটেই পেয়ে গেল চার ভাজ করা একটা বড় কাগজের শিট। একটু খুলেই বুঝল জর্জ আব্রাহাম জনসনের পাঠানো মেসেজের একটা কপি। কাগজটি পকেটে পুরল আহমদ মুসা। মানিব্যাগ ছাড়া কোন পকেটেই আর কোন কাগজ ছিল না।

আহমদ মুসা যুবকটির গাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল। যুবকটির ডান হাতের কাছেই পড়ে থাকল তার রিভলবার। তদন্তকারীরা দেখবে রিভলবারটির একটা গুলী যুবকের বুকে এবং দেখবে রিভলবারের বাঁটে যুবকেরই হাতের ছাপ।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে আহমদ মুসা ফিরে এল তার গাড়িতে। যুবকের দেয়া ইনভেলাপ পড়েছিল গাড়ির সিটে। দ্রুত ইনভেলাপটি খুলে ভেতর থেকে কাগজ বের করল। খুলল। দেখল, যুবকের কাছ থেকে যে মেসেজটি পেয়েছে তারই মূল কপি এটা।

আহমদ মুসা ইনভেলাপসহ মেসেজের দুটো শিট পকেটে পুরল। দুহাত থেকে গ্লাভস খুলে পাশের সিটে রেখে গাড়ি ষ্টার্ট দিল। আর একবার চারদিকে চেয়ে দেখল রোড-সাইড বা এ পার্কে আর কোন গাড়ি নেই, মানুষও নেই।

আহমদ মুসার গাড়ি উল্টো পথে যাওয়া শুরু করল। ঘোরা পথ দিয়ে সে জেফারসন হাউজে ফিরে আসবে। চলছে গাড়ি।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল ড. হাইম হাইকেলের কথা। আসার সময় তিনি বলেছিলেন সি.আই.এ, পুলিশ ও এফ.বি.আই-এর প্রতি দুজনের একজন

‘অপারেশন মেগা ফরচুন গ্রুপ’ মানে ইহুদী লবির সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা সহানুভুতিশীল। কিন্তু তাই বলে এফ.বি.আই- প্রধানের বিশেষ গ্রুপের মধ্যেও ওরা ঢুকে পড়েছে! আহমদ মুসার ধারণা এফ.বি.আই-এর যে মেয়েটি সেদিন তাদেরকে এয়ারপোর্ট থেকে জেফারসন হাউজে রেখে গিয়েছিল, সে মেয়েটির মত এ যুবকটিও এফ.বি.আই-এর বিশেষ কেন্দ্রীয় গ্রুপের সাথে সংশ্লিষ্ট।

আহমদ মুসা জেফারসন হাউজে ফিরে নিজ ঘরে এসে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে ভাবল, দুর্ঘটনার কথা এফ.বি.আই. প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসনকে জানাতে হবে। তাঁর কিছু করণীয় থাকতেও পারে। কিন্তু তার আগে তাঁর পাঠানো মেসেজটা দেখা দরকার।

আহমদ মুসা মোবাইলটি বিছানায় বালিশের পাশে রেখে মেসেজ শিট নিয়ে শুয়ে পড়ল।

শুয়ে পড়ে আহমদ মুসা মেসেজ শিটটি চোখের সামনে তুলে ধরল। পড়া শুরু করল সে ঃ

‘বিশ বছরের পুরানো মিলিটারী ডকুমেন্টগুলোকে আনক্লাসিফায়েড করে ন্যাশনাল আরকাইভস ও মিলিটারী আরকাইভসে পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টটি ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্ট ছিল না। তাই আন-ক্লাসিফায়েডও হয়নি এবং সে কারণে ন্যাশনাল আরকাইভস-এ রাখার উপযুক্তও বিবেচনা করা হয়নি। অপ্রয়োজনীয় ও সময়োত্তীর্ণ বিধায় বিভাগ থেকেই একে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। শুধু একটা কপি সংরক্ষণ করা হয় ‘মিউজিয়াম অব মিলিটারী হিষ্ট্রি’-এর মহাফেজখানায়। কিন্তু সেখানকার রেকর্ডে একে ‘মিষ্ট্রিয়াস মিসিং লিষ্টে’ রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে কোন তদন্ত না হওয়ায় ডকুমেন্টটার ব্যাপারে আর কিছুই বলা যাচ্ছে না।’

মেসেজ পড়ে হতাশ হলো আহমদ মুসা। আরও দুঃখ হলো এই কারণে যে, অকাজের এ বিষয়টা নিয়ে একজন লোকের জীবনও গেল।

এ সম্পর্কিত সাত-পাঁচ অনেক চিন্তা এসে চেপে ধরল আহমদ মুসাকে। গ্লোব হকের লগ ও অর্ডার শিট উদ্ধার না হলে প্রমাণ করা যাবে না গ্লোব হকের রিমোট কনট্রোল সেদিন দুটি সিভিল এয়ার লাইন্সের প্লেনকে টুইনটাওয়ারে টেনে

এনেছিল। কিন্তু গ্লোব হকের ঐ লগ ক্লাসিফায়েড হলো না কেন? কেউ এর সাথে কোন গোপন, কৌশলগত বা অস্বাভাবিক কোন কিছু জড়িত দেখেনি বলেই বোধ হয়। রুটিন কোন কিছু তো ক্লাসিফায়েড হয় না। ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের ঐ মিশনকেও রুটিন বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে! শীর্ষ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সবাই কি তাহলে ঘটনার সাথে জড়িত ছিল!

পাশ ফিরল আহমদ মুসা। আবার মনোযোগ দিল মেসেজটির দিকে। আবার পড়ল আহমদ মুসা হতাশা পীড়িত মন নিয়ে।

এবার হঠাৎ মেসেজের শেষ লাইনে চোখ আটকে গেল আহমদ মুসার। একটা জিনিসের হারিয়ে যাওয়াকে 'মিষ্ট্রিয়াস মিসিং লিষ্টে' আনা হলো, কিন্তু সে ব্যাপারে তদন্ত হলো না কেন? তদন্তের উপযুক্ত না হলে কোন বিষয়কে মিষ্ট্রিয়াস মিসিং লিষ্ট-এ আনা হবে কেন? আনা হলে রহস্য উদ্ধারের জন্যে তদন্ত হবে না কেন? বিষয়টাকে কি চাপা দেয়া হয়েছে? কেন চাপা দেয়া হলো? কোন চাপের কারণে কি? কে চাপ দিল? এ সব প্রশ্নের জবাব পেলে মিসিং ডকুমেন্টেরও খোঁজ পাওয়া যাবে নিশ্চয়। হতাশার মধ্যে একটা আশার আলো জ্বলে উঠল আহমদ মুসার সামনে। এই আলোর উৎস মিলিটারী হিষ্ট্রির মিউজিয়ামে তাকে যেতে হবে, ভাবল আহমদ মুসা।

আবার পাশ ফিরল আহমদ মুসা। হাতের কাছে পড়ল মোবাইলটা। মোবাইলটা হাতে তুলে নিল আহমদ মুসা।

হাতের চার আঙুলের উপর মোবাইলটা রেখে বৃদ্ধাঙ্গুলি কয়েকটা ডিজিটাল নাম্বারে চাপ দিল। মোবাইলের স্ক্রীনে ভেসে উঠল এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসনের নাম্বার।

সংযোগ হয়ে গেল।

ওপার থেকে জর্জ আব্রাহাম জনসনের কণ্ঠ শুনতে পাওয়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসা বলল, 'আমি জোসেফ জন বলছি স্যার। গুড ইভিনিং।'

'ইভিনিংটা গুড রাখলে কোথায়?' বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন হাল্কা কণ্ঠে।

'সব শুনেছেন জনাব?'

‘ঘটনার রেজাল্ট শুনলাম। ঘটনা তো তুমি বলবে। আমি নিশ্চিত যে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। কি করেছিল সে?’

‘ইনভেলাপ পাল্টেছিল।’

‘ইনভেলাপ পাল্টেছিল? তার মানে ভেতরের মেসেজ পাল্টেছিল, অথবা কপি নিয়েছিল?’

‘কপি নিয়েছিল।’

‘ইনভেলাপ পাল্টানো বুঝলে কি করে?’

‘প্রথমেই আমি ইনভেলাপটা চেক করি। তাতে যে গোপন JAJ জলছাপ থাকার কথা তা পাইনি। তখনই বিষয়টা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে সে ডাবল এজেন্ট। সে ইনভেলাপ খুলে মেসেজ পাল্টেছে, অথবা কপি নিয়েছে। আমি যখন তার কাছে আসল ইনভেলাপ চাইলাম এবং অবশেষে চিঠির ফটোকপি তার কাছে চাইতে গেলাম, তখন সে রিভলবার বের করে।’

‘তারপর সে সম্ভবত নিজের রিভলবারে নিজের গুলীতেই প্রাণ হারায়।’ বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

‘জনাব রিভলবারেও তারই ফিংগার প্রিন্ট পাওয়া যাবে। তবে আমি তার এ পরিনতি চাইনি। আমি চেয়েছিলাম তাকে আটক করে মেসেজের কপি নিয়ে নিতে।’ আহমদ মুসা বলল। কণ্ঠ তার ভারী হয়ে উঠেছিল।

‘দুঃখ করো না জোসেফ জন। বিশ্বাসঘাতকের এই পরিণতিই কাম্য। তোমার জন্যে না হলেও আমার জন্যে এটা অপরিহার্যভাবে কাম্য ছিল। তোমাকে ধন্যবাদ জন। এখন বল, কি করবে তুমি? ‘লগ’ তো পাচ্ছ না।’

‘আমি হতাশ নই। আশার আলো দেখতে পাচ্ছি আমি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিভাবে, কোথায় তুমি আশার আলো দেখতে পাচ্ছ?’ জিজ্ঞাসা জর্জ আব্রাহাম জনসনের।

‘আপনার মেসেজের শেষ বাক্যে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সংগে সংগে ওপার থেকে জবাব এল না জর্জ আব্রাহাম জনসনের। একটু পর বলল, ‘বুঝেছি, তুমিই তদন্তে নামতে চাও। সত্যি আহমদ মুসা তুমি

অনন্য। স্রষ্টা সব নেয়ামত তোমার উপর ঢেলে দিয়েছেন। আমি নিজেও কিন্তু এ পথটার কথা ভাবিনি।'

কথা শেষ করে একটু থেমেই আবার বলল, 'ঠিক আছে, এখন এ পর্যন্তই। আমার কিছু করার থাকলে তা জানাতে দেরি করবে না। ধন্যবাদ। বাই।'

'অবশ্যই জনাব। বাই।' আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই ওপার থেকে লাইন কেটে গেল।

আহমদ মুসাও কল অফ করে মোবাইল রেখে দিয়ে আবার একটা পাশ ফিরল। কিন্তু চোখ বন্ধ করতে পারলো না। হাতঘড়ির এ্যালার্ম বেজে উঠল।

আসরের নামাজের এলার্ম। উঠে বসল আহমদ মুসা।

৪

মাউন্ট মার্সি রেডইন্ডিয়ান রিজার্ভ-এর ফেডারেল কমিশনার ওয়ারেন ওয়েলেসলি মনোযোগ দিয়ে শুনছিল কাহোকিয়ার ইনষ্টিটিউট অব আমেরিকান রেডইন্ডিয়ান ষ্টাডিজ-এর প্রধান আরাপাহোর কথা।

প্রফেসর আরাপাহোর পাশে বসে আছে জোসেফ জন ওরফে আহমদ মুসা। তার পরিচয় সে প্রফেসর আরাপাহোর একজন সহকারী রেডইন্ডিয়ান বিশেষজ্ঞ।

আর কমিশনার ওয়ারেন ওয়েলসলির আমন্ত্রণে উপস্থিত আছেন ঈগল সান ওয়াকার। কমিশনার অফিসের সিভিল অফিসার সান ইয়াজুনো'র বন্ধু সে। তার মাধ্যমেই সান ওয়াকারের সাথে কমিশনারের পরিচয়। কমিশনার দেশবরেণ্য প্রতিভা সান ওয়াকারের প্রতি দুদিনেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। রেডইন্ডিয়ান বিষয়ক আলোচনা বলেই কমিশনার সান ওয়াকারকেও ডেকেছে। অফিসের আরও দুজন বৈঠকে হাজির। তাদের একজন ফেডারেল কমিশনার অফিসের প্রধান প্রশাসনিক অফিসার টমাস ওয়াল্টন এবং সিভিল এ্যাফেয়ার্স অফিসার সান ইয়াজুনো।

আলোচনা বসেছে ফেডারেল কমিশনারের অফিসে।

কথা শেষ করে থামল প্রফেসর আরাপাহো।

প্রফেসর আরাপাহো থামতেই কমিশনার ওয়ারেন ওয়েলসলি বলে উঠল, 'আমাদের সম্মানিত অতিথি প্রফেসর আরাপাহোর কাছে এ বিষয়ে আমি আগেই শুনেছি। এখন আরও বিস্তারিত উনি বললেন। আমি এ ব্যাপারে প্রথমে মি. টমাস ওয়ালটনের বক্তব্য শুনতে চাই।'

'ধন্যবাদ স্যার', বলতে শুরু করল টমাস ওয়ালটন, 'বিষয়টির সাথে আমাদের অফিসের তেমন কোন যোগসূত্র দেখছি না। আমাদের একটা ইনফরমেশন দেয়াই যথেষ্ট মনে করি। এ বিষয়টির সাথে কিছুটা যোগ আছে

অপরাধ-আইনের। স্যার তো বললেনই থানার আপত্তি নেই। তবে কবর খননের সময় তারা হাজির থাকতে চায়। প্রফেসর স্যারও এটাই চান। এই অবস্থায় আমরা কোন সমস্যা দেখি না। থানার মত ঘটনার সময় আমরাও হাজির থাকতে চাই, এটুকু দাবি বোধ হয় আমরা করতে পারি।'

টমাস ওয়ালটন থামতেই কমিশনার ওয়ারেন ওয়েলসলি বলল, 'ধন্যবাদ মি. ওয়ালটন। এবার সান ইয়াজুনো তোমার মত বল।'

'স্যার আমি মি. ওয়ালটনের সাথে একমত। শুধু একটা কথাই যোগ করব। এ বিষয়ে এখানকার রেডইন্ডিয়ান কমিউনিটি কর্তৃপক্ষের অনুমতি দরকার। আমি প্রফেসর স্যারের কাছে শুনেছি তিনি এ বিষয়ে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেছেন। তারা এতে আপত্তি করেননি। আজ কমিউনিটি নেতারা আনুষ্ঠানিকভাবে বসছেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবেই তারা এর অনুমতি দেবেন। আমি মনে করি প্রফেসর স্যারকে যতটা পারা যায় আমাদের সহযোগিতা করা দরকার।' বলল সান ইয়াজুনো।

কমিশনার তাকালো সান ওয়াকারের দিকে। বলল, 'তুমি এখানে অতিথি হলেও তোমার এ ব্যাপারে মতামত আমাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে। কিছু তুমি বল।'

'প্রফেসর স্যার যে কাজ নিয়ে এসেছেন, সেটা আমাদের সকলের কাজ। আমি মনে করি, সকল প্রশ্ন, সকল জিজ্ঞাসা, সকল সন্দেহ, ইত্যাদির তাৎক্ষণিক সমাধান হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এতে সমাজ, দেশ সুস্থ থাকবে।' সান ওয়াকার বলল।

সান ওয়াকার থামলে কমিশনার ওয়ারেন ওয়েলেসলি বলল প্রফেসর আরাপাহোকে লক্ষ্য করে, 'হয়ে গেল মি. প্রফেসর। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি যা ভাবছিলাম, সকলের কাছ থেকে সেটাই শুনলাম। তাহলে আপনি কমিউনিটি নেতাদের সাথে আলোচনা করে কাজ শুরু করে দিন। কবে শুরু করছেন, আমাদের দয়া করে জানাবেন। আমরাও থাকব সাথে।'

‘ধন্যবাদ। খুব খুশি হলাম সহযোগিতার জন্যে। থানাও সাথে থাকবে। তাদের কাছ থেকে তারিখ কনফার্ম করে আপনাদের জানাব।’ প্রফেসর আরাপাহো বলল।

‘আরও কিছু কথা হলো। তারপর বিদায় নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল প্রফেসর আরাপাহো এবং আহমদ মুসা।

আহমদ মুসারা গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে এ সময় সান ওয়াকারও ছুটে এসে তাদের সাথে যোগ দিল। বলল, ‘কমিউনিটি নেতাদের বৈঠকে চলুন আমিও যাব।’

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ওদের মিটিং বেশ আগে শুরু হয়ে যাবার কথা। এখানে আমাদের একটু বেশি সময় লাগল।’

‘মিটিং শুরু হতেই বেশ দেরি হয়েছে। থাক, শেষটা ভালই হয়েছে। চিন্তা নেই, কমিউনিটি নেতাদের মিটিং-এ আমাদের কোন ভূমিকা নেই। আমাদের কথা সবাইকে বলেছি। সবাই জানে। সবাই সানন্দে সহযোগিতা করতেও রাজি হয়েছে। অতএব কোন সমস্যা হবার কথা নয়। গড ব্লেস আস।’

কথা শেষ করেই বলল, ‘আর দেরি নয়, চল। মিটিং-এর শেষটা আমরা ধরতে চাই।’ বলে গাড়িতে উঠল প্রফেসর আরাপাহো।

আহমদ মুসা ও সান ওয়াকারও গাড়িতে উঠল। আহমদ মুসা বসেছে ড্রাইভিং সিটে। গাড়ি চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসারা যখন মিটিং-এ উপস্থিত হলো,তখন মিটিং শেষ পর্যায়।

মিটিং বসেছে মাউন্ট মার্সি রেডইন্ডিয়ান কমিউনিটির প্রধান সিনর সোপাহারোর বিশাল দরবার খানায়। দরবার খানার বিশাল হলের চারদিক জুড়ে সোফা ষ্টাইলের ঐতিহ্যবাহী গদি বসানো। কমিউনিটির বিভিন্ন অংশের সরদাররা বসেছেন সুদৃশ্য গদিগুলোতে। ঘরের মাঝ বরাবর দেয়াল ঘেঁষে স্থাপিত সিংহাসনাকৃতির বিশাল গদিতে বসেছে সিনর সোপাহারো। তার দুপাশে কয়েকটা গদি খালি।

আহমদ মুসারা দরবার হলে প্রবেশ করতেই মাউন্ট মার্সি’র রেডইন্ডিয়ান প্রধান সিনর সোপারাহো আনন্দ উচ্ছাসের সাথে বলল, ‘সম্মানিত

প্রফেসর আসুন। আপনাদের সবাইকে এ দরবারে স্বাগত। আপনাদেরই এখন আশা করছিলাম। ঠিক সময়েই এসেছেন।

‘ধন্যবাদ সরদার।’ বলে প্রফেসর আরাপাহো দুহাত তুলে কমিউনিটির সব নেতাদের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘সকলকে গুড ইভিনিং।’

তারপর প্রফেসর আরাপাহো আহমদ মুসা ও সান ওয়াকারকে নিয়ে এগুলো সিনর সোপাহারোর দিকে।

সিনর সোপাহারো উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাল প্রফেসর আরাপাহোকে এবং নিজের ডান পাশের আসনটার দিকে ইংগিত করে প্রফেসর আরাপাহোকে বসতে বলল। বাম পাশের দুআসনে বসাল আহমদ মুসা ও সান ওয়াকারকে।

তারপর নিজে তার আসনে ফিরে গিয়ে সিনর সোপাহারো প্রফেসর আরাপাহোকে লক্ষ্য করে বলল, ‘প্রফেসর স্যার, আপনার বিষয় নিয়ে আমি আমার সরদারদের সাথে আলোচনা করেছি। তারা সকলেই আপনার চিন্তার সাথে একমত। কিন্তু তারা কতগুলো কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, যার জবাব আপনার কাছে আছে।’

‘ওয়েলকাম সরদার। আমি তাঁদের কৌতুহল মিটানোর সুযোগ পেলে খুবই খুশি হবো।’ বলল প্রফেসর আরাপাহো।

‘প্রফেসর স্যার, অনেকের কৌতুহল, এখানে গণকবর থাকার কথা কেউ জানে না, এমনকি শোনেওনি কেউ, এ বিষয়টা অবহিত হলেন কিভাবে?’ বলল সিনর সুপাহারো।

‘ধন্যবাদ সরদার সিনর সুপাহারো। রেডইন্ডিয়ানদের বিষয়ে, রেডইন্ডিয়ানদের এলাকা বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য, ইনফরমেশন ইত্যাদি বরাবরই বিভিন্নভাবে আমাদের ইনষ্টিটিউটে আসে। কেউ চিঠিপত্রের মাধ্যমে জানান। কেউ রেকডকৃত অডিও ভিডিও ক্যাসেট পাঠান। পত্র-পত্রিকা ম্যাগাজিনও অনেকে পাঠান। মাউন্ট মার্সির গণকবরের সংবাদ এইভাবে কয়েকটি সূত্র থেকে আমার কাছে আসে। তারা জানান, রেডইন্ডিয়ানদের স্বার্থেই এর অনুসন্ধান প্রয়োজন। আমি এ বিষয়টার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেইনি। কিন্তু একটা সূত্র যখন আমাকে স্থান

নির্দিষ্ট করে বলল, তখন আমি বিষয়টাকে সিরিয়াসলি গ্রহণ করেছি এবং আপনাদের কাছে এসেছি।' বলল প্রফেসর আরাপাহো।

প্রফেসর আরাপাহো থামতেই এক পাশ থেকে সরদারদের একজন বলে উঠল, 'স্যার তাদের স্বার্থ কি? তারা কেন চায় এটা খনন হোক?'

প্রফেসর আরাপাহো মিষ্টি হাসল। বলল, 'পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যারা নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে বা নিজের স্বার্থ কোরবানী দিয়েও সত্য সন্ধানে, রহস্য সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। এখানে আমি মনে করি সত্য সন্ধানটাই মূখ্য।'

'স্যার এটা করতে গিয়ে আমরা কোন সমস্যার জড়িয়ে পড়ব না তো?' অন্য প্রান্ত থেকে আরেকজন সরদারের জিজ্ঞাসা।

'বিষয়টা অতীতের সাথে সম্পর্কিত। বর্তমানের সাথে নয়। এই ইন্ডিয়ান রিজার্ভের কেউ-ই যেহেতু এ বিষয়টা সম্পর্কে কিছুই জানে না, তাই এখানকার কেউ এর সাথে সম্পর্কিত হবার প্রশ্নই ওঠে না।'

'স্যার, খনন করে গণকবর যদি পাওয়া যায়, তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ আপনার কি হবে?' আরেকজন সরদারের জিজ্ঞাসা।

'সত্যটা জানতে চাই। গণকবরে ওরা কারা? রেডইন্ডিয়ান কিনা? কত দিন আগে ওদের এই পরিণতি ঘটে? এ বিষয়গুলো যদি জানা যায়, তাহলে আমাদের ইতিহাসের এক অংশ হবে এটা।' বলল প্রফেসর আরাপাহো।

প্রফেসর আরাপাহো থামল। কোন দিক দিয়ে কোন প্রশ্ন আর এল না। মুখ খুলল এবার সিনর সুপাহারো। বলল, 'ধন্যবাদ প্রফেসর স্যার। আমি মনে করি সবাই আশ্বস্ত হয়েছে। আমার একটা পরামর্শ, আপনার এ উদ্যোগের সাথে আমরা তো আছিই, পুলিশ এবং ফেডারেল কমিশনার অফিসকে জড়িত করা দরকার।'

'জি সরদার। ওদের সাথে কথা বলেছি। ওরা থাকবেন আমাদের সাথে।' বলল প্রফেসর আরাপাহো।

'তাহলে আর কোন কথা নয়। আমাদের পূর্ণ সম্মতি আছে। আপনি অগ্রসর হোন।' সিনর সুপাহারা বলল হাসি ভরা মুখে।

প্রফেসর আরাপাহো উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘ধন্যবাদ সরদার, ধন্যবাদ সকলকে।’

আরও দুচারটি কথার পর কফি পান পর্ব শেষে মিটিং-এর সমাপ্তি ঘোষণা হলো।

আহমদ মুসারা ফিরে এল সিনর সুপাহারোর অতিথি হিসেবে রয়েছে মাউন্ট মার্সিতে আসার পর থেকেই। আহমদ মুসারা এখানকার ট্যুরিষ্ট রেষ্ট হাউজে উঠেছিল। কিন্তু মাউন্ট মার্সি’র রেডইন্ডিয়ান কম্যুনিটির প্রধান তাদেরকে রেষ্ট হাউজে থাকতে দেয়নি। বলতে গেলে জোর করেই নিয়ে এসেছে তার আলিশান মেহমান খানায়।

আহমদ মুসা তার কক্ষে এসে ধপ করে বসে পড়ল, গাটা এলিয়ে দিল সোফায়। মনটা তার খুব হাল্কা লাগছে আজ। কয়েকদিন বেশ টেনশনে কেটেছে। প্রথম দিকে কমিউনিটি সরদাররা এ ব্যাপারটা বুঝতেই চায়নি। তাছাড়া এখানকার পুলিশও ব্যাপারটাকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। ফেডারেল কমিশনারের অফিসও এর সাথেজড়িত হতে দ্বিধা করেছে। প্রফেসর আরাপাহোর ইমেজ ও অব্যাহত চেষ্টা এবং পেছনে থেকে সান ওয়াকারের বন্ধু সান ইয়াজুনোর চেষ্টা গোটা বিষয়কে অবশেষে সহজ করে দিয়েছে। পুলিশ আগেই রাজি হয়েছিল। ফেডারেল কমিশনারের অফিস ও কমিউনিটি সরদারদের গুরুত্বপূর্ণ সম্মতিও আজ পাওয়া গেল। এখন যে কোন মুহূর্তে কাজ শুরু করা যায়।

এসব ভাবনায় আহমদ মুসা যখন ডুবে আছে, তখন প্রফেসর আরাপাহো এবং সান ওয়াকার প্রবেশ করল আহমদ মুসার ঘরে।

ওদের দেখে আহমদ মুসা সোজা হয়ে বসল।

সান ওয়াকার গিয়ে আহমদ মুসার পাশে বসল। আর প্রফেসর আরাপাহো আহমদ মুসার মুখোমুখি সোফায় বসতে বসতে বলল, ‘জোসেফ জন ওরফে...... থাক নাম ধরব না। এখন বল, তোমার পরিকল্পনা কি? যে কোন সময়ে কাজ শুরু করতে পার। আমার প্রতœতাত্বিক খননকারী গ্রুপও আজ বিকেলের মধ্যে পৌছে যাবে।’

‘অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। আপনি একটা অসাধ্য সাধনের মত কাজ করেছেন। আমি.........’ আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারলো না।

আহমদ মুসাকে বাধা দিয়ে প্রফেসর আরাপাহো বলল, ‘দেখ সাগর যদি নদীর গভীরতা নিয়ে প্রশংসা করে, সেটা খুবই লজ্জার। আমি তোমার প্রশংসা শুনতে আসিনি। আমি জানতে এসেছি তোমার পরিকল্পনা।’

স্যার আমি এখন টেলিফোন করব আমাদের ‘ক্রিশ্চিয়ান কার্টার’ ওরফে ‘বুবি’কে (বুমেদীন বিল্লাহকে)। আজই তাকে আসতে বলব। সে এলেই খনন কাজ শুরু করা যাবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তার জন্যে অপেক্ষা কেন?’ জিজ্ঞাসা প্রফেসর আরাপাহোর।

‘সে মূলত ফ্রান্সের লা’মন্ডে পত্রিকার সাংবাদিক। তাছাড়া সে ফ্রি ওয়ার্ল্ড (FWTV) এবং ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সি (WNA)-এর আন্ডার গ্রাউন্ড রিপোর্টার। বিশ্বব্যাপি উপযুক্ত প্রচার এখন হবে আমাদের প্রধান অবলম্বন। এক্ষেত্রে সেই হবে আমাদের এখন প্রধান অস্ত্র।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বুঝেছি জোসেফ জন। মিডিয়া যুদ্ধের মাধ্যমেই জয় নিশ্চিত করতে চাও। গড ব্লেস আস অল।’ বলল প্রফেসর আরাপাহো।

‘ধন্যবাদ স্যার।’ বলেই আহমদ মুসা মোবাইলটা হাতে তুলে নিল। মোবাইলের ডিজিটাল নাম্বারে নক করতে করতে প্রফেসর আরাপাহোকে লক্ষ্য করে বলল, ‘মাফ করুন স্যার, টেলিফোনটা সেরে নিই।’

কথা শেষ করতেই টেলিফোনের ও প্রান্ত থেকে ড. হাইকেলের কণ্ঠ শোনা গেল।

‘গুড ইভিনিং ড. হ্যামিল্টন। আপনি কেমন আছেন? ওখানে কি মি. কার্টার ওরফে ‘বুবি’ আছে?’ এ প্রান্ত থেকে বলল আহমদ মুসা।

‘ওয়েলকাম। গুড ইভিনিং। হ্যাঁ বুবি আছেন। ইউরোপ থেকে যার আসার কথা তিনিও আছেন। কেমন আছ তুমি? ওদিকের খবর কি?’ ড. হাইম হাইকেল বলল।

'এ দিকের খবর খুবই ভাল। ব্যবস্থা সব সম্পূর্ণ। দুএকদিনের মধ্যেই কাজ শুরু করব। 'বুবি'কে পরে কিন্তু তার আগে ইউরোপ থেকে আসা মেহমানকে দিন।' আহমদ মুসা বলল।

'ওকে। গড ব্লেস আস অল।' ওপার থেকে বলল ড. হাইম হাইকেল।

পরক্ষণেই টেলিফোনের ওপ্রান্ত থেকে কামাল সুলাইমানের কণ্ঠ শুনতে পেল আহমদ মুসা। বলল, 'কাসু কেমন আছ? ওদিকে কতদূর এগুলে?'

'সুখবর তিন ক্ষেত্রেই। যেমন আপনি চেয়েছিলেন সেভাবে তিন প্রতিষ্ঠান থেকে ছয় প্যাকেট ম্যাটেরিয়াল যোগাড় করা হয়েছে। প্রত্যেক প্যাকেটেই প্রত্যয়নমূলক সিল সিগনেচার রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে, আমি হোটেল ছেড়ে দিয়েছি।' বলল কামাল সুলাইমান।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। সমস্যা বলতে কামাল সুলাইমান কি বলতে চেয়েছে বুঝেছে আহমদ মুসা। বলল, 'ভাল করেছ। পরবর্তী কাজগুলো?'

'যেদিন পেয়েছিলাম নমুনা, আপনার নির্দেশ অনুযায়ী সেদিনই একটি করে প্যাকেটের ম্যাটেরিয়াল দিয়েছিলাম সেই নির্দিষ্ট তিনটি প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু রেজাল্ট নিতে যাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা হন্যে হয়ে উঠেছে। পাহারা বসিয়েছে সবখানে।' বলল কামাল সুলাইমান। বিষণœ কণ্ঠ তার।

'ঠিক আছে। ধীরে চল। আজই 'বুবি'কে এখানে পাঠিয়ে দাও। তাকে এখানে দরকার। শোনাও যাবে তার কাছ থেকে সব।' বলল আহমদ মুসা গম্ভীর কণ্ঠে।

'ঠিক আছে। 'বুবি'র সাথে কথা বলবেন?'

'আর প্রয়োজন নেই। তুমি তাকে বলে দাও। আজই যেন সে আসে।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক আছে। পাঠাচ্ছি ওকে। আর কোন নির্দেশ?' জিজ্ঞাসা কামাল সুলাইমানের।

'সাবধানে যতটুকু এগুনো যায় এগোও আর খোঁজ নাও। পারলে ডেলিভারি নাও। সম্ভব না হলে সাধ্যমত খোঁজ খবর রাখ। মনে রেখ দুনিয়াতে

একমাত্র শিশাই নিশ্চিদ্র। আর সবকিছুর মধ্যে ছিদ্র আছে, ফাঁক আছে। এই ফাঁকের সন্ধান কর।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ। আপনার নির্দেশ বুঝেছি।' বলল ওপার থেকে কামাল সুলাইমান।

'ধন্যবাদ, কাসু। আজকের মত এখানেই শেষ। গড ইজ উইথ আস। বাই।' বলল আহমদ মুসা।

'বাই।' কামাল সুলাইমান বলল।

আহমদ মুসা কল অফ করে দিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিল। কিছু বলার জন্যে আহমদ মুসা মুখ খুলেছিল। কিন্তু তার আগেই প্রফেসর আরাপাহো বলে উঠল, 'কি ব্যাপার আহমদ মুসা, কোন খারাপ খবর?'

'ভালোমন্দে মেশানো স্যার।'

'কেমন?'

'থ্যাংকস, কামাল সুলাইমান নিউইয়র্কের তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ডাষ্ট যোগাড় করেছে। কামাল সুলাইমানের সাথে খোলামেলা কথা বলা গেল না। কিন্তু যতটুকু কথা হলো, তাতে বুঝলাম এই ডাষ্ট সংগ্রহ করার বিষয়টা 'ওপারেশন মেগা ফরচুন' গ্রুপ (ও.এম.এফ গ্রুপ) জেনে ফেলেছে এবং তারা কামাল সুলাইমানের হোটেলের ঠিকানাও পেয়ে যায়। কামাল সুলাইমানও এটা আঁচ করতে পারে। সে হোটেল ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র সরে গেছে। ডাষ্টগুলো নিউইয়র্কের তিনটি প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা করতে দেয়া হয়েছে ডাষ্টগুলোর পরিচয় প্রকাশ না করে। কামাল সুলাইমান আশংকা করছে, ও.এম.এফ গ্রুপ সবগুলো ল্যাবরেটরীর দিকে নজর রাখছে। সে কারণে রেজাল্ট সংগ্রহ করতে এখনও সে যায়নি। ফলে ওদিকে কাজটা থেমে গেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'মি. কামাল সুলাইমানের পক্ষ থেকে ডাষ্ট পরীক্ষা করতে দেয়া হয়েছে, সুনির্দিষ্টভাবে এটা কি তারা জানতে পেরেছে?' সান ওয়াকার বলল।

'বিষয়টা এত খোলামেলা ওর সাথে আলোচনা হয়নি। তবে আমার মনে হয় ওরা সন্দেহের উপর পাহারা বসিয়েছে, যাতে আমরা ডাষ্ট পরীক্ষা করতে না

পারি। তিনটি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্যে ডাষ্ট জমা দেয়া হয়েছে, ডাষ্ট সংগ্রহ করার এক ঘণ্টার মধ্যে ডাষ্টের তিনটি ভিন্ন পরিচয়ে এবং তিনজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পক্ষ থেকে। কামাল সুলাইমানই তিন নাতে তিন ব্যক্তি সেজেছিল।' বলল আহমদ মুসা।

'থ্যাংকস গড। সব আট-ঘাট বেঁধেই কাজটা করা হয়েছে বলে আমি মনে করি। সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা নিশ্চয় ওদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ আমি জানি, নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের এসব ল্যাবরেটরিতে প্রতিদিন টেষ্টের জন্যে শত শত কেস জমা হচ্ছে। এই অবস্থায় ডাষ্টের পরিচয় ও জমাদানকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নাম না জানলে বাঞ্ছিত জিনিস বের করা মুস্কিল।' সান ওয়াকার বলল।

'তোমার কথাই যেন সত্য হয় সান ওয়াকার। সমস্যা হলো, ভিন্ন নামে জমা হলেও একই ব্যক্তি তিন জায়গায় গেছে, প্রতিষ্ঠানগুলোর টিভি ক্যামেরায় এ ছবি উঠেছে।' বলে আহমদ মুসা সোফায় সোজা হয়ে বসল। বলল, 'নিউইয়র্কের এই অভিজ্ঞতা থেকে আমি মনে করছি, কাল সকালেই গণকবরের খনন কাজ শুরু হওয়া দরকার। আমার বিশ্বাস কাল সকালের মধ্যে আমাদের বিল্লাহ এখানে পৌছে যাবে।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে আজই পুলিশ, ফেডারেল অফিসসহ সবাইকে জানিয়ে দিতে হয়।' প্রফেসর আরাপাহো বলল।

'জি স্যার।' বলল আহমদ মুসা।

'অল রাইট। তাহলে এখনই কাজে নামতে হয়।' প্রফেসর আরাপাহো বলল।

'খননের পরের বিষয়গুলো কি চিন্তা করেছেন ভাইয়া?' জিজ্ঞাসা সান ওয়াকারের।

'পরের কাজও তোমার এবং স্যারেরই বেশি। যে কয়টা দেহাবশেষ পাওয়া যাবে তার প্রত্যেকটি থেকে ৪টি করে দাঁত, প্রত্যেকটির থেকে দুপ্যাকেট করে দেহাবশেষ নিয়ে যেতে হবে শিকাগোতে পরীক্ষার জন্যে। আমার পরীক্ষার বিষয় তিনটি। এক. লোকগুলো কোন জাতি গোষ্ঠীর, দুই. লোকগুলো কয় তারিখে কতটার সময় নিহত হয়েছে, এবং তিন. তারা কিভাবে নিহত হয়েছে। স্যারের

সাথে শিকাগোর সংশ্লিষ্ট দুটি ল্যাবরেটরীর কথা হয়েছে। তারা বলেছে দাঁত ও দেহাবশেষ পেলে তিন বিষয়েই তারা নিখুঁত তথ্য দিতে পারবে। সুতরাং স্যার এবং তোমাকেই এ মিশন নিয়ে শিকাগো যেতে হবে।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু এই ডকুমেন্টগুলার প্রামাণ্যতা নিরুপিত হবে কিভাবে?' সান ওয়াকার বলল।

'এ ব্যাপারে আমি প্রফেসর স্যারের সাথে আলোচনা করেছি। আমার চিন্তা হলো, 'গণকবর থেকে পাওয়া প্রত্যেকটা দেহাবশেষ বিষয়ে চারটা প্যাকেট হবে। দুটি দাঁতের প্যাকেট, আর দুটি দেহাবশেষের প্যাকেট। দাঁতের দুপ্যাকেটের প্রত্যেকটিতে দুটি করে দাঁত থাকবে। দেহাবশেষের দুটিতে একই জিনিস থাকবে। প্রত্যেকটা প্যাকেট সকলের উপস্থিতিতে সিল করা হবে এবং প্রত্যেকটি প্যাকেটে প্রত্যয়নমূলখ স্বাক্ষর থাকবে পুলিশের থানা কর্তৃপক্ষের, ফেডারেল কমিশনার অফিসের এবং রেডইন্ডিয়ান কমিউনিটি প্রধানের। অর্থাৎ প্রত্যেকটি দেহাবশেষের প্রত্যেক বিষয়ে দুটি করে সীল প্যাকেট হবে। দুটি প্যাকেটের একটি ল্যাবরেটরিতে দেয়া হবে পরীক্ষার জন্যে, আর একটি আমাদের হাতে থাকবে রেকর্ড হিসাবে।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ ভাইয়া। নিñিদ্র ব্যবস্থা হয়েছে। প্রমাণের বিষয়টা নিয়েই আমার উদ্বেগ ছিল।' বলল সান ওয়াকার।

'কিন্তু একটা বিষয়, 'অবশিষ্ট দেহাবশেষ থাকবে কোথায়?' বলল প্রফেসর আরাপাহো আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

'কোন গণকবর আবিষ্কৃত হবার পর এর দায়িত্ব বর্তায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষক কর্তৃপক্ষের উপর। সেই হিসেবে পুলিশ গণকবরের দেখা-শোনা করবে, যতদিন না উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে তাদের বিধি-ব্যবস্থা শেষ না করেন।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ। ঠিক, এটাই আইন।' বলে উঠে দাঁড়াল প্রফেসর আরাপাহো। বলল, 'আমি যাই। ওদিকে গিয়ে দেখি, সকালেই কাজ আমরা শুরু করব। তুমি রেষ্ট নাও। বাই।'

প্রফেসর আরাপাহো চলে গেলে সান ওয়াকার বলল, 'আমিও উঠি। সন্ধ্যার পর আসব।'

সান ওয়াকার যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

'ঠিক আছে। এস। কিন্তু শোন, তুমি সান ইয়াজুনোকে বলো সে যেন ফেডারেল কমিশনার অফিস এবং পুলিশ ষ্টেশনের কথা-বার্তা, চিন্তা-ভাবনার দিকে নজর রাখে। তারা যত বেশি আমাদের সহযোগী হয়, ততই ভাল।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনি কিছু আশংকা করেননি তো?' সান ওয়াকার বলল নিচু কণ্ঠে।

'সে রকম কিছু কারও মধ্যেই আমি দেখিনি। আমি বলছি যেটা এ কারণে যে আমাদের সাবধান হতে দোষ নেই।'

'তাহলে আমি সন্ধ্যায় এদিকে আসছি না। সান ইয়াজুনোর সাথে আমি পুলিশ ষ্টেশনের দিকেই যাব।'

'ঠিক আছে। কিন্তু তোমরা কালকে সকালের ব্যাপারে ওদের কিছু বলবে না। ওটা বলবেন প্রফেসর স্যার ফরমালি ওদেরকে।'

'ঠিক আছে, চলি। আচ্ছা.........।' কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে সান ওয়াকার বলল, 'মনেই থাকে না যে, আমাদের সালাম-কালাম সব শিকেয় তুলে রাখা হয়েছে।'

'তা রাখা হয়েছে, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শিকায় তোলা নেই।' আহমদ মুসা বলল হেসে উঠে।

'সে ভুল হবে না অবশ্যই। আচ্ছা ভাইয়া, আজ সকালে কিন্তু ভাবীর কাছে আপনার টেলিফোন করার কথা ছিল, রাতে বলেছিলেন।'

'ধন্যবাদ বিষয়টা মনে করিয়ে দেবার জন্যে। সকালে করেছিলাম, সন্ধ্যার পর আবার টেলিফোন করতে হবে।'

'বিশেষ কোন খবর আছে?'

'না, সকালে পাইনি। হাসপাতালে গিয়েছিলেন। মোবাইল বন্ধ ছিল।' বলল আহমদ মুসা।

'হাসপাতালে কেন?' প্রশ্ন করল সান ওয়াকার। তার চোখে-উদ্বেগ।

'উদ্বেগের কিছু নেই রুটিন চেকিং। মেয়াদের শেষ দিকে তো! ওকে সব ব্যাপারে এখন সাবধান থাকতে হচ্ছে। ছোট-খাট ব্যাপারেও ডাক্তারের পরামর্শ প্রয়োজন হয়।'

'ওখানকার সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের সাথেও আপনার কথা বলা উচিত।'

'মদিনাতুন্নবী স্পেশালাইজড ষ্টেট হাসপাতালের চীফ ড. ফাতেমার কেয়ারে উনি আছেন। আমি তার সাথে কথা বলেছি। আগে থেকেই তিনি আমার পরিচিত।'

'থ্যাংকস গড। আসি। বাই।' বলল সান ওয়াকার।

'এস। বাই।' বিদায় জানাল আহমদ মুসা সান ওয়াকারকে।

'নিউইয়র্ক অ্যাটোমিক ল্যাবরেটরী'র ডকুমেন্ট ডেলিভারি কাউন্টার।

সময় সকাল ৮টা। সবেমাত্র অফিস খুলেছে। দিনের কাজ গোছ-গাছ করে নিচ্ছে সবাই। ডেলিভারি কাউন্টার ল্যাবরেটরির সম্মুখভাগের একটি কক্ষ। কক্ষটির দরজা ঠেলে প্রবেশ করলেই ডেলিভারী কাউন্টার। কাউন্টারে বসে আছে একজন যুবক এবং একজন তরুণী।

কাউন্টারের ফাইল-পত্র গোছ-গাছ করে সেলফের ফাইল, প্যাকেট চেক করে ঠিক-ঠাক করে রেখে দুজনে চেয়ারে এসে বসল।

ঘরে এসে প্রবেশ করল একজন লোক। মাথায় হ্যাট। দুপাশের কানের নিচ পর্যন্ত নামানো জুলফি।

গোঁফ অর্ধ চন্দ্রের আকারে মুখের উপরটা ঘিরে রেখেছে। পরনে কাউবয় প্যান্ট ও শার্ট। পায়ে ফিল্ড বুট।

লোকটার গোটাটাই একজন কাউবয়-এর প্রতিকৃতি।

লোকটা সোজা এসে যুবকটির সামনে দাঁড়াল। একটা ইনভেলাপ থেকে একটা রিসিট বের করে তুলে দিল যুবকটির হাতে।

যুবকটি রিসিটের উপর চোখ বুলাতেই ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠল তার। দ্রুত চোখ তুলে তাকাল সে লোকটির দিকে।

লোকটিরও দুচোখ বাজের মত আটকে ছিল যুবকটির উপর। যুবকটির চোখ-মুখের পরিবর্তন তার দৃষ্টি এড়ায়নি, হ্যাটের ছায়ায় তার চোখ-দুটি শক্ত হয়ে উঠেছে।

যুবকটি লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার একটু বসুন।'

'ডকুমেন্ট আগেই কাউন্টারে আসার কথা। নির্দিষ্ট সময়ের চারদিন পরে আসছি।' বলল লোকটি।

'এসেছে স্যার। এবার ফাইনাল চেকটা করে আসি।' বলে উঠে দাঁড়াল যুবকটি।

'ঠিক আছে ডকুমেন্টটা দিন। আমি দেখতে থাকি। আপনি চেক করে আসুন।' বলল লোকটি স্থির কণ্ঠে।

যুবকটি উঠে শেলফ থেকে একটা ফোল্ডার বের করে কাউন্টারে এল। বলল, 'এই তো আপনার ডকুমেন্ট। একটু বসুন। আমি স্যারকে দিয়ে চেক করিয়েই নিয়ে আসছি।'

লোকটি কাউন্টারের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। বাজের মতই ছোঁ মেরে লোকটি যুবকটির হাত থেকে ফোল্ডারটি নিয়ে নিল।

যুবকটি চিৎকার করতে যাচ্ছিল।

কিন্তু লোকটি এক হাতে ফোল্ডার কেড়ে নিয়েছে, অন্য হাত দিয়ে বের করেছে রিভলবার এবং সে রিভলবার তাক করেছে যুবককে। সেই সাথে একবার রিভলবার ঘুরিয়ে এনেছে তরুণীর দিক থেকেও।

যুবকটি হা করেছিল, কিন্তু তার কণ্ঠ থেকে চিৎকার বেরুল না। নিজেকে সামলে নিয়েই সে বলে উঠল, 'স্যার আমাদের বিপদে ফেলবেন না। আমরা চাকুরি হারাব। ওটা আমাকে দিন।'

যুবকটি কোন কথা বলল না। রিভলবারের ট্রিগার টিপল পরপর দুবার যুবক ও তরুণীকে লক্ষ্য করে। রিভলবার থেকে দুজনের দিকে দুগুচ্ছ ধোয়া বেরিয়ে গেল। সংগে সংগেই দুজন সংজ্ঞা হারিয়ে ঢলে পড়ল।

লোকটি ফোল্ডারটা একবার দেখে নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে লোকটি পার্কিং-এ রাখা একটি ট্যাক্সি ক্যাবে উঠে বসল। বলল, 'চলুন থার্ড এভেনিউ-এর স্প্রিং টাওয়ারে।'

গাড়ি চলতে শুরু করল।

কাউবয় বেশে কামাল সুলাইমান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। আরও শুকরিয়া আদয় করল হাতে পাওয়া রিপোর্টের জন্যে। ডাষ্টের কমপোনেন্ট এ্যানালিসিসে পরিষ্কার বলা হয়েছে, ডাষ্টে ডেমোলিশন পাউডারের উপস্থিতি ধ্বংসকারী মাত্রায় রয়েছে।

থার্ড ষ্ট্রিটের স্প্রিং টাওয়ারে যখন কামাল সুলাইমানের গাড়ি পৌছল, তখন সকাল ৯টা।

স্প্রিং টাওয়ারের প্রথম তিনটি ফ্লোর নিয়ে 'ল্যাবরেটরি অব ফিজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন' কাজ করছে। এক তলায় কাষ্টমারস সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের দুটি উইং। একটা ডিপোজিটস, আরেকটা ডিজবারসমেন্ট।

কামাল সুলাইমান প্রবেশ করল ডিজবারসমেন্ট ডিপার্টমেন্টে। এর অনেকগুলো বিভাগ। কামাল সুলাইমান রিসিট বের করে দেখল তাকে বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস সেকশনে যেতে হবে। কামাল সুলাইমান এদিক-ওদিক খুঁজে এক প্রান্তে গিয়ে পেল সেকশনটি। প্রবেশ করল কক্ষে। কাউন্টারে দুজন যুবক বসে। কাউন্টারের সামনে একপ্রান্তে সোফায় বসে আছে আরও দুজন।

কামাল সুলাইমান কাউন্টারে গিয়ে এক টুকরো কাগজে লেখা একটা নাম্বার একজন যুবকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাম্বারের ডকুমেন্ট ডেলিভারির জন্যে রেডি কিনা।'

যুবকটি নাম্বার দেখেই তার রেজিষ্টারের দিকে তাকাল।

তাকানোর সংগে সংগেই তার চোখে-মুখে একটা উত্তেজনা ফুটে উঠল। তাকাল সে পাশের যুবকের দিকে এবং এগিয়ে দিল তার দিকে চিরকুটটি। দ্বিতীয় যুবকটি চিরকুটের নাম্বারটি দেখেই তাকাল সামনের সোফায় বসা যুবক দুজনের দিকে। বলল, এই যে শুনুন, ইনি ঐ ডকুমেন্টের খোঁজে এসেছেন।

সংগে সংগেই সোফায় বসা দুজন যুবক স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে উঠল। একযোগে দৌড় দিল কামাল সুলাইমানের দিকে। তাদের দুজনেরই একটি করে হাত কোটের পকেটে।

চোখের পলকে কামাল সুলাইমানের ডান হাত পকেট থেকে ক্লোরোফরম রিভলবার নিয়ে বেরিয়ে এল। ওরাও তখন রিভলবার বের করছে। কামাল সুলাইমানের রিভলবার 'দুপ' 'দুপ' শব্দ করে উঠল দুবার। দুবার ট্রিগার টিপেই কামাল সুলাইমান তার রিভলবার ঘুরিয়ে নিল কাউন্টারের দুজন যুবকের দিকে। দেখল, যুবকদের একজন ইন্টারকমের বোতাম টিপে কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছে। কিন্তু কামাল সুলাইমানের রিভলবার তাদের দিকে ঘুরতে দেখে থেমে গেছে।

কামাল সুলাইমান বাম হাত বাড়িয়ে ইন্টারকমের সুইচ অফ করে দিয়ে বলল, 'ওদের দুজনকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু তোমাদের দুজনের মাথা গুড়িয়ে দেব যদি ডকুমেন্টটা দিতে এক মুহূর্ত দেরি কর।'

বলে কামাল সুলাইমান বাম হাত দিয়ে দ্বিতীয় রিভলবার বের করে তাদের দিকে তাক করল। আর ডান হাতের ক্লোরোফরম রিভলবার পকেটে রেখে দিল।

যুবক দুজন কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। একজন বলল, 'আমাদের আপত্তি নেই স্যার। কিন্তু আমাদের উপর নিষেধ আছে। দিচ্ছি স্যার।'

বলে যুবকটি একটু এগিয়ে তাদের পেছনের সেলফ থেকে একটা ফাইল বের করে কামাল সুলাইমানের হাতে দিল।

কামাল সুলাইমান ফাইলের ভেতর ত্বরিত একবার চোখ বুলিয়ে বন্ধ করে দিল। বলল, 'নিষেধ করেছে কেন? ওরা কারা?'

'জানি না, ওরা খুব পাওয়ারফুল স্যার। আমাদের কোম্পানীর প্রেসিডেন্টকেই ওরা বাধ্য করে ফেলেছে। আমাদের চাকরি থাকবে না স্যার। উপরন্তু আমাদের বিপদ হবে এ ফাইল আমরা দিয়েছি বলে। আপনি কিছুক্ষণ পরে এলে ফাইল পেতেন না। ওরা নিয়ে যেত। ওরা ফাইলও চায়, আপনাদেরকেও ধরতে চায়।'

‘ধন্যবাদ সহযোগিতার জন্যে। ভয় নেই তোমাদের চাকরি থাকবে। ওদের মত তোমরাও সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে থাকবে। তাহলে তোমাদের দোষ দেবার সুযোগ থাকবে না।’ বলে কামাল সুলাইমান প্যাকেট থেকে আবার ক্লোরোফরম রিভলবার বের করে ক্লোরোফরম বুলেট ফাটিয়ে ওদের সংজ্ঞাহীন করে দিল।

দ্রুত বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বেরুবার সময় ঘরটাকে লক করল যাতে করে এ বিল্ডিং থেকে তার বেরুনো পর্যন্ত এ ঘরে কেউ না ঢুকতে পারে।

বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল কামাল সুলাইমান। ট্যাক্সি ক্যাবে ফিরে এল।

সিটে বসে রুমাল দিয়ে কপালের ঘামটা মুছতে মুছতে ট্যাক্সি ক্যাবের ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘আরও একটা অফিসে যাব। এবার চলুন কুইন্স-এর মার্টিন লুথার কিং এভেনিউতে। এভেনিউ-এর উত্তর প্রান্তে পশ্চিম পাশ ঘেঁষে পার্ক আছে। পার্কের দক্ষিণ পাশ ঘেঁষে আরেকটা ষ্ট্রিট। পার্কের অপজিটে ষ্ট্রিটের মুখে একটা চারতলা বাড়ি। ওটা ‘ল্যাবরেটরি অব সাইন্সেস’। ওখানে যাব।

‘ওকে স্যার। কিন্তু জায়গাটাতো অনেক দূর।’ বলল ড্রাইভার।

‘আপনি কি অসুবিধা মনে করছেন?’ কামাল সুলাইমান বলল।

‘না স্যার। আমার কোন অসুবিধা নেই। এখন ব্রীজ, ট্যানেল সবটাতেই প্রচন্ড জ্যাম। বেশ দেরি হবে। বোর হবেন। এজন্যেই বললাম।’ বলে ড্রাইভার ষ্টার্ট দিল। সেই সাথে অন করে দিল তার ক্যাসেট প্লেয়ার।

চলতে লাগল গাড়ি।

আর ক্যাসেট প্লেয়ারে নরম, মিষ্টি সুরের আরবী বাজনা বেজে উঠল।

একটু শুনল কামাল সুলাইমান। না, খাঁটি আরবী বাজনা, একটা বিখ্যাত আরবী যন্ত্র সংগীত।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো কামাল সুলাইমানের। বলল, ‘ড্রাইভার এমন ক্যাসেট আপনি কোথায় পেলেন? জানেন আপনি এ গান কোন ভাষার?’

‘জানি স্যার। আরবী ভাষার। আপনি পছন্দ করবেন বলে লাগালাম।’ ড্রাইভার বলল।

‘আমি পছন্দ করব কি করে বুঝলেন?’ কামাল সুলাইমানের কণ্ঠে বিস্ময়।

'আপনি তো মুসলমান। তাই।'

'আমি মুসলমান কি করে বুঝলেন?' এবার কামাল সুলাইমানের কণ্ঠে বিস্ময়ের সাথে উদ্বেগও।

'স্যার এ পর্যন্ত আপনি দুবার গাড়ি থেকে নেমেছেন। নামার সময় দুবারই আপনি বিসমিল্লাহ বলেছেন। আস্তে বললেও আমি শুনতে পেয়েছি। আবার প্রথমবার গাড়িতে উঠার সময়ও আপনি এইভাবে বিসমিল্লাহ বলেছেন।' ড্রাইভার বলল।

'বিসমিল্লাহ শব্দটা আপনি কি করে বুঝলেন? আর মুসলমানরা এটা বলে কি করে জানলেন?'

'স্যার জানব না কেন? আমি তো মুসলমান।'

'মুসলমান? কিন্তু আপনি তো পুরাপুরি আমেরিকান শ্বেতাংগ।'

'জি স্যার। আমি তখন ছোট। সে সময় আমার আব্বা-আম্মাসহ গোটা পরিবার ইসলামে কনভার্ট হয়। আমি গত বছর আমার স্ত্রীসহ হজও করেছি স্যার।'

'মোবারকবাদ। মোবারকবাদ। খুব খুশি হলাম। আপনার নাম কি?'

'আগে আমার নাম ছিল 'অ্যান্টনীয় আব্রাহাম'। ইসলামে আসার পর আমার নাম হয়েছে 'আহমদ ইব্রাহিম'। নামটা রাখেন আমাদের এলাকা ব্রুকলিনের এক মসজিদের ইমাম।'

'তুমি তোমার ধর্ম ইসলামকে খুব ভালবাস, তাই না?'

'অবশ্যই স্যার। টাওয়ার ধ্বংসের পর দুঃসময়কালে আমার আব্বা ও আমরা আমাদের সবকিছু দিয়ে মুসলিম ভাইদের সাহায্য করেছি, বাড়িতে তাদের অনেককে আশ্রয় দিয়েছি। খৃষ্টান ও ইহুদী শ্বেতাংগদের অন্যায়ের মোকাবিলা করেছি।' বলল ড্রাইভার।

'টুইনটাওয়ার কারা ধ্বংস করেছে মনে করেন?'

'যারাই করুক স্যার, মুসলমানরা করেনি। কারণ টুইনটাওয়ার, টুইনটাওয়ারের মালিক, কিংবা সেখানে যারা মরেছে, তাদের সাথে মুসলমানদের

কোন শত্রুতা ছিল না। মুসলমানরা কারণ ছাড়া এ ঘটনা ঘটাবে তা যুক্তিসংগত নয়।'

'সুন্দর যুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু দায়টা মুসলমানদের ঘাড়ে চাপল কেন?' জিজ্ঞাসা কামাল সুলাইমানের।

'দায় তো কারও না কারও ঘাড়ে চাপাতেই হয়। মুসলমানদের ঘাড়ে চাপানো তখনকার সরকারের জন্যে লাভজনক ছিল।'

'লাভজনক কোন দিক দিয়ে?' বলল কামাল সুলাইমান। তার মুখে হাসি।

'আমাদের তদানিন্তন সরকারের আফগান ও ইরাক পলিসির ক্ষেত্রে এটা লাভজনক হয়েছে। কিন্তু স্যার মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতির বোঝা এখনও তাদের বইতে হচ্ছে।'

'খুব সুন্দর বলেছেন।'

'মাফ করবেন স্যার। আপনাকে আমেরিকান মনে হয়, কিন্তু উচ্চারণ আমেরিকান নয়।'

'আমি আমেরিকান নই। কিন্তু আমেরিকান সেজেছি।'

'স্যারের নাম কি জানতে পারি?' বলল ড্রাইভার।

'অবশ্যই। আমার নাম কামাল সুলাইমান। তবে এ নামে আমাকে এখন ডাকবেন না এবং আপনার নামটাও মুখে নেবেন না বাইরে। আমি এখন পুরোপুরি আমেরিকান। নাম কুনার্ড সুলিভান।'

'বুঝেছি স্যার। মুসলমানদের বহু ক্ষেত্রেই নাম ভাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়।'

কামাল সুলাইমান ও ড্রাইভার আহমদ ইব্রাহিমের মধ্যে এমন আলাপ চলল 'ল্যাবরেটরি অব সাইন্সেস' পৌছা পর্যন্ত।

বিশাল মার্টিন লুথার কিং এভেনিউ-এর ধার ঘেঁষে 'ল্যাবরেটরি অব সাইন্সেস' এর বিল্ডিংটা।

রাস্তার বিশালত্বের তুলনায় গাড়ি কম। মানুষ তো চোখেই পড়ে না।

ল্যাবরেটরির সামনে পার্কিং-এর জায়গা আছে।

কামাল সুলাইমান ড্রাইভারকে বলল, 'এমন জায়গায় গাড়ি পার্ক করুন যাতে বেরুতে কোন অসুবিধায় পড়তে না হয়।'

'ঠিক আছে স্যার।' বলল ড্রাইভার।

'আর স্যার নয়, ভাই বলবেন। সব সম্পর্কের চাইতে এই ভাই সম্পর্ক সবচেয়ে বড় মুসলমানদের জন্যে।'

'ধন্যবাদ স্যা...... ভাই।' বলল আহমদ ইব্রাহিম হাসি মুখে।

গাড়ি পার্ক হলে নামার সময় কামাল সুলাইমান কাঁধে ঝুলানো সাইড ব্যাগ থেকে দুটি ফোল্ডার ফাইল ড্রাইভারের হাতে দিয়ে বলল, 'এ দুটি জিনিস আপনার কাছে কিছুক্ষণের জন্যে আমানত থাকল। আমি অফিস থেকে আসছি।'

বলে কামাল সুলাইমান বিসমিল্লাহ্ বলে গাড়ি থেকে নামল।

কামাল সুলাইমান প্রবেশ করল অফিসে।

প্রথমেই রিসিপশন।

রিসিপশনে দুজন লোক বসে।

কামাল সুলাইমানকে দেখেই তার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন তারই জন্যে তারা উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে।

চিন্তার একটা কালো মেঘ উঁকি দিল কামাল সুলাইমানের মনে। কিভাবে এটা সম্ভব? তাহলে এখানে খবর পৌছেছে। তার চেহারা ও পোশাকের বিবরণও কি এসেছে। মনে মনে নিজেরই একটু সমালোচনা করল কামাল সুলাইমান, তার পোশাক পাল্টানো উচিত ছিল।

কিন্তু এখন তার পিছানোর পথ নেই। তাকে তৃতীয় ডকুমেন্টটি যোগাড় করতেই হবে। এটাই আমেরিকার সবচেয়ে সম্মানিত প্রামাণ্য ল্যাবরেটিরি। মনে পড়ল আহমদ মুসার উপদেশ, দুনিয়াতে একমাত্র শিশা ছাড়া সবকিছুর মধ্যে ফাঁক আছে। সেই ফাঁক বা দুর্বলতা তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে।

দ্বিধা দূর হয়ে গেল কামাল সুলাইমানের মন থেকে।

সে মুখোমুখি হলো রিসিপশেনর। সে রিসিট দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল সেকশনটা কোন দিকে?

রিসিপশনের দুজনের মধ্যেই কেমন একটা চাঞ্চল্যের ভাব। তাদের একজন রিসিপশনের পাশেই টাঙানো বোর্ডের দিকে কামাল সুলাইমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, ‘এই চার্টে সব দেখিয়ে দেয়া আছে স্যার।’

কামাল সুলাইমান দ্রুত চোখ বুলাল চার্টটায়। গ্রাউন্ড ফ্লোরেই পেয়ে গেল সেকশনটা। পথটাও খুব ঘোরানো নয়। রিসেপশনের পরেই কাষ্টমার লাউঞ্জ। লাউঞ্জ থেকে তিনটি করিডোর তিনদিকে বেরিয়ে গেছে। যে করিডোরটা উত্তরে এগিয়ে গেছে সেটা শেষ প্রান্তে পৌছার আগে এ থেকে একটা শাখা পশ্চিম দিকে এগিয়েছে। বাঁক নেয়ার পর উত্তর পাশের প্রথম কক্ষটাই ডাষ্ট এবং সোয়েল সেকশন।

কামাল সুলাইমান রিসেপশনিষ্টদের উদ্দেশ্যে ‘ধন্যবাদ’ বলে ভেতরে এগুলো।

লাউঞ্জে মুখোমুখি সোফায় তিনজন লোক বসেছিল। কামাল সুলাইমান লাউঞ্জে ঢুকলে তিনজনই বিভিন্ন ঢং-এ হলেও তাকে দেখে নিল। তাদের চেহারা ও দৃষ্টিকে ল্যাবরেটরির কাষ্টমারের বলে মনে হলো না কামাল সুলাইমানের কাছে।

কামাল সুলাইমান তাদের এড়িয়ে উত্তরের করিডোরে ঢুকে গেল। তার একটি হাত প্যান্টের পকেটে ভয়ংকর স্প্রেগানটার উপর, আরেকটি হাত জ্যাকেটের ডান পকেটে ক্লোরোফরম গানটার গায়ে।

করিডোরের বাঁকে পৌছে কামাল সুলাইমান দেখল সোজা করিডোরটার শেষ প্রান্তে একটা দরজা। দরজা খোলা। দরজার পরে একটা প্রশস্ত ল্যান্ডিং। সেখানেও তিনজন লোক বসে। কামাল সুলাইমান নিশ্চিত ওরাও তারই জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু বিস্মিত হলো কামাল সুলাইমান। তাকে চেনার পরেও কেন আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে না। তাহলে কি কামাল সুলাইমান ডকুমেন্ট হাতে নেয়ার পর শতভাগ নিশ্চিত হয়ে তাকে হাতে-নাতে ধরবে! খুশি হলো কামাল সুলাইমান। সেও এটাই চায়।

কামাল সুলাইমান বাঁক ঘুরে দ্রুত এগিয়ে ঘরটির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

নব ঘুরিয়ে দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল এবং সেই সাথে দরজার লক টিপে বন্ধ করে দিল দরজা।

কাউন্টারে একজন যুবক বসেছিল। আর কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়েছিল আরও তিনজন যুবক।

চারজনই টের পেয়েছিল দরজা লক করার দৃশ্য। ওরা দরজার দিকেই তাকিয়েছিল। যেন ওরা অপেক্ষা করছিল।

তিনজন দাঁড়ানো যুবকের একজনের হাতে ছিল মোবাইল। কামাল সুলাইমানকে প্রবেশ করতে দেখেই সে পকেটে রাখল মোবাইলটা। ওদের মুখে কিছুটা কৌতুকের হাসি।

কামাল সুলাইমানের দুহাত পকেটের দু'রিভলবার। সে আশা করেছিল ওরা আক্রমণে আসবে। তার খবরটা আগেই এরা পেয়ে গেছে মোবাইলে। কিন্তু না তারা আক্রমণে এল না। তারা তিনজনই কাউন্টার থেকে পাশে একটু দক্ষিণে সরে গেল। ব্যাপার তাহলে এটাই যে, ওরা শতভাগ নিশ্চিত হবার জন্যে ডকুমেন্টটা নেয়া অথবা অন্তত চাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায়। মনে মনে হাসল কামাল সুলাইমান।

কামাল সুলাইমান কাউন্টারে বসে থাকা যুবকটির সামনে দাঁড়িয়েরিসিট ও ক্লোরোফরম রিভলবারসহ ডানহাত বের করল।

কামাল সুলাইমানের রিভলবার ধরা হাতটি দ্রুত তিনজন যুবকের লক্ষ্যে উপরে উঠে এল।

শেষ মুহূর্তে ওরাও টের পেয়ে গিয়েছিল। একজন যুবকের পকেটে রাখা হাত দ্রুত বের হয়ে এল। তার হাতে রিভলবার।

অন্য দুজন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল আকস্মিক রিভলবারের মুখোমুখি।

কামাল সুলাইমান পরপর তিনবার ট্রিগার টিপল তার ক্লোরোফরম রিভলবারের। প্রথম ক্লোরোফরম বুলেট ছুটে গেল যে রিভলবার তাক করছিল সে যুবকের দিকে।

কিন্তু বেপরোয়া ক্ষিপ্র যুবকটি তার দিকে ক্লোরোফরম বুলেট বিস্ফোরিত হওয়ার মুখেই ট্রিগার টিপেছিল।

কামাল সুলাইমান রিভলবারের ট্রিগার টেপার অবস্থায়ই কাত হয়ে কাউন্টারের দিকে শরীরটাকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বুকটা তার রক্ষা পেলেও বাম বাহু রক্ষা পেল না। যুবকটির ছোঁড়া বুলেট বাম বাহুর একটা অংশ বিধ্বস্ত করে বেরিয়ে গেল।

এদিকে কামাল সুলাইমানের ছোড়া ক্লোরোফরম চোখের পলকে ওদের তিনজনকেই ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল।

গলগলিয়ে রক্ত নামছিল কামাল সুলাইমানের বাম বাহু দিয়ে।

কিন্তু সেদিকে নজর দেবার সময় ছিল না কামাল সুলাইমানের। রিভলবারের শব্দ নিশ্চয় বাইরে ওরা শুনেছে। ওরা এখনই ছুটে আসবে।

কামাল সুলাইমান ফিরে দাঁড়িয়েছে কাউন্টারের যুবকটির দিকে।

কামাল সুলাইমান ইতিমধ্যে ক্লোরোফরম রিভলবার পকেটে রেখে ডান হাত দিয়ে বাঁ পকেট থেকে তার ভয়ংকর স্প্রেগান বের করে নিয়েছে।

টর্চ আকারের গানটি যুবকের দিকে তাক করে বলল, ‘রিসিটের ফাইলটি দিয়ে দাও, না হলে তোমার মাথা ভর্তা হয়ে যাবে।’

যুবকটি কাঁপছিল। বলল, ‘দিচ্ছি স্যার।’

বলেই যুবকটি ছুটল সেলফের দিকে।

যুবকটি ওদিকে গেলে কামাল সুলাইমান গানটি কাউন্টারে রেখে ডান হাত দিয়ে ব্যাগ থেকে একটা গ্যাসমাস্ক ও মার্বেলের মত দুটি বল বের করে নিল।

ঘরের দরজায় এ সময় ধাক্কা শুরু হলো।

বুঝলো কামাল সুলাইমান ওরা এসে গেছে।

কামাল সুলাইমান-এর বাম হাত দুর্বল হয়ে পড়েছে। উপরে তুলতে কষ্ট হচ্ছে। একহাত দিয়েই কামাল সুলাইমান গ্যাস-মাস্কটি পরে নিল মুখে।

অনেক কষ্টে গানটি বাম হাত দিয়ে ধরল। তার ডান হাতে থাকল দুটি গ্যাস বোম।

যুবকটি ফাইলটা নিয়ে কাউন্টারে এল।

‘খোল ফাইলটা, দেখি ঠিক আছে কিনা।’ কামাল সুলাইমান যুবককে নির্দেশ দিল।

যুবক মেলে ধরল ফোল্ডারটা।

ঠিক বিষয়ের রিপোর্ট ফাইলে আছে দেখল কামাল সুলাইমান।

বাইরে থেকে তখন দরজা ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে।

যুবককে ফাইলটি বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়ে বলল, 'ফোল্ডারটা আমার ব্যাগে ঢুকিয়ে দাও।'

কম্পমান যুবকটি ফোল্ডারটা কামাল সুলাইমানের কাঁধে ঝুলানো ব্যাগে তুলে দিল।

'থ্যাংকস' বলে কামাল সুলাইমান পেছনে হটে দরজায় এল। দাঁড়াল দেয়াল ঘেঁষে। তারপর আস্তে ডান হাতটা নবের কাছে এগিয়ে নিয়ে দ্রুত নব ঘুরিয়ে দরজা আনলক করেই ডান হাত টেনে নিল।

দরজায় প্রচন্ড ধাক্কা চলছিল। আর মাঝে মাঝে নব ঘুরানো হচ্ছিল প্রাণপনে।

কামাল সুলাইমান দরজা আনলক করে হাত টেনে নিতেই বাইরের চাপে প্রচন্ড গতিতে দরজা খুলে গেল।

সংগে সংগেই কামাল সুলাইমান ডান হাতের একটা বল ছুড়ে মারল দরজার বাইরে। পটকা ফাটার মত শব্দ হলো। কোন ধোয়া বেরুল না। কিন্তু সংজ্ঞাহরনকারী মারাত্মক গ্যাস বাতাসের চেয়ে শতগুণ দ্রুত গতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

কামাল সুলাইমান দেখল, কাউন্টারের যুবকটি জ্ঞান হারিয়ে টেবিলের উপর লুটিয়ে পড়েছে।

এবার কামাল সুলাইমান মুখ বাড়ালো বাইলে। দেখল, দশ বারোটি সংজ্ঞাহীন দেহ করিডোর ভরে তুলেছে। তাদের মধ্যে আগের দেখা তিন তিন ছয়জনও আছে। অবশিষ্টরা অফিসের সিকিউরিটি বা কৌতুহলী লোক হবে।

কামাল সুলাইমান ছুটল।

কামাল সুলাইমান কাউন্টারে এসে দেখল, কাউন্টারের একজন ছুটে এসে টেলিফোন হাতে তুলে নিয়েছে।

রক্তাক্ত কামাল সুলাইমানকে দেখে তার হাত থেকে টেলিফোন পড়ে গেল। ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এ সময় উপর তলা থেকে কজনকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসতে দেখা গেল।

কামাল সুলাইমান হাতের অবশিষ্ট গ্যাস বোম মেঝেতে ছুড়ে মেরেই দৌড় দিল ল্যাবরেটরির কার পার্কিং-এর দিকে।

ড্রাইভার আহমদ ইব্রাহিম, ল্যাবরেটরির দিকে তাকিয়ে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল।

কামাল সুলাইমানকে দৌড়াতে দেখে এগুলো সে সামনে। কামাল সুলাইমানকে রক্তাক্ত দেখে বিস্ময় ও উদ্বেগে তার মুখ পাংশু হয়ে গেল।

'কি ঘটেছে? আপনি ঠিক আছেন স্যা........ ভাই?'

'ঠিক আছি। বাম বাহুটা মাত্র আহত। গাড়ির দরজা খুলে দিন।' বলল দ্রুত কণ্ঠে কামাল সুলাইমান।

আহমদ ইব্রাহিম তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে ধরল।

গাড়িতে ঢুকে গেল কামাল সুলাইমান। বলল, 'তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠুন। গাড়ি ছাড়ুন। পরে বলছি সব।'

উদ্বিগ্ন ড্রাইভার আহমদ ইব্রাহিম বুঝল কোন বড় বিপদ ঘটেছে কামাল সুলাইমানের এবং বিপদ তার এখনও কাটেনি।

আহমদ ইব্রাহিম তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে গাড়ি ষ্টার্ট দিল। বলল, 'কোন দিকে যাব?'

'গাড়িটা আগে দূরে সরিয়ে নিন, তারপর বলছি।' কামাল সুলাইমান বলল।

'ভাই সাহেব আপনর বিষয় কিছুই জানি না আমি। শুধু জেনেছি আপনি আমার এক ভাই এবং এটা আপনিই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আপনি যদি ভাইকে বিশ্বাস করেন, তাহলে অনুরোধ করছি আমার বাসায় চলুন। আমার মনে হয় ওটা বুলেট ইনজুরি। আরও এক দেড় ঘণ্টা দেরি করা ক্ষতিকর হবে।' বলল গম্ভীর কণ্ঠে আহমদ ইব্রাহিম।

হাসল কামাল সুলাইমান। বলল, 'আপনি না করার পথ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন। চলুন, আপনার বাসায় যাব।'

'ধন্যবাদ, ভাই সাহেব।' বলল আহমদ ইব্রাহিম হাসি মুখে।

সে নড়ে চড়ে বসল ড্রাইভিং সিটে। ছুটে চলল গাড়ি।

কামাল সুলাইমানের গুলীবিদ্ধ হাতের ক্ষত পরিষ্কার করছিল আহমদ ইব্রাহিম। তাকে সহাযোগিতা করছিল আহমদ ইব্রাহিমের স্ত্রী ডা. আয়েশা আহমদ।

কামাল সুলাইমানের মোবাইলটা বেজে উঠল।

'আপনি টেলিফোন রিসিভ করবেন মি. কামাল সুলাইমান?' জিজ্ঞাসা করল ডা. আয়েশা আহমদ কামাল সুলাইমানকে।

'একটাই টেলিফোন আসবে পারে এবং সেটা খুবই জরুরি। দিন দয়া করে মোবাইলটা।' বলল কামাল সুলাইমান।

ডা. আয়েশা আহমদ মোবাইলটা কামাল সুলাইমানের হাতে দিল।

মোবাইল স্ক্রীণে একবার নজর বুলিয়ে মুখের কাছে তুলে নিয়ে বলল, 'জি ভাইয়া, আমি কোমার্ড সুলিভান।'

'কেমন আছ? খবর কি? তোমার গলা ভারী কেন? গলায় কম্পন কেন?' ওপার থেকে বিস্মিত কণ্ঠ আহমদ মুসার।

'সব খবর ভাল। কিন্তু আমি সামান্য আহত ভাইয়া।'

'আহত? কি হয়েছে?' উদ্বেগ আহমদ মুসার কণ্ঠে।

'বাম বাহুতে গুলী লেগেছে। তেমন সিরিয়াস নয়। গুলীটা বেরিয়ে গেছে।'

'গুলী? তাঁর মানে তুমি শত্রুর 'দূর্বলতা' ও 'ফাঁক'-এর সন্ধানে বেরিয়েছিলে? কিন্তু তোমাকে এমন ঝুঁকি নিতে বলিনি। শেষে তো বলেছিলাম, ওদের খবর রাখ।'

'ভাইয়া আমি খুশি। আজ মরে গেলেও আমার আত্মা তৃপ্তি পেতো। তিনটি ডকুমেন্টই আমি হাত করতে পেরেছি।' বলল কামাল সুলাইমান।

'থ্যাংকস গড। তুমি এখন কোথায়?'

‘ফেরার পথে এক শুভাকাঙ্ক্ষির বাড়িতে। ওঁরা আমার চিকিৎসা করছেন। আমাদের এক ভাই-বোন। বলা যায় আল্লাহ ওদের জুটিয়ে দিয়েছেন।’

‘থ্যাংকস গড। আমার শুভেচ্ছা দিও।’

‘ভাইয়া ওদিকের খবর কি?’

‘বলছি। কিন্তু আগে বল রিপোর্টে কি দেখলে? দেখেছো তো?’

‘দেখেছি। দারুণভাবে পজিটিভ।’

‘থ্যাংকস গড। অনেক ধন্যবাদ তাঁকে। এ দিকের খবর খুব ভাল। গণকবর খোঁড়া হয়েছে। ঠিক ১৪টি কংকালই সেখানে পাওয়া গেছে। দাঁত ও দেহাবশেষ পরীক্ষার জন্যে শিকাগো পাঠানো হয়েছে। এছাড়া গণকবর থেকে আংটি, ঘড়ি ও কয়েনের এমন কিছু জিনিস পাওয়া গেছে, যা থেকে গণকবরের লোকদের জাতীয় পরিচিত নির্ধারণ করা যাচ্ছে।’

‘ভাইয়া, অস্বীকার করার কোন ফাঁক পাবে না তো তারা?’

‘তেমন কোন সুযোগ তাদের জন্যে রাখা হয়নি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘থ্যাংকস গড। মাত্র রিমোর্ট কনট্রোলের বিষয়টাই এখন বাকি থাকল।’

‘হ্যাঁ। রিপোর্টটা পেলেই আমি ওদিকে মনোযোগ দেব।’ কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, ‘এখনকার মতো রাখছি। তুমি রেষ্ট নাও। পরে কথা বলব। বাই।’

‘বাই ভাইয়া।’

কামাল সুলাইমান অফ করে রেখে দিল মোবাইলটা। বলল আহমদ ইব্রাহিমের দিকে চেয়ে, ‘স্যরি।’

‘স্যরি’র প্রশ্ন নেই ভাইয়া। বরং আপনারই কষ্ট হলো। কিন্তু আপনাকে দারুণ খুশি দেখাচ্ছে।’ বলল আহমদ ইব্রাহিম।

‘সত্যিই আমরা আজ খুশি মি. আহমদ ইব্রাহিম। বললাম না, গুলীবিদ্ধ কেন আমি আজ গুলীতে মরে গেলেও আমার আত্মা তৃপ্তি পেত।’

ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ ইব্রাহিম ও তার স্ত্রী আয়েশা আহমদের। বিস্ময় তাদের চোখে-মুখে। বলল, ‘আপনি যেভাবে বললেন, তাতে আনন্দের ব্যাপারটা না শুনে তো থাকতে পারছি না। আরও জানতে ইচ্ছা করছে, গুলীবিদ্ধ হওয়ার মত

ঘটনা কেন ঘটল। আপনি ক্রাইম করতে পারেন, একথা আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া ভাইয়া, আপনি আমাকে তিন জায়গায় নিয়ে গেছেন, তিনটাই বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান-ল্যাবরেটরি। শেষ ল্যাবরেটরি থেকে গুলীবিদ্ধ হয়ে এলেন, কিন্তু অন্য দুল্যাবরেটরি থেকেও ফেরার পর আপনার মধ্যে বেশ উত্তেজনা বা অস্থিরতা দেখেছি।'

কামাল সুলাইমান হাসল। বলল, 'মি. আহমদ ইব্রাহিম, আপনি বলেছেন নিউইয়র্কের টুইনটাওয়ার কোন মুসলমান ধ্বংস করেনি। তাহলে কে করেছে বলে আপনি মনে করেন?'

'যেই করুক, তারা মুসলমানদের উপর এই দায় চাপাবার জন্যেই করেছে। এই ঘটনায় কোন দিক দিয়েই মুসলমানদের কোন লাভ হয়নি। এতে আমাদের আমেরিকার কিছু ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু লাভ হয়েছে লাখোগুণ বেশি আমেরিকার এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর এবং তাদের মিত্র ইসরাইলের। অন্যদিকে মুসলমানদের কোনই লাভ হয়নি, কিন্তু ক্ষতি হয়েছে অবর্ণনীয়, অপূরণীয়। সুতরাং ক্রাইমের মটিভ-তত্ত্ব অনুসারে মুসলমানরা এ কাজ করেনি। এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন মুসলমানের বিরুদ্ধেই কোন 'হার্ড-এভিডেন্স' দাঁড় করানো যায়নি। আর যে সংগঠনকে দায়ি করা হচ্ছে, সে নামে আদৌ কোন সংগঠন মুসলিম দুনিয়ায় মুসলমানদের পক্ষে কাজ করছে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাদের কোন নেতাই টাওয়ার ধ্বংসের আগে বা পরে মুসলিম জনতার সামনে আসেনি, মুসলমানদের নেতা হিসাবে পরিচিতিও হয়নি। এমন কোন নেতাকে আমাদের আমেরিকা বা বাইরের কোন কোর্টে হাজিরও করা হয়নি, যাকে মুসলমানরা স্বীকৃতি দেয়। এই সংগঠনের কাজ দেখানো হচ্ছে ই-মেইল এবং অডিও-ভিডিও টেপে। এগুলো কোন দলিল নয়। যে কেউ এগুলো তৈরি করতে পারে। সুতরাং আমি মনে করি টাওয়ার ধ্বংসের দায় একটা অস্তিত্বহীন ইসলামী সংগঠনের উপর চাপিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের আসামী করা হয়েছিল।' কথাগুলো বলল ডা. আয়েশা আহমদ তার স্বামী আহমদ ইব্রাহিমের কথা বলে ওঠার আগেই।

কামাল সুলাইমান বিস্ময়ের সাথে কথাগুলো শুনছিল। কথা শেষ হতেই বলল, 'ধন্যবাদ বোন, কোন আমেরিকানের মুখে এত সত্য কথা এভাবে আমি

শুনিনি। বুঝতে পারছি, এ কথাগুলো বহুদিন তোমার মনে জমে আছে। আজ এক সুযোগে তা বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু বোন, কারা করেছে এটাও ছিল আমার প্রশ্ন।'

'স্যরি, ভাই সাহেব। এ ব্যাপারে অনেক কথা শুনেছি। কিন্তু তার পক্ষেও কোন প্রমাণ হাজির করা হয়নি। তাই প্রমাণ ছাড়া কারও দিকে অংগুলি সংকেত করা মুস্কিল।' বলল ডা. আয়েশা আহমদ।

'আমারও এই কথা ভাই সাহেব।' ড. আয়েশা আহমদ থামতেই বলে উঠল আহমদ ইব্রাহিম।

'একটু সুখবর দিতে পারি, প্রমাণ নিয়ে কেউ হাজির হচ্ছে।' বলল কামাল সুলাইমান একটু হেসে।

থমকে গেল আহমদ ইব্রাহিমরা দুজনই। তারা বিস্ময়ভরা চোখে তাকাল কামাল সুলাইমানের দিকে। কথা বলে উঠল ডা. আয়েশা আহমদ, 'ভাই সাহেব ফান করছেন না নিশ্চয়! কিন্তু বাস্তবতা হলো, বিশ বছর পার হয়ে গেল, কেউ আসেনি প্রমাণ করার জন্যে। কে আর আসবে? মনে পড়ে আব্বার কথা। তিনি 'আররাহমা' নামক এক এনজিও'র কর্মকর্তা ছিলেন। এই এনজিও ইয়াতিম, বিধবা ও ছিন্নমূলদের সাহায্য করতো। ফিলিস্তিনের মত ভাগ্যবিড়ম্বিত এলাকা ছিল তাদের টার্গেট। টেররিষ্টদের কাছে অর্থ পাচার করা হয় এই অভিযোগে এনজিওটি বন্ধ করা হয়। আব্বাকে জেলে পুরা হয়, তা চ্যালেঞ্জ করতে কেউ এগিয়ে আসেনি। বিশ বছর ধরে মিথ্যার এক জগদ্দল চেপে আছে আমেরিকার উপর। কে আসবে এই জগদ্দল পাথর সরাতে?'

হাসল কামাল সুলাইমান। বলল, 'যিনি এই জগদ্দল সরাবেন, তিনি এতদিন আসেননি বোন। এখন তিনি এসেছেন।'

আহমদ ইব্রাহিম ও ডা. আয়েশা আহমদ দুজনেরই চোখে-মুখে বিস্ময় ও আনন্দের স্ফুরণ। বলল আহমদ ইব্রাহিম, 'কে তিনি? আমরা কি জানতে পারি?'

'আপনারা কি আহমদ মুসাকে চেনেন?' বলল কামাল সুলাইমান।

'চিনব না কেন? তার জন্যে আমরা গর্বিত। তিনি আমেরিকার অশেষ উপকার করেছেন এবং মুসলমানদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তাঁর কথা বলছেন কেন? শুনেছি, তিনি এখন আজরস আইল্যান্ডে। তাঁকে কেউ এ যুগের সিন্দাবাদ

বলেন, কারো কাছে তিনি আধুনিক হাতেম তাই। কিন্তু আমার কাছে তিনি আধুনিক দুনিয়ার মুসলমানদের এক জিয়নকাঠি।' বলল ডা. আয়েশা আহমদ।

'সত্য উদ্ধারের দায়িত্ব তিনিই কাঁধে তুলে নিয়েছেন।' বলল কামাল সুলাইমান।

'আহমদ মুসা? তিনি এখন আমেরিকায়?' এক সাথে বলে উঠল তারা দুজন।

'হ্যাঁ, তিনি আমেরিকায়।'

দুজনের কেউ সংগে সংগে কথা বলল না।

তাদের চোখে-মুখে বিস্ময় ও আনন্দের ছাপ। একটু সময় নিয়ে বলল আহমদ ইব্রাহিম, 'সত্যি আমেরিকানদের জন্যে এটা সুখবর। আশারও খবর এই যে, তার উপর চোখ বন্ধ করে আস্থা রাখা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ২০ বছর আগের জটিল ঘটনার প্রমাণ কি করে সম্ভব?'

হাসল কামাল সুলাইমান। বলল, 'মি. আহমদ ইব্রাহিম আমার ব্যাগে তিনটি ফাইল আছে, ওগুলো দেখ। বিজ্ঞানও তোমাদের পড়তে হয়েছে। অনেক কিছু বুঝবে তোমার।'

আহমদ ইব্রাহিম ও ডা. আয়েশা আহমদ ফাইলগুলো বের করল এবং দেখল।

একটু পর আহমদ ইব্রাহিম বলল, 'ভাই সাহেব, তিনটি ফাইলে তিনটি ল্যাবরেটরির বিল্ডিং-ডাষ্টের ফিজিক্যাল কম্পোজিশন দেখছি। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ডাষ্টের কম্পোজিট কেমিক্যালের মধ্যে অটো ডেমোলিশন অর্গানিজম রয়েছে, যা দিয়ে বহুতল বিল্ডিংকেও ধুলায় পরিণত করে বসিয়ে দেয়া যায়।'

'মি. আহমদ ইব্রাহিম, ধ্বংস টাওয়ারের ডাষ্ট পরীক্ষা করে ল্যাবরেটরিগুলো এই রিপোর্ট দিয়েছে।' বলল কামাল সুলাইমান।

বিস্ময়ে হা হয়ে উঠেছে আহমদ ইব্রাহিমের মুখ। বলল, 'তার মানে ডেমোলিশন ডিভাইস দিয়ে টুইনটাওয়ার ধ্বংস করা হয়েছে!'

'হ্যাঁ এটাই সত্য।' বলল কামাল সুলাইমান।

‘তাহলে অনেকে যে সন্দেহ করেছিল, সেটাই সত্য? কিন্তু এ রিপোর্ট আপনার কাছে কি করে? মানে কিভাবে এই ডাষ্ট পরীক্ষা হলো? এ রিপোর্ট সংগ্রহের জন্যে রক্তাক্ত অভিযান আপনাকে করতে হলো কেন?’ বিস্ময়-জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল ডা. আয়েশা আহমদ।

কামাল সুলাইমান এ পর্যন্ত প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে যা করা হয়েছে, তার বিবরণ দিয়ে বলল, ‘গণকবরটিতে ঠিক ১৪ জনেরই কংকাল পাওয়া গেছে। ডাষ্ট যেমন প্রমাণ করল টাওয়ার ধ্বংস হয়েছে বিমানের আঘাতে নয়, ধ্বংস হয়েছে ডেমোলিশ ডিভাইসের মাধ্যমে তেমনি কংকালগুলোও প্রমাণ করবে কথিত বিমান হাইজ্যাকাররা বিমানে ছিল না। তাদের হত্যা করে তাদের নাম ব্যবহার করা হয়েছে।’

বিস্ময়-বিমূঢ় ডা. আয়েশা আহমদ জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনিই কি তাহলে আহমদ মুসা?’

হাসল কামাল সুলাইমান। বলল, ‘আমি কামাল সুলাইমান। আমি তাঁর একজন নগণ্য সহকর্মী। আমি এইমাত্র যার সাথে টেলিফোনে কথা বললাম তিনি ছিলেন আহমদ মুসা।’

‘আপনাকে স্বাগত। আমরা সৌভাগ্যবান যে, আপনার দেখা এইভাবে আমরা পেলাম এবং পেলাম বিশ বছরের সেরা খবর। আজ নিশ্চিতই মনে হচ্ছে, বিশ বছর ধরে ঘুনে ধরা জগদ্দল পাথর আমাদের বুক থেকে নামবে। আল্লাহর অশেষ শোকরিয়া।’ বলল আহমদ ইব্রাহিম।

আহমদ ইব্রাহিম থামতেই ডা. আয়েশা আহমদ কামাল সুলাইমানকে লক্ষ্য করে বলল, ‘ভাই সাহেব ধ্বংস টাওয়ারের নিচে লুকানো সত্য-সন্ধানের আপনার কাহিনী শুনে অনেক দিন আগে শুনা একটা কথা মনে পড়ছে। বিষয়টা টাওয়ার ধ্বংসের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। আমার মামা মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের ‘সেফ এয়ার সার্ভিস’ (SAS)-এর একজন কর্মকর্তা ছিলেন। অনেক আগে তিনি রিটায়ার করেছেন এবং তিনি অমুসলিম। অমুসলিম হলেও আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক সব সময় ঠিক ছিল, ঠিক আছে। কয়েক বছর আগে ঘরোয়া পরিবেশে আমি মামি ও মামা গল্প করছিলাম। প্রসংগক্রমে টাওয়ার ধ্বংসের কথা

ওঠে। আমাকে রাগিয়ে দেবার জন্যে মামি বলেছিলেন, 'ধ্বংস টাওয়ার সাক্ষী হয়ে আছে যে, মুসলমানরা সন্ত্রাসী। তাদের কেউ সন্ত্রাস করে, কেউ একে সমর্থন করে। দেখ, আয়েশা আজও সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসী বলে না।'

সেদিন মামা আমার পক্ষ নিয়েছিলেন। পাল্টা আক্রমণ করেন তিনি মামিকে এই বলে, 'যদি জানতে পার মুসলিম হাইজ্যাকাররা বিমান দুটো টুইনটাওয়ারে নিয়ে যায়নি, অন্যকিছু বিমান দুটিকে টুইনটাওয়ারে টেনে নিয়ে গেছে, তাহলে সন্ত্রাসের অভিযোগ কার বিরুদ্ধে করবে?'

মামি বলেছিলেন, 'যদি' যদি 'যদি' না হতো, তাহলে উত্তর দেয়ার প্রয়োজন হতো।'

মামা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, 'যদি প্রত্যাহার করে নিলাম। এখন বল।'

মামির ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, 'যা বলেছ, সত্যি বলেছ?'

'হ্যাঁ।' মামা বলেছিলেন।

'কিন্তু যা বলছ, তা না তুমি বিশ্বাস করতে পার, না দুনিয়া বিশ্বাস করতে পারে?' বলেছিলেন মামি।

মামা বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু দুনিয়া বিশ্বাস করতে পারে না। দুনিয়াকে বলাও যায় না। তাই তো বলিনি।'

'কিন্তু এমন বিশ্বাসের জন্যে নিঃসন্দেহে ভিত্তি প্রয়োজন।' মামি বলেছিলেন।

'সূর্য উঠতে দেখে যদি বলি সূর্য উঠছে, তা যে ধরনের সত্য, আমার কথাও সে ধরনের সত্য।'

মামি একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। একটু পর বলেছিলেন, 'তোমার সত্যের স্বরূপটা কি ধরনের তা আমি আঁচ করতে পারি, কিন্তু স্বরূপটা কি বলতে পারি না। আমি জিজ্ঞাসাও করব না। আর এ নিয়ে তুমি কোন আলোচনাও করো না। এমনিতেই তোমার পরিবারের একটা অংশ মুসলিশ হয়ে গেছে।'

'বলতে চাইনি। কথাচ্ছলে এসেছে।' বলে মামা চুপ হয়ে গিয়েছিলেন।

মামি ও মামার না জানা ও না জানানোর বিষয়ে আপোশ হয়ে গেলেও আমার ভেতর একটা জিজ্ঞাসা কিন্তু বেড়েই চলছিল। একদিন সুযোগ বুঝে মামাকে বলেছিলাম, 'মামা একটা সত্য আপনার কাছে জানতে চাই। বলবেন?'

'সত্য বলারই বিষয়। কিন্তু তোমার ও আমাদের জন্যে ক্ষতিকর নয় তো?'

'না।'

'তাহলে বলব। সত্যটা কি বল?'

আমি তাকে সেই দিনের সে আলোচনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম, 'সূর্যের মত দেখা সেই সত্যটা কি মামা।'

'কিন্তু এ সত্যের প্রকাশ তোমার ও আমাদের পরিবারের জন্যে ক্ষতিকর।'

'ক্ষতিকর অবশ্যই যদি ক্ষতিকারীরা এটা জানতে পারে। কিন্তু ক্ষতিকারীরা জানার কোনই সুযোগ নেই মামা।'

মামা অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ মা, তোমাকে বলতে পারি। আমার তো বয়স হচ্ছে। আমার পরে কেউ একজন সত্যটার স্বাক্ষী থাকা প্রয়োজন।'

মামা একটু থামার পর একটা দম নিয়ে বলেছিলেন, 'টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার দিন 'সেফ এয়ার সার্ভিস' সেন্টারের অবজারভেটরিতে রাডার স্ক্রীন মনিটরের দায়িত্ব আমার ছিল। প্রতি মুহূর্তের ছবি ও বিবরণ আমি রেকর্ড করছিলাম। এটা করতে গিয়ে আমি দেখেছিলাম আমাদের 'গ্লোবাল হক' নামের বিশেষ বিমান দুটি সিভিল বিমানকে রিমোর্ট কনট্রোলের মাধ্যমে পরপর টেনে নিয়ে গিয়ে টাওয়ারে আঘাত করায়।'

বলতে বলতে মামার দুচোখ ভয়ে বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছিল। আমারও অবস্থা হয়েছিল সামনে ভূত দেখার মত।

বলেই মামা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'মনে রেখ, শুধু জেনে রাখার জন্যেই বললাম।'

সংগে সংগেই আমি বলেছিলাম, 'তোমার কথা তুমি সত্য প্রমাণ করবে কি করে মামা?'

'আমি সত্য প্রমাণ করতে চাই না। সত্য প্রমাণ করার প্রয়োজনও নেই।' বলেছিলেন মামা।

আমি নাছোড়বান্দার মত বলেছিলাম, 'যদি কেউ সত্য প্রমাণ করতে চায়?'

'পারবে না। সে টাওয়ারের মত ধ্বংস হয়ে যাবে। ষড়যন্ত্রের যোগ্যতায় তারা আমেরিকার দেশপ্রেমিকদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী।' কথা শেষ করেই মামা চলে গিয়েছিলেন। কোন কথা তাঁকে আর বলানো যায়নি।'

দীর্ঘ এই বিবরণ শেষ করার পর বলল ডা. আয়েশা আহমদ কামাল সুলাইমানকে লক্ষ্য করে, 'আমার মনে হয় মামা যা দেখেছেন তা এক সাংঘাতিক প্রমাণ হতে পারে টাওয়ার ধ্বংসের অপরাধী নির্ধারণে।'

কামাল সুলাইমান গোগ্রাসে গিলছিল ডা. আয়েশা আহমদের কথা। আনন্দ ও বিস্ময়ের ঢেউ তার চোখে-মুখে।

ডা. আয়েশা আহমদ থামতেই কামাল সুলাইমান বলল, 'বোন, আহমদ মুসা ভাই এটুকু সংগ্রহ করেছেন যে, 'সিভিল প্লেন টুইনটাওয়ারে চালনা করার জন্যে 'গ্লোবাল হক' ব্যবহার করা হয়। তিনি এটা প্রমাণের জন্য 'গ্লোবাল হক'-এর 'উড্ডয়েরন লগ' খুঁজছেন। কিন্তু আপনার মামার কথায় মনে হয় সূর্যের ন্যায় দেখা অর্থে তিনি 'গ্লোবাল হক'-এর গতিপথ এবং উড্ডয়নের ফটোগ্রাফের কথা বলেছেন। আমার মতে এটা হবে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ও অকাট্য এক প্রমাণ। কিন্তু এটা পাওয়া যাবে কি করে? আপনার মামা কোথায় থাকেন?'

'তিনি নিউইয়র্কের উপকণ্ঠে এক কাউন্ট্রিতে নিরিবিলি বাস করেন। আপনি দেখা করতে চান তার সাথে?' বলল ডা. আয়েশা আহমদ।

'না, এখন নয়। আহমদ মুসা ভাইকে বলতে হবে। তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন।' কামাল সুলাইমান বলল।

খুশি হলো ডা. আয়েশা আহমদ। বলল, ‘মামা আহমদ মুসার একজন ভক্ত। খুব ভালো হয় তিনি যদি দেখা করেন। মামা তার কাছে না করতে পারবেন না।’

ডা. আয়েশার কথা শেষ হতেই উঠে দাঁড়াল আহমদ ইব্রাহিম। বলল, ‘থ্যাকস গড। সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য পাওয়া গেল। আল্লাহ সাহায্য করুন একে যাতে কাজে লাগানো যায়।’

স্বগত কণ্ঠে এ কথাগুলো বলে ডা. আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘লাঞ্চের সময় কিন্তু পার হয়ে যাচ্ছে। তুমি ওদিকে লাঞ্চের ব্যবস্থা করো। আমি ভাই সাহেবকে নিয়ে আসছি।’

‘আমার কিন্তু এখনই ফেরা দরকার। অনেক কাজ পড়ে আছে।’ কামাল সুলাইমান বলল।

‘আপনাকে আটকে রাখা যাবে না ভাই সাহেব। চলুন, খেয়ে আসি।’ বলল আহমদ ইব্রাহিম।

কামাল সুলাইমান উঠল।

দুজনে এগুলো ডাইনিং-এর দিকে।

চারসিটের একটা হেলিকপ্টার দ্রুত ছুটে চলেছে ‘মাউন্ট মার্সি’র দিকে। সামনে একটাই সিট, ড্রাইভারের।

পেছনে সিট তিনটা। মাঝখানে সিটে বসেছে আজর ওয়াইজম্যান। তার ডান পাশে নিউইয়র্ক ষ্টেট পুলিশের প্রধান মি. ওয়াটসন। আর আজর ওয়াইজম্যানের বাম পাশে বসেছে ইলিয়া ওবেরয়।

ইলিয়া ওবেরয় বর্তমানে হাজতে বন্দী জেনারেল শ্যারনের পক্ষে কাজ করছে। সে আন্তর্জাতিক ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থা ইরগুন জাই লিউমি এবং ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের দুয়েরই একজন শীর্ষ অফিসার।

কথা বলছিল আজর ওয়াইজম্যান নিউইয়র্কের পুলিশ প্রধান ওয়াটসনের সাথে।

আজর ওয়াইজম্যান বক্তব্য শেষ করল এই কথা বলে যে, 'এত বড় ঘটনা, মাউন্ট মার্সির পুলিশ হেড অফিসের অনুমতি নেবে না?'

'এ ধরনের সন্দেহ নিরসনের কাজ পুলিশ উপরে না জানিয়েও করতে পারে। তবে পরে অবশ্যই জানাতে হয়, সেটা তারা জানিয়েছে?' বলল ওয়াটসন।

'এটা কোন সাধারণ সন্দেহের বিষয় নয়, গণকবরের ব্যাপার।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

হাসল ওয়াটসন। বলল, 'কিন্তু গণকবর প্রমাণিত হয়েছে খননের পর। আগে ছিল নিছক একটা সন্দেহ।'

পুলিশ প্রধান থেমেই আবার বলে উঠল, 'কিন্তু আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন মি. ওয়াইজম্যান।

'অস্থির হওয়ার কারণ হলো আমি সন্দেহ করছি এর সাথে আহমদ মুসা জড়িত আছে। এটা তার কোন এক ষড়যন্ত্র এবং সেটা আমাদের বিরুদ্ধে।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'আহমদ মুসা এটা করেছে এর কোন প্রমাণ আমরা পাইনি। ওখানকার থানা জানিয়েছে প্রখ্যাত রেডইন্ডিয়ান প্রতœতাত্বিক বিশেষজ্ঞ প্রফেসর আরাপাহো প্রতœতাত্বিক খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে এই গণকবর আবিষ্কৃত হয়েছে।'

'এই প্রফেসর আরাপাহোর সাথে আহমদ মুসার পরিচয় আছে, সম্পর্ক আছে।' দ্রুত কণ্ঠে জবাব দিল আজর ওয়াইজম্যান।

'আহমদ মুসার সাথে ঐ ধরনের পরিচয় ও সম্পর্ক আমাদের পুলিশ, এফ.বি.আই. এবং সরকারের অনেকেরই আছে। তিনি তো আমেরিকার অনেক উপকার করেছেন।' বলল পুলিশ প্রধান মি. ওয়াটসন।

আজর ওয়াইজম্যানের মুখে অসন্তুষ্টির ছায়া নামল। বলল, 'দুঃখিত, আমি বুঝাতে পারছি না যে আহমদ মুসা গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালার মত বিপজ্জনক শয়তান। জানেন, ড. হাইম হাইকেলকে সেই বন্দী করে রেখেছে?'

'আপনার এ তথ্য ঠিক নয় মি. আজর ওয়াইজম্যান। ড. হাইম হাইকেল এখন পারিবারিক তত্ত্বাবধানে এক জায়গায় লুকিয়ে আছেন এবং এফ.বি.আই সেটা জানে। তার কিডন্যাপ হওয়ার ব্যাপারটা সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত তার লুকিয়ে থাকাকে তার নিরাপত্তার জন্যে ঠিক মনে করা হচ্ছে।'

আজর ওয়াইজম্যানের চোখে-মুখে অন্ধকার নেমে এল। চুপ করে থাকল। কোন কথা যেন তার মুখে জোগাল না।

কথা বলে উঠল ইলিরা ওবেরয়। বলল পুলিশ প্রধান ওয়াটসনকে লক্ষ্য করে, 'স্যার আমরা মনে হয় এসে গেছি। কোথায় আমরা ল্যান্ড করব, কোথায় আমরা প্রথমে যাব সেটা বোধ হয় ঠিক করা হয়নি। পাইলটকেও নির্দেশ দেয়া দরকার।'

'ধন্যবাদ মি. ওবেরয়। আমরা থানায় নামব। আমি থানাকে জানিয়ে দিয়েছি।' বলে নিচে গ্রাউন্ডের দিকে তাকাল ওয়াটসন। কিছু নির্দেশ দিল পাইলটকে। তারপর ফিরে তাকাল আজর ওয়াইজম্যানের দিকে। বলল, 'আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না মি. ওয়াইজম্যান। ফেডারেল পুলিশের সাবেক প্রধান শ্যারন আলেকজান্ডার আপনার ব্যাপারে আমাকে বলেছেন। যতটা পারা যায়, সহযোগিতা করার জন্যেই আমি আসছি।'

'ধন্যবাদ স্যার।' বলল আজর ওয়াইজম্যান মুখে হাসি টানার চেষ্টা করে।

ল্যান্ড করল হেলিকপ্টার থানার সামনে একটা সুন্দর সবুজ চত্বরে।

থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারসহ পুলিশরা দাঁড়িয়ে আছে তাদের বসকে স্বাগত জানানোর জন্যে।

পরিচয় পর্ব শেষ করে তারা এগিয়ে চলল থানার কনফারেন্স রুমের দিকে।

পুলিশ প্রধান ওয়াটসন আজর ওয়াইজম্যান ও ইলিরা ওবেরয়ের পরিচয় দিয়েছেন দুজন সমাজসেবী ও তাঁর মেহমান বলে।

তারা গিয়ে বসল কনফারেন্স রুমে।

চায়ে চুমুক দিয়ে সামনে বসা থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে বলল, 'মি. ক্যানিং আপনাদের সেই ১৪টি কংকাল কোথায়?'

'স্যার ওগুলো রেডইন্ডিয়ানদের কমিউনিটি অফিসের গোডাউনে রাখা হয়েছে।' বলল থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ক্যানিং।

'তোমার এখানে নয় কেন?' বলল পুলিশ প্রধান ওয়াটসন। তার কণ্ঠে অসন্তুষ্টির সুর।

'স্যার কংকালগুলো রেডইন্ডিয়ান রিজার্ভ এরিয়ার মধ্যে পাওয়া গেছে, অতএব তারা দাবি করেছে কংকালগুলো তাদের হেফাজতে থাকবে। কংকালগুলো যদি রেডইন্ডিয়ানদের না হয় এবং কংকালগুলো যদি কোন অপরাধমূলক ঘটনার অংশ হয় তাহলে তারা পুলিশকে ফেরত দেবে?' বলল পুলিশ অফিসার ক্যানিং।

'কিন্তু কংকালগুলো রেডইন্ডিয়ান রিজার্ভ এরিয়ার মধ্যে পাওয়া গেছে, অতএব তারা দাবি করেছে কংকালগুলো তাদের হেফাজতে থাকবে। কংকালগুলো যদি রেডইন্ডিয়ানদের না হয় এবং কংকালগুলো যদি কোন অপরাধমূলক ঘটনার অংশ হয় তাহলে তারা পুলিশকে ফেরত দেবে?' বলল পুলিশ অফিসার ক্যানিং।

'কিন্তু কংকালগুলো যদি ইতিমধ্যে পাল্টে ফেলা হয় কোনো উদ্দেশ্যে?' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'না স্যার, সে সুযোগ রাখা হয়নি। রেডইন্ডিয়ানরা নিজেরাও কংকালগুলো একক দায়িত্বে রাখতে রাজি হয়নি। ছোট ছোট ঘুলঘুলি বিশিষ্ট এক দরজা ওয়ালা যে কক্ষে কংকালগুলো রাখা হয়েছে, তার দরজায় তিনটি তালা লাগিয়ে তিনটি সিল-গালা করা হয়েছে। একটা চাবি রেডইন্ডিয়ানদের একটা পুলিশের এবং অন্যটা ফেডারেল কমিশনার অফিসের হাতে দেয়া হয়েছে।' বলল পুলিশ অফিসার ক্যানিং।

হতাশা ও উদ্বেগ নেমে এল আজর ওয়াইজম্যান ও ইলিয়া ওবেরয়ের চোখে-মুখে। গণকবর খননোত্তর ঘটনাকে ষড়যন্ত্র প্রমাণ করার জন্যে কংকাল

সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করা দরকার। কিন্তু যেভাবে রাখা হয়েছে তাতে সন্দেহ সৃষ্টির কোন সুযোগ রাখা হয়নি। নিশ্চয় এটা আহমদ মুসারই বুদ্ধি।

'ধন্যবাদ ক্যানিং, তোমরা বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। এখন বলতো অফিসার, ওটা কি সত্যিই গণকবর ছিল?' জিজ্ঞাসা ওয়াটসনের।

'জি স্যার। কংকালগুলো স্তুপ আকারে পাওয়া গেছে।'

'কতদিনের পুরানো হবে বলে তোমরা মনে করছ?'

'প্রতœতত্ত্ববিদরাসহ আমরা মনে করেছি বিশ পঁচিশ বছরের পুরনো হবে।'

'গণকবর থেকে কংকাল ছাড়া আরও কিছু কি পাওয়া গেছে?'

'ঘড়ি, আংটি, চশমা, বোতাম, কয়েন ইত্যাদি কিছু জিনিস পাওয়া গেছে।'

'সেগুলো কোথায়?'

'সেগুলোর ফটোসহ একটা তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তালিকায় তিন পক্ষই সই-সীল দিয়েছে। ওগুলোও কংকালের সাথে রাখা হয়েছে। এইভাবে ফটোসহ কংকালেরও তালিকা তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেকটি তালিকা ফটোসহ চার কপি করা হয়েছে। আমরা তিনপক্ষ তিনটি তালিকা নিয়েছি। আর চতুর্থ তালিকাটি নিয়েছেন প্রফেসর আরাপাহো।'

পুলিশ অফিসার ক্যানিং-এর শেষ হতেই আজর ওয়াইজম্যান দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠল, 'প্রফেসর আরাপাহো নিয়েছেন কেন? তিনি কি আরো কিছু নিয়েছেন? তিনি ও তার সাথীরা কোথায়?'

পুলিশ অফিসার ক্যানিং তাকাল আজর ওয়াইজম্যানের দিকে। আজর ওয়াইজম্যানের রূঢ় ও কৈফিয়ত চাওয়ার মত কথা তার ভালো লাগেনি। তার চোখে-মুখে একটা বিরক্তির ভাব। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল সে ধীর কণ্ঠে, 'হ্যাঁ, প্রফেসর আরাপাহো তার প্রতœতাত্ত্বিক ও অন্যান্য পরীক্ষঅর জন্যে প্রত্যেকটি কংকাল থেকে চারটি করে দাঁত, পাঁচ গ্রামের দুপ্যাকেট করে দেহাবশেষ এবং অন্যান্য জিনিসের ফরেনসিক ফটোগ্রাফ নিয়েছেন।'

‘তিনি এখন কোথায়?’ দ্রুত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল আজর ওয়াইজম্যান। তার চোখে-মুখে অস্থিরতার ভাব।

‘তিনি, একজন রেডইন্ডিয়ান ছাত্র এবং তার টিমের কয়েকজন চলে গেছেন জিনিসগুলো নিয়ে পরীক্ষার জন্যে।’ বলল পুলিশ অফিসার।

‘কোথায়?’ সংগে সংগেই প্রশ্ন করল আজর ওয়াইজম্যান। তার গলা কাঁপছে স্পষ্ট।

‘এটা আমরা জানি না। তিনিও বলেননি। আমরা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন দেখিনি।’

‘কেন?’ প্রশ্ন ওয়াইজম্যানের।

‘কারণ, তাঁকে ফলো করার সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করিনি।’ বলল পুলিশ অফিসার শক্ত কণ্ঠে।

পুলিশ প্রধান ওয়াটসন আজর ওয়াইজম্যানের কথার বাড়াবাড়ি এবং পুলিশ অফিসার ক্যানিং-এর বিরক্তি লক্ষ্য করল। তাদের দুজনের কথা বন্ধ করার জন্যে বলে উঠল, ‘মি. ক্যানিং, যখন প্রমাণিত হলো ওটা গণকবর, তখন সরকার ও পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নেয়া পর্যন্ত কোন কিছু হস্তান্তর না করলেই ভালো হতো।’

‘স্যার গোটা বিষয় রেডইন্ডিয়ান রিজার্ভ এলাকার ভেতরের। প্রফেসর আরাপাহো তার প্রতœতাত্বিক গবেষণার জন্যে রেডইন্ডিয়ান প্রশাসনের কাছ থেকে খননের অনুমতি নিয়েছেন। ফেডারেল কমিশনার অফিসও তাদের সাথে একমত এটা জানিয়ে দিয়েছে। আমাদের ডেকেছে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকার জন্যে। গোটা উদ্যোগ প্রফেসর আরাপাহোর। তার পরীক্ষা ও গবেষণার জন্যে কিছু করে স্যাম্পল নিয়ে যাবেন, এটা তাঁর অধিকার। এতে বাধা দেয়া যাবে কেমন করে, বিশেষ করে রেডইন্ডিয়ান প্রশাসন যদি বাধা না দেন। তারা বাধা দিলে, আমাদের সাহায্য চাইলে আমরা অবশ্যই প্রফেসর আরাপাহোকে আটকাতাম। তাছাড়া স্যার, অতীতেও এই রেডইন্ডিয়ান এলাকায় খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে। যারা এটা করেছেন, তারা প্রাপ্ত জিনিসপত্র নিয়ে গেছেন, পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেছেন। কোন সময়ই এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। কোথাও এ প্রশ্ন তোলা হয়নি স্যার।’

পুলিশ অফিসার থামতেই আজর ওয়াইজম্যান বলল, ‘ঠিক আছে। ধন্যবাদ। কিন্তু একটা কথা দয়া করে বলুন, প্রফেসর আরাপাহো পরীক্ষার জন্যে যা নিয়ে গেছেন, সে গুলোই যে তিনি পরীক্ষা করবেন, অন্য কিছু পরীক্ষা করে তাকে এই গণকবর খননের ফল বলে চালিয়ে দেবেন না, তার নিশ্চয়তা বিধান কিভাবে হবে?‘ আজর ওয়াইজম্যানের মুখটা কিছুটা উজ্জ্বল দেখাল।

হাসল পুলিশ অফিসার ক্যানিং। বলল, ‘প্রফেসর আরাপাহো তার কাজে কারও প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ রাখেননি স্যার। তিনি প্রতিটি জিনিসের দুটি করে প্যাকেট করেছেন। যেমন প্রতিটি কংকালের দাঁতের দুটি প্যাকেট এবং প্রতিটি দেহাবশেষের দুটি প্যাকেট। প্রতিটি জিনিসের দুপ্যাকেটেই রেডইন্ডিয়ান প্রধান, ফেডারেল কমিশনার অফিস ও থানার সই-সীলসহ প্রত্যায়ন নিয়েছেন। প্রতি দুপ্যাকেটের একটিকে তিনি পরীক্ষার কাজে ব্যবহার করবেন এবং অন্য প্যাকেটটি তার কাছে সাক্ষী হয়ে থাকবে।‘

আনন্দের সাথে এই কথাগুলো বলল পুলিশ অফিসার ক্যানিং, কিন্তু এই কথা শুনে আজর ওয়াইজম্যান ও ইলিয়া ওবেরয়ের মুখ হতাশার অন্ধকারে ঢেকে গেল। ভয়ংকর এক ভাবনা এসে তাদের ঘিরে ধরেছে, ফরেনসিক ও অন্যান্য টেষ্টে প্রমাণ হয়ে যাবে যে, গণকবরের এই চৌদ্দজন কারা এবং কোন জাতির। তার ফলে মিথ্যা হয়ে যাবে টাওয়ার ধ্বংসের জন্যে ঐ চৌদ্দ জনের দ্বারা বিমান হাইজ্যাকের সাজানো কাহিনী। নিশ্চয় ড. হাইম হাইকেল ফাঁস করে দিয়েছে এই গোপন গণকবরের কথা। এখন কোথায় পাওয়া যাবে প্রফেসর আরাপাহোদের। সে তো আসল নয়। তার পেছনে আছে আহমদ মুসা। আহমদ মুসাকে এ পরীক্ষা ও পরীক্ষার ফল লাভে বিরত রাখতে হলে তাকে পাওয়া দরকার। আর তাকে পেতে হলে প্রফেসর আরাপাহোকে পাওয়া দরকার।’

এসব আকাশ-পাতাল চিন্তায় বুঁদ হয়েছিল আজর ওয়াইজম্যান।

ওয়াটসন তাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘কি ভাবছেন মি. ওয়াইজম্যান?’

‘ভাবছি প্রফেসর আরাপাহোদের কথা। তিনি আমাদের শত্রুর পক্ষ হয়ে কাজ করছেন। ভেবে পাচ্ছি না, এই স্যাম্পলগুলোকে তিনি গবেষণা-পরীক্ষার নামে কোন কাজে লাগাবেন। তাঁকে আমাদের পাওয়া দরকার। সেটাই ভাবছি।’

'ভেবে কি ঠিক করলেন? এদিকে তো যা ঘটেছে, তার মধ্যে পুলিশের কোন ভুল-ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি না।' বলল ওয়াটসন।

'দোষ আমাদের ভাগ্যের। তা না হলে প্রফেসর আরাপাহোর মত লোক শত্রুর ক্রীড়নক হয়ে এখানে আসেন!' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

পুলিশ অফিসার কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু পুলিশ প্রধান ওয়াটসন তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'এখন আর কোন কথা নয়। চল একটু ঘুরে ফিরে দেখি। গণকবরটিও একবার দেখা যেতে পারে।'

'কিন্তু এরচেয়েও জরুরি হলো প্রফেসর আরাপাহোকে খুঁজে বের করা। পরীক্ষা-নীরিক্ষা অবস্থার মধ্যেই তাকে যে কোন মূল্যে খুঁজে পেতে হবে।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'তাহলে?' ওয়াটসন বলল।

'চলুন তাহলে। একটু ঘুরে-ফিরে এসে আমরা আবার যাত্রা করব।'

'ঠিক আছে।' বলে ওয়াটসন উঠে দাঁড়াল। সবাই উঠল।

নিউইয়র্ক হাইওয়ে ধরে একটা গাড়ি এগিয়ে চলেছে ওয়াশিংটনের দিকে। গাড়ির আরোহী দুজন। ড্রাইভিং সিটে আহমদ মুসা এবং তার পাশে কামাল সুলাইমান।

'আমরা অর্ধেক পথ এগিয়েছি ভাইয়া। গণকবরের ১৪টি কংকালের সবরকম টেষ্ট সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে, ঐ ১৪ জনই আরব বংশোদ্ভুত এবং তাদেরকে টুইনটাওয়ার ধ্বংসের দিনগত রাতে একই সময়ে বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। এর অর্থ আরবদের কর্তৃক বিমান হাইজ্যাক করে টুইনটাওয়ারে আঘাত করার প্রচারিত কাহিনী মিথ্যা এবং সাজানো। অন্যদিকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া টুইনটাওয়ারের ডাষ্টের তিনটি পরীক্ষাই প্রমাণ করেছে বিশেষ ধরনের ডেমোলিশন বিস্ফোরক দিয়ে টাওয়ার ধ্বংস করা হয়েছে, বিমানের আঘাতে টাওয়ার ধ্বংস হয়নি।' বলল কামাল সুলাইমান।

'আমরা অর্ধেক পথ এগিয়েছি, এ কথা বলছ কেন? টুইনটাওয়ার ধ্বংসের জন্যে যাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণের ডকুমেন্ট আমাদের হাতে। অন্যদিকে টাওয়ার ধ্বংসের যে কারণ দেখানো হয়েছে তা মিথ্যা প্রমাণেরও ডকুমেন্ট আমাদের হাতে এসেছে। সুতরাং বলতে পারো পুরো পথই আমরা অতিক্রম করেছি। এখন আমরা উদ্ধার করতে যাচ্ছি সিভিল প্লেন কিভাবে টাওয়ারে আঘাত হানল, সেই রহস্য।' বলল আহমদ মুসা।

'আমরা ডা. আয়েশা আহমদের মামার কাছ থেকে 'গ্লোবাল হক'-এর উড্ডয়ন রুট এর লগ ও ফটোগ্রাফ যোগাড়ের চেষ্টা করতে পারি। আমার বিশ্বাস তিনি আমাদের সাহায্য করবেন।' কামাল সুলাইমান বলল।

'আমরা 'মিউজিয়াম অব মিলিটারী হিষ্ট্রি'র ওখানে কাজ সেরে নিউইয়র্কে ফিরেই ওখানে যাব ইনশাআল্লাহ।' আহমদ মুসা বলল।

'গ্লোবাল হক'-এর মিসিং বলে কথিত লগ সম্পর্কে নতুন কিছু জানা গেছে ভাইয়া?'

'আমি একটা টেলিফোনের অপেক্ষা করছি কামাল সুলাইমান।'

'কে টেলিফোন করবেন।' জিজ্ঞাসা কামাল সুলাইমানের।

'এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসন টেলিফোন করবেন। তিনি গত রাতে আমাকে টেলিফোন করে বলেছিলেন যে, মিলিটারী মিউজিয়ামের লগ সম্পর্কে স্পেসেফিক কিছু জানতে পারলে আমি সেখানে পৌছার আগেই তিনি আমাকে জানাবেন।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই তার মোবাইলটা বেজে উঠল।

মোবাইলটি তুলে সামনে ধরল আহমদ মুসা।

'নিশ্চয় মি. আব্রাহাম জনসনের টেলিফোন।' বলল কামাল সুলাইমান।

'না বুমেদীন বিল্লাহর টেলিফোন।' বলে আহমদ মুসা বুমেদীন বিল্লাহর কলের উত্তর দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমি জোসেফ জন। তুমি কখন ফিরলে?'

'এই মাত্র। পৌছেই আপনাকে টেলিফোন করেছি।'

'শোন, আমি যা খবর পেয়েছি, তাতে প্রফেসরকে কিছুদিন বাইরে থাকতে হবে, বাড়িতে তাঁর যাওয়া হবে না। আর তুমি তোমার আসল কাজ শুরু করে দাও। মূল রিপোর্টের আগে প্রারম্ভিক কয়েকটা রিপোর্ট করতে হবে। যেমন গণকবর আবিষ্কারের খবর, ধ্বংস টাওয়ারের ডাষ্ট পরীক্ষার উদ্যোগের খবর এবং এসবকে সামনে রেখে বলবে টাওয়ার ধ্বংস বিষয়ে সত্যানুসন্ধানের সামগ্রিক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই রিপোর্টের পরদিনই মূল রিপোর্ট পত্রিকায় যেতে হবে। এরপর 'লা-মন্ডে' পত্রিকায় যা উঠবে না, সেসব বিষয়েও ফলোআপ পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তোমাকে পাঠাতে হবে FWTV এবং WNA সংবাদ মাধ্যমে। মূল তথ্য তো পাওয়া গেছে। তার ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরি কর। পরে একটা বিষয় সংযোজন করলেই চলবে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমি কাজ শুরু করে দিয়েছি। তবে আপনি যে প্রারম্ভিক রিপোর্টের কথা বলেছেন তা আমার মাথায় ছিল না। আপনি ঠিকই বলেছেন। বিনা মেঘে বজ্রপাতের চেয়ে এটাই স্বাভাবিক হবে।' বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

‘ধন্যবাদ বিল্লাহ। রাখলাম টেলিফোন। সব কথা মনে রেখ। বাই।’ বলে আহমদ মুসা কল অফ করে দিল।

কল অফ করে মোবাইল ড্যাশ বোর্ডে রাখতেই মোবাইল বেজে উঠল আবার।

‘এবার নিশ্চয় জর্জ আব্রাহাম জনসন হবেন ভাইয়া।’ বলল কামাল সুলাইমান।

মোবাইল তুলে নিল আহমদ মুসা।

ঠিক জর্জ আব্রাহাম জনসনই টেলিফোন করেছে।

‘গুড মর্নিং জনাব। কেমন আছেন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘গুড মর্নিং। ভাল আছি। তুমি নিশ্চয় পথে ড্রাইভ করছ?’

‘জি হ্যাঁ।’

‘তাহলে তাড়াতাড়ি বলছি শোন। লগটা মিসিং বলে যে মন্তব্য ডকুমেন্ট আছে তা ঠিক নয়। একটা বিশেষ পক্ষ অফিসকে দিয়ে এটা করিয়েছে। লগটা ঠিক জায়গায় ঠিকই আছে। বলছি সেকশন ও ডেস্ক নাম্বার। মুখস্থ করে নাও। MM-111/197, আরও শোন, ওখানে কিন্তু কড়া সিকিউরিটি। তাদের উপর ‘দেখা মাত্র গুলী’র স্থায়ী নির্দেশ দেয়া আছে। তার উপর তোমরা রিভলবার নিতে পারছো না। সুতরাং সাবধান। উইশ ইউ গুডলাক। বাই।’ বলে এপার থেকে কিছু শোনার অপেক্ষা না করে টেলিফোন রেখে দিল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

‘আল্লাহ লোকটির উপর রহম করুন। তাঁর সরকারের কোন লাভ নেই, বরং একদিক দিয়ে ক্ষতি আছে, তা সত্ত্বেও অমূল্য সাহায্য তিনি করছেন।’ স্বগত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘জর্জ আব্রাহাম জনসন সত্যিই আপনাকে ছেলের মত ভালোবাসেন ভাইয়া।’ কামাল সুলাইমান বলল।

‘তোমার কথা ঠিক কামাল সুলাইমান। তিনি আমাকে তার দ্বিতীয় ছেলে মনে করেন। কিন্তু তিনি ছেলেকেও এ ধরনের সাহায্য করবেন না। আসলে কামাল সুলাইমান, তিনি আমাদের উদ্দেশ্য-আদর্শকেও ভালোবাসেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ভাইয়া আরেকটা বিষয়, বর্তমান মার্কিন সরকার সম্ভবত চান টুইনটাওয়ার ধ্বংসের সত্য ঘটনা দিনের আলোতে আসুক। যে গ্রুপটা তখন মার্কিন প্রশাসন ও সরকারের একটা অংশকে কাজে লাগিয়ে ভয়াবহ কাজটা করেছিল, বিশ্বকে ও আমেরিকাকে বদলে দিতে চেয়েছিল তাদের মত করে, সেই গ্রুপটা ও তাদের হীন উদ্দেশ্য ধরা পড়ে যাক বিশ্ববাসীর চোখে, এটা আমেরিকার বর্তমান সরকার আন্তরিক ভাবেই কামনা করেন। তবে এ কাজটা অন্যের হাতে হোক, এটা তারা চাচ্ছেন।’ কামাল সুলাইমান বলল।

‘হ্যাঁ কামাল সুলাইমান, তোমার কথা ঠিক, আজকের আমেরিকা বিশ বছর আগের সেই আমেরিকা নয়। জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিংকন, টমাস জেফারসনের আমেরিকা আবার ফিরে এসেছে। এই আমেরিকা নিজের যেমন শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখতে চায়, তেমনি চায় অন্যেরও শান্তি, স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত থাক। এই আমেরিকা বিশ্বের জাতি ও দেশসমূহের মাথায় বসতে চাচ্ছে না, চাচ্ছে তাদের হৃদয়ে স্থান পেতে। সুতরাং আমেরিকা অবশ্যই চাইবে অতীতের একটি কালো দাগ তার গা থেকে মুছে ফেলতে।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই কামাল সুলাইমান চিৎকার করে উঠল, ‘ভাইয়া ডান দিকে এক্সিট নিন। এ দিক দিয়ে ‘ইন্ডিপেনডেন্স’ এভেনিউতে না ঢুকলে অনেক ঘুরতে হবে।’

‘ধন্যবাদ কামাল সুলাইমান। কথায় মনোযোগ দিতে গিয়ে রাস্তার দিকে মনোযোগ ছিল না।’ এক্সিট নেবার জন্যে গাড়িটাকে সাইড লেনে নিতে নিতে বলল আহমদ মুসা।

ইন্ডিপেনডেন্স এভেনিউ ও কনষ্টিটিউশন এভেনিউ রাজধানী ওয়াশিংটনের প্রাণকেন্দ্রে। হোয়াইট হাউজ, পার্লামেন্ট ভবনসহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান এই এলাকায়।

ইন্ডিপেনডেন্ট এভেনিউ-এর দক্ষিণ প্রান্তে এভেনিউ থেকে একটু ভেতরে এক বিরাট এলাকা জুড়ে ‘মিউজিয়াম অব মিলিটারী হিষ্ট্রি’।

মিউজিয়ামের চারদিক ঘিরে বড় বড় গাছ স্থানটাকে বাগানের রূপ দিয়েছে। মিউজিয়ামের দুপাশে পার্কিং প্লেস।

উত্তর পাশের পার্কিং প্লেসটা ছায়া ঘেরা ও অপেক্ষাকৃত নির্জন। তাছাড়া মিউজিয়ামের প্রাইভেট ও ইমারজেন্সি দরজা আছে, সেটাও এদিকেই।

আহমদ মুসা এই কারপার্কিং-এ তার গাড়ি পার্ক করলো।

আহমদ মুসা পকেট থেকে মিউজিয়ামের ইন্টারন্যাল মানচিত্রটা বের করে চোখের সামনে তুলে ধরল। চারতলা বিল্ডিং। প্রতিটি ফ্লোরের রুম ও প্যাসেজের এ্যারেঞ্জমেন্ট প্রায় এই রকমের। পূর্ব দিকে মিউজিয়ামের এনট্রান্স। মিউজিয়ামে ঢোকার পর একটা বড় লাউঞ্জ। লাউঞ্জের দুপ্রান্ত থেকে দুটি প্রশস্ত সিঁড়ি উঠে গেছে চারতলা পর্যন্ত। একটা সিঁড়ি উপরে ওঠার জন্যে, অন্যটা নিচে নেমে আসার জন্যে।

মিলিটারী মিউজিয়ামটি সার্বক্ষণিকভাবে সর্বসাধারণের জন্যে খোলা নয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুমতি প্রাপ্তরাই শুধু মিউজিয়ামে ঢুকতে পারে।

মিউজিয়ামের সকল বিভাগ সকলের জন্যে অবারিত নয়। কিছু কিছু বিভাগ আছে যা দর্শনার্থীদের জন্যে উন্মুক্ত নয়। এ ধরনের সেকশনগুলো চারতলায়। অর্থাৎ চারতলায় কোন দর্শনার্থী যায় না। জর্জ আব্রাহাম জনসন জানিয়েছেন, MM-111/117 সেকশনটা নিষিদ্ধের তালিকায় নয়।

সুতরাং তাদের গন্তব্য 'সেফ এয়ার সার্ভিস'-এ গিয়ে রেকর্ড লগ দেখায় কোন বাধা নেই। কিন্তু সমস্যা চারটি, যে ডকুমেন্টকে মিষ্ট্রিয়াস মিসিং তালিকায় তোলা হয়েছে তা, এক. দেখায় কোন বাধা আসবে কিনা, দুই. ক্যামেরা নিয়ে যেতে দিবে কিনা, তিন. ছবি তোলার সুযোগ পাওয়া যাবে কিনা, এবং চার. সেকশনটি কোন তলায় তা জানাতে ভুলে গেছেন জর্জ আব্রাহাম।

আহমদ মুসা মিউজিয়ামের মানচিত্র থেকে মুখ তুলল। বলল কামাল সুলাইমানকে সব সমস্যার কথা।

কামাল সুলাইমান বলল, 'সেকশন চেনার সমস্যাটা ভাইয়া আমরা 'ইনফরমেশন' থেকে জেনে নেব। আমার মনে হয় প্রথম সমস্যাটা কোন সমস্যা হবে না। কারণ সেকশনটা দর্শনার্থীদের জন্যে নিষিদ্ধ নয় বলেই একে চারতলায়

নেয়া হয়নি। মিসিং তথ্যটা দর্শনার্থীদের জন্যে এজন্যেই রাখা হয়েছে যাতে কোন দর্শনার্থী সেকশনটাতেই না যায়। গেলে বাধা দেয়ার কিছু নেই। সমস্যা দাঁড়াচ্ছে ক্যামেরা নেয়া ও ছবি তোলা নিয়ে।'

থামল কামাল সুলাইমান সমস্যা দুটির কোন সমাধান না দিয়েই। ভাবছিল সে।

'কলম ক্যামেরাতো! একটা কাজ আমরা করতে পারি। আমরা ক্যামেরা থেকে ব্যাটারী এবং ফটোডিস্কটা আলাদা করতে পারি। তাতে ওদের স্ক্যানিং এড়ানো যাবে।' বলল আহমদ মুসা।

গাড়ি থেকে নামার জন্যে তৈরি হলো আহমদ মুসা।

বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে।

মিউজিয়ামের লাউঞ্জে প্রবেশ করল আহমদ মুসারা। সোজা গিয়ে দাঁড়াল রিসিপশনের সামনে।

রিসিপশন ডেস্কে দুজন। একজন মেয়ে, একজন ছেলে।

আহমদ মুসাকে ডেস্কের সামনে দাঁড়াতে দেখে মেয়েটি তার দিকে এগিয়ে এল।

'গুড মর্ণিং ম্যাডাম। আমি জোসেফ জন আর আমার সাথে ইনি কুনার্ড সুলিভান। এই দুনামে রিসিপশনে দুটি প্রবেশ পত্র থাকার কথা।'

'প্লিজ স্যার.........' বলে মেয়েটি রেজিষ্টারটি টেনে নিল। রেজিষ্টারে নজর বুলিয়েই মেয়েটি বলে উঠল, 'ইয়েস স্যার, আপনাদের পাশ আছে। মেয়েটি দুটি পাশ আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'স্যার রেজিষ্ট্রারে দয়া করে সই করুন।'

আহমদ মুসারা প্রবেশপত্র নিয়ে রেজিষ্টারে সই করল।

সই করে আহমদ মুসা বলল, 'ম্যাডাম MM-111/117 সেকশনটা কোন তলায় কোনদিকে হবে?'

মেয়েটির পাশে দাঁড়ানো অন্য রিসিপশনিষ্ট আগ্রহ ভরে একধাপ এগিয়ে এল এবং বলল মেয়েটি কিছু বলার আগেই, 'স্যার ও সেকশনটা তিন তলার ১৯৭ নাম্বার কক্ষে।'

রিসিপশনিষ্টের মুখের আকস্মিক এক পরিবর্তন এবং তার অতি উৎসাহ আহমদ মুসার দৃষ্টি এড়াল না। কিন্তু এ নিয়ে চিন্তা করার সময় তার ছিল না। প্রবেশ পত্র হাতে পেয়েছে। এখন তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে।

সিঁড়িতে ওঠার মুখে স্ক্যানিং মেশিন।

স্ক্যানিং পেরল আহমদ মুসারা। স্ক্যানিং-এর সময় ব্যাটারী ও ফটো ডিস্ককে আলাদাভাবে দেখে তারা কোন সন্দেহ করেনি।

স্ক্যানিং আছে বলেই আহমদ মুসারা আজ রিভলবার নিয়ে আসেনি। কামাল সুলাইমানের কাছে একটা ক্লোরোফরম রিভলবার রয়েছে। প্লাষ্টিকের বলে তা স্ক্যানিং-এ ধরা পড়েনি। এটাই তাদের একমাত্র অস্ত্র। জর্জ আব্রাহাম জনসন তাদেরকে কৌশলে কাজ সারতে বলেছে। এখানে বড় কোন খুনোখুনি হোক তা তিনি চান না।

চারতলা এই মিউজিয়ামে লিফট ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তা দর্শকদের জন্যে নয়।

আহমদ মুসা সিঁড়ি ভেঙে সোজা উঠে গেল তিন তলায়।

কক্ষগুলো সুন্দর গুচ্ছাকারে সজ্জিত। এ রকম অনেকগুলো কক্ষ নিয়ে তিন তলা।

আহমদ মুসারা খুঁজতে লাগল একশ' সাতানব্বই নাম্বার কক্ষ।

আহমদ মুসারা আগেই শুনেছিল, মিউজিয়ামে কোন ইউনিফরম পরা পুলিশ নেই। সিকিউরিটি পুলিশরা সাধারণ পোশাকে বিভিন্ন রুম ও করিডোরে ছড়িয়ে আছে। দর্শকদের সাথে মিশে দর্শক হয়ে তারা সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ব্যবস্থাটা আহমদ মুসাদের জন্যে বিপদজনক।

পেয়ে গেল তারা ১৯৭ নাম্বার কক্ষ। কক্ষটি উত্তর দিকের শেষ প্রান্তে। কক্ষের দরজা ওয়ালা সম্মুখ দেয়াল মিউজিয়ামের উত্তরের বহিঃদেয়ালের মুখোমুখি। মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত করিডোর।

আহমদ মুসা রুম খোঁজাখুঁজির এক ফাঁকে কলম ক্যামেরাটিকে সেট করে নিয়েছে।

মাল্টি ডাইমেনশনাল এই মুভি ক্যামেরা অত্যন্ত শক্তিশালী।

যে কোন বড় গ্রন্থ বা রেজিষ্টারের উন্মুক্ত দুপাতার উপর শট নিলে এক সেকেন্ডের শত ভাগের এক ভাগের মধ্যে দুদিকের দুপাতার নিচের দশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নিখুঁত ফটো তুলতে পারে।

আহমদ মুসারা ১৯৭ নাম্বার কক্ষে প্রবেশ করল।

বিশাল কক্ষটিতে তখন পাঁচজন লোক। তাদের মধ্যে চারজন যুবক, একজন তরুণী। তারা বিভিন্ন জিনিস দেখায় ব্যস্ত।

গোটা কক্ষে 'সেফ এয়ার সার্ভিস'-এর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, প্লেনের মডেল, বিভিন্ন দেয়াল চার্ট, রেজিষ্টার ও বইপত্র সুন্দরভাবে সাজানো।

আহমদ মুসা ও কামাল সুলাইমান আলাদাভাবে খুঁজছে লগ রেজিষ্টার।

তাদের পরিকল্পনা হলো, তারা দুজনে এক সঙ্গে থাকবে না। আহমদ মুসা লগ রেজিষ্টার থেকে ফটো নেবে। আর কামাল সুলাইমান চারদিকটা পাহার দেবে তাকে আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্যে।

ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় দরজা থেকে নাক বরাবর সামনে একটা ডেস্কে আহমদ মুসা পেয়ে গেল লগ রেজিষ্টার।

লগ রেজিষ্টারটি খোলা। খোলা পাতার দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বিস্ময়ে হতবাক। লগের যে অংশটি সে চায় সেই পাতাটিই খোলা আকারে জ্বল জ্বল করছে।

এটা কি কাকতালিয় ঘটনা, না শত্রুপক্ষের এটা একটা নোটিশ?

যেটাই হোক এ নিয়ে সময় নষ্ট করা যাবে না। তাকাল আহমদ মুসা কামাল সুলাইমানের দিকে। দেখল, আহমদ মুসার বামে কিছু দূরে একটা যন্ত্র পরীক্ষা করছে দুজন। তাদের অল্প দূরে কামাল সুলাইমান। অবশিষ্ট দুজন কামাল সুলাইমানের কিছু দূরে দরজার কাছাকাছি জায়গায়। আর তরুণীটি ঘরের পশ্চিম প্রান্তে পশ্চিমমূখী হয়ে একটা বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে।

আহমদ মুসার সাথে কামাল সুলাইমানের চোখাচোখি হল।

কামাল সুলাইমান পকেটে হাত দিল। এটা তার প্রস্তুত থাকার সংকেত।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। কলম ক্যামেরাটি হাতেই ছিল। কলম-ক্যামেরাটি সে রেজিষ্টারের নির্দিষ্ট পাতার উপরে ধরে ক্যামেরাটি অন করল। অফও করে দিল সেকেন্ড খানেকের মধ্যেই।

আহমদ মুসা কলমটি পকেটে রাখতে যাবে। এই সময় তার বাম পাশ থেকে একটা শক্ত কণ্ঠ ভেসে এল, 'হাত তুলে দাঁড়াও আহমদ মুসা।'

আহমদ মুসা হাত না তুলেই ফিরল তাদের দিকে। দেখল, যারা একটা যন্ত্র পরীক্ষা করছিল সেই যুবক দুজন ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তাদের দুজনের হাতেই উদ্যত রিভলবার।

আহমদ মুসা ওদের দিকে তাকাতেই ওদের একজন বলল, 'চালাকির চেষ্টা করো না। হাত তোল। গুলী করতে আমাদের বাধ্য করো না।'

তার কথা শেষ হবার আগেই কামাল সুলাইমানের হাত পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছিল। দুপ দুপ করে শব্দ হলো দুবার।

ক্লোরোফরম বুলেট গিয়ে বিস্ফোরিত হলো যুবক দুজনের সামনে।

মুহূর্তেই ওরা জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

ক্লোরোফরম বুলেট ছোড়ার পর কামাল সুলাইমান রিভলবার নামিয়ে এগুচ্ছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা চিৎকার করে উঠল, 'কামাল পেছনে..........।'

দরজার পাশে যে দুজন যুবক ছিল তারা দুজনেই পকেট থেকে রিভলবার বের করে তাক করছে আহমদ মুসা ও কামাল সুলাইমানকে।

তাদের একজন চিৎকার করে উঠেছে, 'তোরা বহু জ্বালিয়েছিল আমাদের। তোদের আজ বাঁচিয়ে রাখব না। কুকুরের মত মারব তোদের।'

কামাল সুলাইমানও তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু আহমদ মুসা ও কামাল সুলাইমান কারও কিছু করার ছিল না। যুবক দুজন এতটা দূরে যে, তাদের উপর পাল্টা আক্রমণের সুযোগ নেই। কামাল সুলাইমানের ক্লোরোফরম রিভলবারও বিদঘুটে পজিশনে।

আহমদ মুসা ও কামাল সুলাইমান দুজনেরই স্থির দৃষ্টি যুবক দুজনের দিকে।

সময়ের এ রকম সন্ধিক্ষণে সাইলেন্সার লাগানো রিভলবারের গুলীর শব্দ হলো পরপর দুবার।

যুবক দুজনের হাত থেকে রিভলবার ছিটকে পড়ে গেল। দুজনেরই দুহাত রক্তাক্ত।

আহমদ মুসারা তাকাল ঘরের পশ্চিম দিকে। দেখল, সেই তরুণীর হাতে রিভলবার।

আহমদ মুসা তার দিকে তাকাতেই মেয়েটি বলল, 'আসুন স্যার আপনারা আমার সাথে।'

বলে তরুণীটি দরজার দিকে হাঁটা দিল।

কামাল সুলাইমান তার ক্লোরোফরম রিভলবার তুলে ফায়ার করল আহত যুবক দুজনের দিকে। বলল, 'ওরা চিৎকার করার আর সুযোগ পাবে না।'

হাঁটতে হাঁটতে মুখ ঘুরিয়ে তরুণীটি কামাল সুলাইমানকে বলল, 'ধন্যবাদ।'

তরুণীটির সাথে আহমদ মুসারা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তরুণীটি হাঁটতে লাগল করিডোর ধরে প্রথমে পশ্চিমে, তারপর উত্তরে।

'আমরা কি বের হবো উত্তরে প্রাইভেট এক্সিট দিয়ে?' বলল আহমদ মুসা তরুণীটিকে লক্ষ্য করে।

'জি স্যার। সামনের গেট দিয়ে অনেক ঝামেলা হতে পারে। ওদের আরো লোক আছে। আপনারা দুজন ঢুকেছেন, এ খবর সব জায়গায় হয়ে গেছে।'

'কিভাবে, আমাদের তো ওরা চিনে না।' বলল কামাল সুলাইমান।

'রিসিপশনে আপনারা সেকশনের কোড নাম্বার বলেছিলেন। এ থেকেই বিষয়টা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। শুধু ঘরের চারজন বোধ হয় জানত না যে, আপনারা দু'জন।'

তারা প্রাইভেট সিঁড়ি দিয়ে উত্তরের প্রাইভেট এক্সিটে নেমে এল।

প্রাইভেট এক্সিটে একজন তরুণী দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসাদেরকে নিয়ে আসা তরুণী তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'এদিক সব ঠিক-ঠাক?'

'জি।'

‘ঠিক আছে তোমার কাজ শেষ। তুমি এখন চলে যাও।’

বলে সে এগুলো দরজার দিকে। দরজায় ডিজিটাল লক। তরুণীটি আনলক করল। দরজা খুলে গেল।

তরুণীসহ আহমদ মুসারা বেরিয়ে এল।

গাড়ির পাশে গিয়ে পৌছল তারা।

মেয়েটি বলল, ‘স্যার আমাকে ওয়াশিংটনের সীমা পর্যন্ত আপনাদের পৌছে দিতে বলেছেন।’

‘ওয়েলকাম।’ আহমদ মুসা বলল।

মেয়েটি পেছন দিকের দুটি দরজা খুলে আহমদ মুসাদের বসিয়ে নিজে গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল।

গাড়ি ষ্টার্ট নিল।

আহমদ মুসা বলল, ‘গাড়িতে বসার প্রোটোকল তো ঠিক হলো না।’

‘আপনারা মেহমান। আর আমি হোষ্টের পক্ষে আপনাদের সার্ভিস দিচ্ছি। প্রোটোকল ঠিক আছে।’ বলল তরুণীটি।

‘হোষ্ট কে?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘অফিসিয়ালি বলা যাবে না। আর আন-অফিসিয়ালি শুনে কি লাভ।’ বলল তরুণীটি।

গাড়িটি নিউইয়র্ক হাইওয়েতে উঠলে তরুণী একটা ইমারজেন্সি পার্কিং-এ গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল। আহমদ মুসা ও কামাল সুলাইমানও নামল।

কামাল সুলাইমান ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে উঠে বসল।

আহমদ মুসা বলল, ‘আপনি কিভাবে ফিরবেন সে জিজ্ঞাসা জানি অবান্তর। আপনি আপনার ‘স্যার’কে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবেন। আর বোনকে কৃতজ্ঞতা জানাব না। কারণ, বোন উত্তরে বলবেন বোন হিসাবে সে দায়িত্ব পালন করেছেন।’

‘আপনি আমাকে বোন বলেছেন? আমি আপনাদের বোন?’ মেয়েটির গলা হঠাৎ ভারী হয়ে গেল। ছলছলিয়ে উঠল তার চোখ। বলল, ‘আমি যে সত্যিই আপনাদের বোন। আমি আয়েশা বেগ মোহাম্মদ।’

'আপনি মুসলিম?' আহমদ মুসা বলল বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে।

'আপনি নয়, 'তুমি' বলুন ভাই। হ্যাঁ আমি মুসলিম। তবে মুসলিম নামে আমি চাকুরিতে ঢুকিনি। অনেক চেষ্টা করেও মুসলিম নাম নিয়ে এ ধরনের চাকুরি পাইনি। শেষে আমি 'আলিশা বার্গম্যান'- এই ইহুদী নাম নিয়েছিলাম। এই নামেই চাকুরি পাই। অবশ্য বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমি আমার মুসলিম নাম ফিরে পেয়েছি। স্যার আমাকে এই সুযোগ করে দিয়েছেন।'

'আলহামদুলিল্লাহ। কত খুশি হয়েছি বলতে পারবো না। তুমি জান কি কাজে তুমি আমাদের সহযোগিতা করলে?' আহমদ মুসা বলল।

'হ্যাঁ। স্যার আমাকে বলেছেন। আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি যে, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ একটি মহৎ কাজের সামান্য অংশে নিজেকে জড়িত করতে পেরেছি। তবে স্যার আমার মনে একটা প্রশ্ন। সেটা হলো, প্রমাণ যোগাড় যথেষ্ট নয়। প্রমাণগুলোকে আমেরিকার মানুষ এবং গোটা দুনিয়া গ্রহণ করতে হবে। এটা কি করে সম্ভব হবে?' বলল আয়েশা বেগ মুহাম্মাদ।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'মিথ্যাকে যেভাবে গ্রহণ করানো হয়েছিল, সত্যকে সেভাবেই গ্রহণ করানো হবে।'

'সেটা কি? বুঝছি না আমি।' বলল আয়েশা বেগ।

'দুদিন অপেক্ষা কর। জবাবটা তুমিই বলবে, তোমার কাছ থেকেই শুনব।' আহমদ মুসা বলল।

'আলহামদুলিল্লাহ। আপনার কথা সত্য হোক ভাই সাহেব।'

'আমিন। আসি বোন। আবার দেখা হবে। আস্সালামু আলাইকুম।' বলল আহমদ মুসা।

'ওয়াআলাইকুমুস সালাম। উইশ ইউ গুড ডেজ ভাইয়া।'

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠল। ষ্টার্ট নিল গাড়ি।

'ভাইয়া আমরা কি যাচ্ছি ডা. আয়েশা আহমদের মামার ওখানে?' বলল কামাল সুলাইমান।

'যাব বলেছি। কিন্তু ওরা প্রস্তুত থাকবেন কিনা?' আহমদ মুসা বলল।

'আমি ডা. আয়েশাকে জানিয়েছিলাম। উনি কনফারম করেছেন আজ বিকেলে অথবা সন্ধ্যার পর যে কোন সময়।' বলল কামাল সুলাইমান।

'ধন্যবাদ, কামাল সুলাইমান। আমরা যদি অফিসিয়াল 'লগ'-এর সাথে সাথে 'গ্লোবাল হক'-এর 'এরিয়াল রুট' ও এই রুটে উড্ডয়নের ছবি পেয়ে যাই, তাহলে আমাদের চেষ্টা ষোলকলায় পূর্ণ হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'আল্লাহই করুন তাই যেন হয়। এটা হবে আমাদের জন্যে 'সোবহে সাদেক'।' বলল কামাল সুলাইমান।

'আমিন।' আহমদ মুসা বলল।

কেউ কথা বলল না এর পর। দুজনেই নিরব। দুজনের চোখে-মুখে আশা আনন্দ ও ভাবনার ছাপ। চোখের দৃষ্টি তাদের সামনে। ছুটছে গাড়ি।

কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে পেয়ালা রেখে বলল বৃদ্ধ মরিস মরগ্যান, 'দেখ আহমদ মুসা তুমি একটা জীবন্ত কিংবদন্তী। আমার এ বাড়িটা ধন্য হয়েছে তোমাকে পেয়ে। কিন্তু তোমরা আমাদের আয়েশার বন্ধু। তোমাদের তুমি বলব, কিছু মনে করো না।'

বলে বৃদ্ধ একটা দম নিল। একটু ভাবল। তারপর বলল, 'তোমার কথা শুনলাম আহমদ মুসা। আনন্দিত হলাম যে, একটা মিথ্যার মুখোশ তোমরা উন্মোচন করতে যাচ্ছ। কিন্তু বিশ বছর পর সত্য উদ্ধার করে কি করতে চাও? প্রতিশোধ নিতে চাও, না কালোদাগের বিমোচন চাও? কোনটা বড় তোমাদের কাছে?'

মরিস মরগ্যান ডা. আয়েশা আহমদ এর মামা। 'সেফ এয়ার সার্ভিস'-এর একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সে।

মরিস মরগ্যানের হিলটপস্থ বাড়ির সুন্দর বৈঠকখানায় বসে আহমদ মুসারা তার সাথে গল্প করছে। পূবদিকে চোখ ফেরালেই হাডসন নদীর নীল পানি

চোখে পড়ে। নদীর গা ছুঁয়ে আসা সরস বাতাসের স্পর্শ অনুভব করতে পারছে তারা।

নিউইয়র্ক থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার উত্তরে হাডসন নদীর তীরে সুন্দর পাহাড়ী গ্রাম এই গ্রীন ফিল্ড। চাকুরি থেকে অবসর পাওয়ার পর মরিস মরগ্যান কাউন্ট্রির নিরব পরিবেশে প্রায় বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছে।

'আমরা একটা অসত্যের অবসান ঘটাতে চাই। মানুষকে জানাতে চাই প্রকৃত সত্য। কোন প্রতিশোধের চিন্তা আমাদের নেই। অপরাধীদের শাস্তির প্রশ্ন আছে। কিন্তু সে দায়িত্ব আমেরিকান সরকারের। এদিকটা আমরা ভাবছি না।' বলল আহমদ মুসা।

'এটাই ভাল। ধন্যবাদ। বিচার চাওয়া ভাল। বিদ্বেষ ভাল নয়। যারা টাওয়ার ধ্বংসের কাজ করেছে, যারা এ নিয়ে মিথ্যাচারের মাধ্যমে উদোরপিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়েছে, তাদেরকে আমি আমার সমগ্র সত্তা দিয়ে ঘৃণা করি। ঘটনার একমাস পর আমি রিটায়ার নিয়েছি। অফার ছিল আরও দুবছর চাকুরি করার। কিন্তু অফার আমি গ্রহণ করিনি। যদিও জানতাম আমার আমেরিকা এজন্যে দায়ি নয়, এমন কি আমাদের সরকারও এর সাথে নেই। একটি স্বার্থের সিন্ডিকেট এই কাজ করেছে। এটা জেনেও করার কিছু ছিল না। আয়োজনটা এমন আট-ঘাট বেঁধে করা হয়েছিল যে, কাউকে কিছু বিশ্বাস করানো সম্ভব ছিল না। তাই নিরবে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম।'

'জনাব একটা প্রশ্ন, আপনি ষড়যন্ত্রের কথা কিভাবে বুঝেছিলেন?'

'সেদিন আমার শিফট শুরু হলে 'সেফ এয়ার সার্ভিস'-অবজারভেটরীতে গিয়ে বসেছি। চোখ গেল স্কাই-স্ক্রীনে। হঠাৎ দেখলাম, নিউইয়র্কের আকাশে খালি চোখে দেখা যায় না এমন উঁচুতে আমাদের 'গ্লোবাল হক' দাঁড়িয়ে। তার অনেক নিচে বিপজ্জনক ফ্লাইং লেবেল দিয়ে সিভিল এয়ারলাইনার ছুটে আসছে। 'গ্লোবাল হক' ও 'সিভিল এয়ার লাইনার' এর গতি একই দিকে। ভ্রুকুচকে গেল আমার। 'গ্লোবাল হক'-এর অপ্রতিরোধ্য ম্যাগনেটিক রিমোট কনট্রোল কি কোন হাইজ্যাক করা বিমানকে আটক করেছে? আমি তাড়াতাড়ি অ্যাডিশনাল রেকর্ডার এবং 'রেয়ার ভিউ কলার' চালু করে নিয়ে চোখে তুলে নিলাম ম্যাগনেটিক

গগলস। এই গগলস অদৃশ্য ম্যাগনেটিক ওয়েভস্রোতকে রঙীন আলোর আকারে সামনে নিয়ে আসে। আমি গগলস চোখে লাগাতেই দেখতে পেলাম আমার ধারণা সত্য। 'গ্লোবাল হক' থেকে সবুজ আলোর একটা ধারা তীরের মত সোজা নেমে গিয়ে স্পর্শ করেছে সিভিল এয়ার লাইনারকে। প্লেনটি পরিণত হয়েছে একটি আলোকপিন্ডে। সবুজ আলোর ধারাটি প্লেনকে টেনে নিয়ে চলেছে। বুঝলাম, 'গ্লোবাল হক' হাইজ্যাক হওয়া একটা প্লেনের নিজস্ব পরিচালনা ব্যবস্থা এবং হাইজ্যাকারদের মেটালিক ও এক্সপ্লোসিভ সব অস্ত্রকে বিকল করে দিয়ে প্লেনটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেফ ল্যান্ডিং এর দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই আমি অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, প্লেন গিয়ে আঘাত করেছে পাশাপাশি দাঁড়ানো ডেমোক্রাসি ও লিবার্টিং টাওয়ারের মধ্যে ডেমোক্রাসি টাওয়ারকে। আপনা আপনিই আমার কণ্ঠ থেকে একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। আমি তাড়াতাড়ি টেলিফোন করলাম আমাদের এয়ার ডিফেন্স হেড অফিসে। এক অপরিচিত কণ্ঠ আমার টেলিফোন ধরল। আমি কম্পিত কণ্ঠে তাকে ঘটনা জানালাম। 'ওকে' বলে সে টেলিফোন রেখে দিল। তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া না দেখে আমি বিস্মিত হলাম। কে টেলিফোন ধরেছিল, এ যখন ভাবছি এবং দৃষ্টি ফেরাচ্ছি স্কাই স্ক্রীণের দিকে। ঠিক তখনই আমার সামনের স্কাই স্ক্রীনটা অন্ধকার হয়ে গেল। তার সাথে বিদ্যুতও চলে গেল। অবজারভেটরির এ কক্ষের বিকল্প বিদ্যুত ব্যবস্থা সক্রিয় হলো। আলো জ্বলে উঠল কক্ষে আবার। কিন্তু 'স্কাই স্ক্রীন' অন্ধকারই থাকল। আমি টেলিফোন করলাম মেইনটেন্যাস বিভাগে। তারা বলল, আমরা কিছু বুঝতে পারছি না স্যার। সব কিছুই আমাদের ঠিক আছে। কিন্তু কাজ করছে না কোন কিছুই। এটা কি কোন ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক জ্যামিং? আমি আতংকিত হয়ে পড়লাম। আমি এবার টেলিফোন করলাম, আমাদের 'সেফ এয়ার সার্ভিস' বিভাগের চীফ জেনারেল আব্রাহামকে। তিনি বললেন, নিউইয়র্কে একটা বড় ঘটনা ঘটেছে। ইমারজেন্সী চলছে। শীঘ্রই সব জানতে পারবে। তোমার ডিউটি রুমে তুমি অপেক্ষা করবে।' তাঁর কথা আমাকে আরও আতংকে ঠেলে দিল। আমি বুঝতে পারলাম না, ইমারজেন্সী চললে আমাদের স্কাই স্ক্রীন আমাদের কাছে অন্ধকার হয়ে যাবে কেন? এইভাবে আতংক-উত্তেজনার মধ্যে আমার সময়

কাটতে লাগল। এমনি এক সময়ে আমাকে আরও আতংকিত করে দিয়ে আমার অবজারভেটরী কক্ষের দরজা ঠেলে প্রবেশ করল এক মুখোশধারী। গায়ে কালো ওভারকোট, মাথায় কালো হ্যাট। গ্লাভস পরা হাতে তার রিভলবার। সোজা এসে সে আমার পকেট থেকে রিভলবার তুলে নিল। তারপর দ্রুত এগুলো স্কাই বোর্ডের দিকে। স্কাইবোর্ডের কম্পিউটারে তখন ছিল গত কয়েক ঘণ্টার স্কাইমনিটরিং ভিডিও রিপোর্ট। মুখোশধারী লোকটি সবজান্তার মত স্কাই বোর্ড থেকে কম্পিউটার ডিস্ক বের করে নিল। যাবার সময় সে বলল অস্বাভাবিক ভরাট কণ্ঠে, গত এক ঘণ্টার কথা একদম ভুলে যাবে। না হলে স্কাইবোর্ড থেকে ডিস্ক বের করার মত করে তোমার মাথা থেকে মেমরি-মগজ বের করে নেয়া হবে।' বলে বের হয়ে গেল লোকটি। আমার সামনের গোটা পৃথিবী ওলট পালট হয়ে গেল। আতংকিত নয়, ঘটনাটা আমাকে বাকহীন পাথর করে দিল। সম্বিত ফিরে পেলাম টেলিফোন বেজে উঠার শব্দে। ধরলাম টেলিফোন। আমার চীফ বস জেনারেল আব্রাহামের টেলিফোন। তিনি বললেন, 'মি. মরগ্যান, শত্রুরা নিউইয়র্কে আমাদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতীকে আঘাত হেনেছে। ইমারজেন্সী ঘোষণা করা হয়েছে। ডিউটিরুম ত্যাগ করবে না।' আমি তাঁকে এইমাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনার পুরো বিবরণ দিলাম। তিনি বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন। বললেন, 'এত দূরে আমাদের অফিসেও হামলা! তুমি তাড়াতাড়ি সব লিখে আমাকে ফ্যাক্স করো। আমি ওটা আমাদের সিকিউরিটি, গোয়েন্দা ও পুলিশকে দিয়ে তারপর তোমার অফিসে আসছি। আমি লিখিত দিয়েছিলাম। সব বিভাগকে জানানোও হয়েছিল। কিন্তু ফল হয়নি। আমি জানতাম ফল হবে না। জেনারেল আব্রাহাম আমার আগেই রিটায়ার নেন। 'গ্লোবাল হক'-এর সেদিনের ভুমিার সাথে 'শত্রুর আক্রমণ তত্ত্ব' আমি মিলাতে পারিনি। সেখান থেকেই আমার সন্দেহ শুরু।' দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে থামল মরিস মরগ্যান।

'অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে ঘটনার অবিশ্বাস্য এক কাহিনী জানার সৌভাগ্য হলো। আর একটা বিষয়, স্কাইবোর্ড থেকে এরিয়াল দৃশ্যের মনিটর রেকর্ড তো ওরা নিয়ে যায় সেদিনই। কিন্তু পরে

'গ্লোবাল হক'-এর 'এরিয়্যাল রুট' ও 'তৎপরতার' ছবি কি করে পেলেন?' আহমদ মুসা বলল।

'স্কাই বোর্ডের এ রেকর্ড ছাড়াও আমি অ্যাডিশনাল রেকর্ডও শুরু করি। শুরু থেকে ঘটনার দৃশ্য নেবার জন্যে 'রিভিউ রেকর্ডার'ও চালু রেখেছিলাম। ওরা এটা টের পায়নি। ঘটনা সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হবার পর ঐ দুটি রেকর্ড-ডিস্কের একটা কপি আমি দিয়েছিলাম জেনারেল আব্রাহামকে, আরেকটা কপি আমি রেখে দিয়েছিলাম আমার কাছে। অফিসে ছিল এক কপি। কিন্তু অফিস ও জেনারেল আব্রাহামের কপি হারিয়ে যায়।' বলল মরিস মরগ্যান।

'তাহলে আপনার কপির কথা ওরা জানতো না?' আহমদ মুসা বলল।

'তাই হবে। আমাকে ওরা সন্দেহও করেনি। কারণ আমি একেবারেই নিরব হয়ে গিয়েছিলাম।

কথা শেষ করেই মরিস মরগ্যান তার পকেট থেকে একটা ইনভেলাপ বের করল এবং তা এগিয়ে দিল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'মি. আহমদ মুসা এই ইনভেলাপে 'গ্লোবাল হক' এর উড্ডয়ন থেকে টাওয়ার ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত অনেকগুলো ছবি আছে এবং একটি ডিস্ক আছে এতে।'

'ধন্যবাদ জনাব' বলে ছবির ইনভেলাপ গ্রহণ করার সময় আহমদ মুসা বলল, 'একটা জিজ্ঞাসা জনাব। এই ঘটনায় গোপন ও কৌশলগত 'গ্লোবাল হক' বিমান ব্যবহৃত হবার ব্যাখ্যা কি?'

'ওটা অনেক উপরের সিদ্ধান্তের ব্যাপার। আমি ঐ ব্যাপারে কিছুই জানি না। তবে যেটা আমি উপলব্ধি করেছি, সেটা হলো, ঐ দিন 'গ্লোবাল হক'-এর সাপ্তাহিক রুটিন মহড়ার দিন ছিল। প্রতি সপ্তাহে একদিন 'গ্লোবাল হক'-এর জন্যে রুটিন মহড়া নির্ধারিত। একে সামনে রেখেই ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের অপারেশনের দিন ঠিক করে। 'গ্লোবাল হক'-এর মহড়ার উড্ডয়নকেই বিশেষ অপারেশনের কাজে ব্যবহার করা হয়। আমি নিশ্চিত মনুষ্যবিহীন 'গ্লোবাল হক'কে ঘাঁটি থেকে যিনি কম্পিউটার কমান্ড দিয়েছেন, তিনি ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিলেন। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, ঘটনার এক ঘণ্টা পর তিনি রহস্যজনকভাবে নিহত হন। সন্দেহ নেই, কাজে লাগানোর পর তাকে হত্যা করা হয় যাতে অতিগোপনীয়

বিষয়টা বাইরে না যায়। তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্তের সাথে সাথে গ্লোবাল হককে অপারেশনের কাজে ব্যবহারের সকল চিহ্ন তারা মুছে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই লক্ষ্যেই সেফ এয়ার সার্ভিস অফিস থেকে 'গ্লোবাল হক' সেদিন কি কাজে ব্যবহার হয়, তার সাক্ষী ফিল্ম ডাকাতি করে তারা নিয়ে যায়।' বলল মরিস মরগ্যান।

'কিন্তু তারা 'সেফ এয়ার অফিস'-এর রুটিন লগ তখন সরায়নি! কেন?' আহমদ মুসা বলল।

'কারণ, দিনটি রুটিন মহড়ার ছিল বিধায় লগে অস্বাভাবিকত্ব কিছু ছিল না তবে সন্দেহ উদ্রেককারী একটা বিষয় ছিল। লগের সাথে ছিল রুটের মনিটরিং রিপোর্টও। এই রিপোর্ট থেকে প্রমাণ হতে পারে টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার সময় 'গ্লোবাল হক' নিউইয়র্ক ষ্টেটের আকাশে ছিল।' বলল মরিস মরগ্যান।

'ও এ কারণেই তাহলে পরে এই লগকে মিসিং দেখানো হয়।' আহমদ মুসা বলল।

'অবশ্যই, এটাই কারণ।'

কথা শেষ করে একটু থেমেই মরিস মরগ্যান আবার বলে উঠল, 'তোমরা অনেক কথাই জান দেখছি। নিশ্চয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছ। একটা দুটো প্রমাণ দিয়ে ওদের কাবু করা যাবে না। ষড়যন্ত্রকারীরা শক্তিমান, বুদ্ধিমান, অর্থবান ও অতুল প্রভাবশালী। তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রমাণ কি?'

'বেশি নয় শুধু তিনটি বড় প্রমাণের উপর আমরা ভরসা করছি।' বলে আহমদ মুসা হাইজ্যাকার বলে কথিত ১৪ জনের লাশ উদ্ধার মাউন্ট মার্সি থেকে এবং ধ্বংস টাওয়ারে ডাষ্ট পরীক্ষার রিপোর্ট সম্পর্কে সংক্ষেপে সব কথা মরিস মরগ্যানকে জানাল।

'ও গড! তোমরা অসাধ্য সাধন করেছ। কিন্তু বৎস, তোমরা যা যোগাড় করেছ, সেগুলো তুখোড় যন্ত্র, কিন্তু চালনা করবে কে?' বলল মরিস মরগ্যান।

'সেজন্যে ক্ষেপণাস্ত্রেরও ব্যবস্থা করেছি জনাব। আগামী দুতিন দিনের মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্রের কাজ দেখবেন আপনি। প্রার্থনা করুন যেন-আমরা সফল হই।' আহমদ মুসা বলল।

‘ঈশ্বর তোমাদের সাহায্য করুন।’ বলল মরিস মরগ্যান।

‘আমরা উঠতে চাই জনাব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘অবশ্যই উঠবে। স্মরণীয় সময় খুব সংক্ষিপ্তই হয়ে থাকে। খুব খুশি হয়েছি তোমাদের দেখা পেয়ে। তাছাড়া জান, আমাদের ভাগ্নীদের সিদ্ধান্তেও আমি খুব খুশি। ধর্ম বিশ্বাসকে নবায়ন করতে চাইলে, তার জন্যে বিশ্বে ইসলামই একমাত্র বিকল্প। তারা তাই করেছে।’ বলল মরিস মরগ্যান।

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, ‘আমাদের ধর্মে একটা কথা আছে, নিজের জন্যে যা পছন্দ করবে, অন্যের জন্যেও তা পছন্দ করা উচিত। এই কথাকে বোধ হয় এভাবেও বলা যায়, অন্যের জন্যে যা পছন্দ করবে, নিজের জন্যেও তা পছন্দ হওয়া উচিত।’

হাসল বৃদ্ধ মরিস মরগ্যানও। বলল, ‘তুমি অসাধারণ আহমদ মুসা। অত্যন্ত শক্ত কথা তুমি শুধু সহজ করে নয় সুন্দর করেও বলতে পার। কিন্তু এই সুন্দর কথা শোনার সুন্দর বয়স আমার নেই। অস্তাচলের সময়টা শুধু বিয়োগের, সংযোজনের নয়। প্রাকৃতিক বিধানও এটাই।’

আহমদ মুসার চোখে-মুখে নামল গাম্ভীর্যের একটা পাতলা ছায়া। বলল, ‘গতির জগৎ এই পৃথিবীর জন্যে একথা সত্য, কিন্তু মানব জীবনের অস্তাচল চিরন্তন স্থিতির জগতের সোবহে সাদেক মাত্র। মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়ে মানুষ এই স্থিতির জগতে প্রবেশ করে। শেষ নিঃশ্বাসের পূর্ব পর্যন্ত মানুষকে চিরন্তর স্থিতির জগতের জন্যে পাথেয় যোগাড় করতে হয়। এই পাথেয়র প্রকৃতি ও পরিমাণই নিরুপণ করে স্থিতির জগতে তার পাওয়া ও পজিশন কেমন হবে। সুতরাং অস্তাচলের শেষ পর্যন্তও পাথেয়র সংযোজন চলতে হবে।’

‘আহমদ মুসা তুমি পরম দর্শন-তত্ত্বের কথা বলছ। আমি বলেছি মাটির মানুষের অনিত্য জীবনের কথা।’ বলল মরিস মরগ্যান।

‘গতির জগতে দুনিয়ার সবকিছুই অনিত্য। কিন্তু এই জগতের অনিত্য জীবনই অনন্তের পাথেয়। সুতরাং মাটির মানুষের জীবন অনন্তের সাথে সম্পর্কিত, বিচ্ছিন্ন নয়।’ আহমদ মুসা বলল।

বৃদ্ধ মরিস মরগ্যানের চোখে-মুখে আনন্দ ও বিস্ময়ের ছাপ। বলল সে চেয়ারে সোজা হয়ে বসে, 'আমাদের অনিত্য জীবনটা অনন্তের পাথেয় সংগ্রহের জন্যেই, জীবনের অস্তাচল ক্ষয়মান হলেও পাথেয়র সংযোজন এ সময় বাড়িয়ে চলতে হবে, এই তো?'

'ঠিক তাই।' আহমদ মুসা বলল।

হাসল বৃদ্ধ মরিস মরগ্যান। বলল, 'জীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণতির দিক দিয়ে তোমার কথা পরম এক সত্য। কিন্তু আমি কথাটা বলেছিলাম জীবনের জৈবিক দিক সামনে রেখে। এখন বল, আমার ভাগ্নীদের জন্যে যেটা ভাল মনে করেছি, সেটা নিজের জন্যে ভাল মনে করলেই কি পাথেয়র ব্যবস্থা আমার হয়ে যাবে?'

'এ প্রশ্নের জবাব তো আপনি দিয়েছেন এই কথা বলে যে, ধর্ম বিশ্বাস নবায়ন করতে চাইলে তার জন্যে ইসলামই একমাত্র বিকল্প।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু আমি ধর্ম বিশ্বাসকে নবায়ন বা পুনরুজ্জীবন করতে যদি না চাই?' বলল মরিস মরগ্যান। গম্ভীর কণ্ঠ তার।

মুখ টিপে হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'এইমাত্র আপনি বললেন জীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণতির দিক থেকে দুনিয়ার অনিত্য জীবনে আখেরাতের অনন্ত জীবনের জন্যে পাথেয় সংগ্রহের বিষয়টা একটা পরম সত্য। এই পরম সত্যটা মুলত ধর্মের সত্য। একমাত্র ধর্ম অবলম্বন বা অনুসরণ করেই এই পরম সত্য লাভ করা সম্ভব। সুতরাং ধর্ম বিশ্বাসের নবায়ন বা পুনরুজ্জীবন আপনাকে করতেই হচ্ছে।'

সংগে সংগে উত্তর দিল না মরিস মরগ্যান। তার মুখ অসম্ভব গম্ভীর হয়ে উঠেছে। ভারী কোন চিন্তার গভীরে নিমজ্জিত সে। এক সময় সে ধীর কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমার প্রায় ৮০ বছরের অচল নিষ্ক্রিয় জীবনকালে তুমি আমাকে একি শোনালে আহমদ মুসা! আমার সামনে নতুন এক জীবন বোধের দরজা যে খুলে দিলে তুমি! আমি তো জীবনকে এভাবে কোন দিন দেখিনি! কেউ বলেনি আমাকে এভাবে! এখন মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে নয় ভয় হচ্ছে আমি আমার দুনিয়ার অনিত্য

জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছি, তার মানে অনন্ত জীবনেও আমি কিছু পাব না, মর্মান্তিকভাবে ব্যর্থ ও বিড়ম্বিত হব আমি সেখানে!' ভারী ও কম্পিত কণ্ঠে সে কথা শেষ করল। তার দুচোখের কোণায় অশ্রু চিক চিক করছে।

শান্ত কণ্ঠে ও সান্ত্বনার সুরে আহমদ মুসা বলল, 'জনাব, সর্বশেষ যে বাক্য দিয়ে আপনি কথা শেষ করলেন, সে ধরনের কথা বলার সময় এখনও আসেনি। আপনার দুনিয়ার জীবন শেষ হয়নি, আখেরাতের অনন্ত জীবন এখনও অজানা দূরত্বে।'

'অজানা দূরত্বে হলেও একথা তো আমি জানি, সে অনন্ত জীবনের জন্যে উপযুক্ত পাথেয় সংগ্রহের অনেক সময় আমার নেই।' বলল মরিস মরগ্যান নরম কণ্ঠে। চোখের কোণায় জমে ওঠা দুফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার গন্ড দিয়ে।

'আল্লাহর কাছে 'উপযুক্ত পাথেয়' বিবেচ্য বিষয় সব সময় নয়। যদি তিনি দেখেন তাঁর বান্দা উপযুক্ত পাথেয় সংগ্রহের জন্যে উপযুক্ত যাত্রা শুরু করেছে, কিন্তু যাত্রা শেষ করার সময় তার হয়নি, তাহলে করুণাময় আল্লাহ ফুল মার্ক অর্থাৎ উপযুক্ত পাথেয় তাকে দিয়ে দেন।' এই কথাগুলো বলতে গিয়ে আবেগে ভারী হয়ে উঠল আহমদ মুসার কণ্ঠও।

ওদিকে মরিস মরগ্যান-এর দুচোখ দিয়ে দর দর করে নেমে এল অশ্রু। আকুল কণ্ঠে বলে উঠল, 'সত্যি বলছ আহমদ মুসা! অনন্ত সে জীবন আমি সুন্দর করে পাব? এখনও সফল হবার সময় তাহলে আমার আছে? তাহলে আমার হাত ধর আহমদ মুসা। আমাকে নিয়ে চল 'উপযুক্ত যাত্রা' শুরুর পথে।'

বলে বৃদ্ধ মরিস মরগ্যান জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসার হাত।

মিসেস মরগ্যান অনেকক্ষণ এসে দাঁড়িয়েছে একটু দূরে, মরিস মরগ্যানের পেছনে। সেও শুনছিল উভয়ের কথা অবাক বিস্ময়ে।

সে এবার ধীরে ধীরে এসে স্বামীর পাশে বসল। সে তার হাত ন্যস্ত করল স্বামীর বাহুর উপর।

মরিস মরগ্যান আহমদ মুসার একটা হাত জড়িয়ে ধরলে আহমদ মুসাও দুহাত দিয়ে তার হাত জড়িয়ে ধরেছে।

৭

মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওভাল অফিস। প্রেসিডেন্ট এ্যাডামস হ্যারিসন তার আসনে বসে। সামনে খোলা একটা ফাইলের উপর তার মনোযোগ নিবিষ্ট। আনন্দ-উৎকণ্ঠার মিশ্র খেলা তার চোখে-মুখে।

এক সময় সে ফাইল ধীরে ধীরে বন্ধ করল। সোজা হয়ে বসল চেয়ারে। তারপর বাম হাত বাড়িয়ে বাম দিকের ডেস্কের এক প্রান্তে রাখা ইন্টারকমের নীল বোতাম চেপে বলল, 'ওঁদের এখন পাঠিয়ে দাও।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘরে এসে ঢুকল সেক্রেটারী অব ষ্টেট বব.এইচ ব্রুস, সেক্রেটারী অব ডিফেন্স সান্ড্রা ষ্টোন, প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা এলিজা উড, মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান রোনাল্ড ওয়ার্শিটন। সি.আই.এ প্রধান এডমিরাল ম্যাক আর্থার, এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসন এবং সিনেট গোয়েন্দা কমিটির প্রধান আনা প্যাট্রেসিয়া।

সবাইকে স্বাগত জানাল প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন। বলল, এই মিটিংটা ২৪ ঘণ্টা আগে হবার কথা ছিল, কিন্তু কাকতারীয়ভাবে মিস এলিজা উড, মিস সান্ড্রা ষ্টোন ও বব. এইচ. ব্রুস তিনজনই ওয়াশিংটনের বাইরে থাকায় মিটিং পিছিয়ে দেয়া হয়। আর আমরা এই সাত সকালে বসেছি তার কারণ হলো, আমার মনে হচ্ছে সকাল দশটার মধ্যেই প্রেসের সাথে আমাদের কথা বলতে হবে।' থামল প্রেসিডেন্ট।

সবাই নিরব। প্রেসিডেন্ট আবার কথা বলল। এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসনকে লক্ষ্য করে বলল, 'মি. জর্জ, লা-মন্ডের কালকের নিউজ আইটেমটা পড়ুন।'

পড়া শুরু করল জর্জ আব্রাহাম জনসন,

'প্যারিস, ১১ই সেপ্টেম্বর। নিউইয়র্ক ষ্টেটের মাউন্ট মার্সি'র রেডইন্ডিয়ান গ্রেভইয়ার্ডের পাশে গোপন একটি গণকবর আবিষ্কৃত হয়েছে।

একজন পুরাতত্ত্ববিদ অধ্যাপকের কৌতূহলমূলক এক খননকালে এই গণকবর আবিষ্কৃত হয়।

গণকবরে ১৪টি কংকাল ছাড়াও হাতের আংগুটি, প্লাষ্টিক মানিব্যাগ, প্লাষ্টিক নেমকার্ড, কয়েন, ইত্যাদিসহ বেশ কিছু এমন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে যা ইতিমধ্যেই সবার মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে একটা নেমকার্ডে এমন একজনের নাম পাওয়া গেছে যিনি নিউইয়র্কের টুইনটাওয়ার ধ্বংসের হাইজ্যাকার হিসাবে বিমান ধ্বংসের সাথে সাথে নিহত হয়েছে বলে প্রচারিত হয়েছে। প্রাপ্ত একটা আংটিতে এমন একটা আরবী অক্ষর পাওয়া গেছে যা টাওয়ার ধ্বংসকারী বলে কথিত একজন সন্ত্রাসীর নামের আদ্যাক্ষরের সাথে মিলে যায়। এছাড়া খননকারী ও উপস্থিত পুরাতত্ত্ববিদ ও প্রতœতত্ত্ববিদদের প্রাথমিক ধারণায় গণকবরটি বিশ বছরের মত পুরানো হবে।

কংকালগুলো উত্তোলনের পরপরই দাঁত ও দেহাবশেষ এর নমুনা ফরেনসিক পরীক্ষার জন্যে অধ্যাপক নিয়ে গেছেন। অধ্যাপকের ধারণা গণকবরটি রেডইন্ডিয়ান ভিকটিমদেরও হতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে মনে করা হচ্ছে ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

তবে এলাকার প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট অধিকাংশের অভিমত হলো, আবিষ্কৃত গণকবরের সাথে নিউইয়র্কের টুইনটাওয়ার ধ্বংসের সম্পর্ক আছে। প্রাপ্ত আরবী নাম, আরবী বর্ণমালা, টাওয়ার ধ্বংসে নিহত ১৪ সন্ত্রাসীর সাথে গণকবরের কংকাল সংখ্যা মিলে যাওয়াই শুধু নয়, গণকবর আবিষ্কারের পর একটি অপরিচিত মহল হঠাৎ তৎপর হয়ে ওঠাকেও পর্যবেক্ষক মহল তাৎপর্যপূর্ণ বলে অভিহিত করছে।

এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেছে, গণকবর আবিষ্কারের পরদিন নিউইয়র্কের পুলিশ প্রধানকে সাথে নিয়ে দুজন অজ্ঞাতনামা লোক হেলিকপ্টার নিয়ে মাউন্ট মার্সিতে গিয়েছিলেন। ওয়াকিফহাল সূত্রে জানা গেছে, তারা টাকা-পয়সা দিয়ে কংকাল ও প্রাপ্ত জিনিসপত্র গায়েব করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনার সাথে রেডইন্ডিয়ানদের স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় ফেডারেল কমিশন

অফিস ও পুলিশ লিখিত-পড়িতভাবে জড়িত হয়ে পড়ায় এবং কংকালগুলোর অংশবিশেষ পরীক্ষার জন্যে চলে যাওয়ায় তাদের ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। মনে করা হচ্ছে, বিশেষ কোন মহলের চাপের ফলে কিংবা প্রভাবিত হয়ে নিউইয়র্কের পুলিশ প্রধান অজ্ঞাতনামা দুজনের সাথে তাদের বা তাদেরই সংগৃহিত হেলিকপ্টারে মাউন্ট মার্সিতে গিয়েছিলেন। পুলিশ প্রধান মি. ওয়াটসন বলতে পারবেন ঐ লোক দুজন কে? পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন, মাউন্ট মার্সি'র গণকবরটি যদি নিউইয়র্কের টাওয়ার ধ্বংসের সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে, তাহলে নিউইয়র্কের পুলিশ প্রধানকে যারা মাউন্ট মার্সিতে নিয়ে গিয়েছিল তাদেরও সম্পর্ক আছে টাওয়ার ধ্বংসের সাথে।'

পড়া শেষ করে থামল এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসন। পড়া শেষ হতেই প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন ডিফেন্স সেক্রেটারী সান্দ্রা ষ্টোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি রিপোর্ট নিশ্চয় পড়েছেন?'

'পড়েছি মি. প্রেসিডেন্ট। কিন্তু এটা তো পত্রিকার রিপোর্ট। আমাদের নিজস্ব রিপোর্টও আমাদের সামনে আসা দরকার।' বলল সান্দ্রা ষ্টোন।

প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন তার সামনের ফাইল সান্দ্রা ষ্টোনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এফ.বি.আই. এর রিপোর্টটা আপনি সবাইকে পড়ে শুনান।

'ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট' বলে সান্দ্রা ষ্টোন ফাইলটি হাতে নিল। পড়তে শুরু করল সে ঃ

''ক'দিন আগে ড. হাইম হাইকেল উদ্ধার হবার পর তার কাছ থেকেই প্রথম জানা গেল টাওয়ার ধ্বংসের পিছনে তৃতীয় পক্ষের ষড়যন্ত্রের কথা। ড. হাইম হাইকেলকে এই ষড়যন্ত্রকারীরাই কিডন্যাপ করেছিল তার মুখ বন্ধ রাখার জন্যে। বিশ বছর আগে যুবক ড. হাইম হাইকেলও এই ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি অনুতপ্ত হন এবং সিনাগগে গিয়ে তিনি ঈশ্বরের কাছে তার পাপের কনফেশন করেন। এই কনফেশন রেকর্ড ঘটনাক্রমে ফ্রান্স-জার্মানির প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা 'স্পুটনিক' পেয়ে যায়। এই গোয়েন্দা সংস্থা আপনা থেকেই টাওয়ার ধ্বংসের পেছনে প্রকৃত সত্য কি তা উদ্ধারের জন্যে তদন্ত কাজ হাতে নিয়েছিল। ষড়যন্ত্রকারী সেই তৃতীয় পক্ষ সমস্ত রেকর্ড ও দলিল-পত্রসহ স্পুটনিক

অফিস ধ্বংস করে এবং এর সাত গোয়েন্দাকে কিডন্যাপ করে। সম্প্রতি আজোরস দ্বীপপুঞ্জ থেকে তারা উদ্ধার হয়। তারা উদ্ধার হবার পর টাওয়র ধ্বংসের ব্যাপারে আবার তদন্ত শুরু হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতেই ড. হাইম হাইকেল যাতে ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেবার সুযোগ না পায় এজন্যেই ড. হাইম হাইকেলকে কিডন্যাপ করা হয়।

ড. হাইম হাইকেলকে স্পুটনিকের লোকেরাই উদ্ধার করে এবং ড. হাইম হাইকেল টাওয়ার ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের সাথে যতটুকু জড়িত ছিলেন, ততটুকু তারা জেনে নেয়। তার ভিত্তিতে তদন্তে এগিয়ে তারা আজ গোটা ষড়যন্ত্রই উদঘাটন করেছে। ভয়ংকর ও উদ্বেগজনক সব তথ্য বেরিয়ে এসেছে। ফরেনসিক পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে, গণকবর থেকে উদ্ধারকৃত ১৪টি কংকালের সবাই আরব এবং তারা নিহত হয়েছে টাওয়ার ধ্বংসের দিনগত রাতে এক সাথে। টাওয়ার ধ্বংসের ডাষ্ট তারা নিউইয়র্কের তিনটি বিশ্ববিখ্যাত ল্যাবে পরীক্ষা করেছে। তাতে প্রমাণ হয়েছে, বিশেষ ধরনের অতি ক্ষমতাশালী ‘সেফ ডেমোলিশ এক্সপ্লোসিভ’ দিয়ে দুটি টাওয়ার গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, বিমানের আঘাতটা ছিল লোক দেখানো। সবচেয়ে ভয়ংকর হলো, আমাদের অতি গোপনীয় ও অত্যাধুনিক ‘গ্লোবাল হক’ বিমান সিভিল এয়ার লাইনস-এর দুটি বিমানকে টেনে নিয়ে টাওয়ারে আঘাত করানোর কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এই বিমানের সেদিনের অফিসিয়াল লগ-এর ফটোকপিসহ গ্লোবাল হকের সেদিনের ‘এরিয়েল রুট’ ও ‘উড্ডয়ন তৎপরতার’ ছবি স্পুটনিকের হাতে পড়েছে। উপরে উল্লেখিত ডকুমেন্টগুলোর কপি আমাদেরও হাতে এসেছে। শুধু ‘গ্লোবাল হক’ এরিয়েল ফটোগ্রাফ নেই। তবে দুএক দিনের মধ্যে পেয়ে যাব।

ষড়যন্ত্রকারী তৃতীয় পক্ষ সম্পর্কে আমরাও খোঁজ খবর নিচ্ছি। আমরা নিউইয়র্কের পুলিশ প্রধানের সাথে আলোচনা করেছি। যে দুজন মাউন্ট মার্সিতে তাকে সাথে নিয়েছিলেন, তাদের নাম পাওয়া গেছে। একজন আজর ওয়াইজম্যান। তিনি গোপন ইহুদী সংগঠন ‘ওয়ার্ল্ড আর্মি’-এর নেতা এবং এখন আমাদের হাজতে বন্দী ইহুদী গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল শ্যারনের সে বন্ধু।”

পড়া থামাল সান্ড্রা ষ্টোন। বলল প্রেসিডেন্ট হ্যারিসনকে লক্ষ্য করে, 'মি. প্রেসিডেন্ট রিপোর্ট-এর 'সার সংক্ষেপ' পড়লাম। এরপর বিস্তারিত। পড়ব কি?'

'এখনকার মত সার-সংক্ষেপই যথেষ্ট। ধন্যবাদ আপনাকে।' বলল প্রেসিডেন্ট।

প্রেসিডেন্ট থামতেই সিনেট গোয়েন্দা কমিটির প্রধান আনা প্যাট্রেসিয়া বলে উঠল, 'মি. প্রেসিডেন্ট, গোটা ব্যাপারটা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত মনে হচ্ছে আমার কাছে। তৃতীয় পক্ষের ষড়যন্ত্রের সাথে মার্কিন সরকারের সম্পর্ক কতটুকু ছিল, এ ব্যাপারে রিপোর্টের সার-সংক্ষেপে কিছু বলা নেই। এ ব্যাপারটাই আমাদের কাছে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি এখন প্রেসের সাথে কথা বলতে যাই, তাহলে আমাদের প্রধান কথা হবে এ ব্যাপারেই।'

'ধন্যবাদ মিসেস প্যাট্রেসিয়া। এ বিষয়টা আলোচনার জন্যেই আমরা বসেছি।' বলে প্রেসিডেন্ট এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসনের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল। এ সময় তাঁর ইন্টারকমে লাল একটা সিগন্যাল জ্বলে উঠল। প্রেসিডেন্ট টেলিফোনের রিসিভার হাতে তুলে নিল। ওপারের কথা শুনল। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। উত্তরে শুধু বলল, 'পাঠিয়ে দাও।'

প্রেসিডেন্ট টেলিফোনের রিসিভার রেখে সোজা হয়ে বসে বলল, 'আজকের 'লা-মন্ডে' আসছে। ওতে নাকি বিশাল রিপোর্ট আছে টাওয়ার ধ্বংসের উপর।'

কথা শেষ করেই প্রেসিডেন্ট ঘড়ির স্ক্রীনের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলে উঠল, 'এস।'

সেকেন্ডের মধ্যেই একটা ফাইল নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল প্রেসিডেন্টের একজন পি.এস।

ফাইলটি সে প্রেসিডেন্টের সামনে রেখে বেরিয়ে গেল।

প্রেসিডেন্ট ফাইল থেকে লা-মন্ডে বের করে নিল। দেখল লীড হেডিংটা। শোল্ডারে বলা হয়েছে ঃ 'বৃহত্তম ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন।' আর আট কলামব্যাপী মূল হেডিং হলো ঃ 'টাওয়ার ধ্বংস করে ডেমোলিশন এক্সপ্লোসিভ ॥ বিমান হাইজ্যাক হয় গ্লোবাল হকের দ্বারা।'

প্রেসিডেন্টের মুখ বিষণœ হয়ে উঠেছে। তাতে কিছু উদ্বেগও ছায়া ফেলেছে। লা-মন্ডে কাগজটা জর্জ আব্রাহামের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘আপনার রিপোর্টে নেই, এমন কি আছে এখানে, সে ব্যাপারে ব্রিফ করুন।’

কাগজটি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল জর্জ আব্রাহাম জনসন। বলল, ‘মি. প্রেসিডেন্ট আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।’

জর্জ আব্রাহাম জনসন বেরিয়ে গেল। ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরে এল। বসল। বলল, ‘মি. প্রেসিডেন্ট গোটা রিপোর্টের উপর আমি চোখ বুলিয়েছি। আমাদের রিপোর্টের চেয়ে আলাদা যে দিক তাহলো, লা-মন্ডের রিপোর্টটি বেশি প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ। তাছাড়া তারা ১৪টি কংকালের ফরেনসিক রিপোর্ট আলাদা আলাদা দিয়েছে, আমরা ১৪টা কংকাল মিলিয়ে একটা রিপোর্ট করেছি। অনুরূপভাবে ধ্বংস টাওয়ারের ডাষ্ট তিনটি ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা হয়েছে। পত্রিকা তিনটি ল্যাবরেটরির রিপোর্টই আলাদা আলাদা করে দিয়েছে, আমরা দিয়েছি তিন ল্যাবের একটা সামারি। সিভিল এয়ারলাইন্স-এর দুটি বিমানকে টাওয়ারে হাইজ্যাক করে নিয়ে যাবার জন্যে ‘গ্লোবাল হক’কে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ পত্রিকা ‘সেফ এয়ার সার্ভিস’এর কর্মকর্তা মরিস মরগ্যান-এর ষ্টেটমেন্ট আকারে বিস্তারিত তুলে ধরেছে। আমরা অতটা পারিনি। তবে একটা জিনিস লা-মন্ডে এক্সক্লুসিভ করেছে, যা আমাদের রিপোর্টে নেই। সেটা হলো ষড়যন্ত্রকারীরা সরকারের চোখে ধুলা দিয়ে কিভাবে ‘গ্লোবাল হক’কে তাদের কাজে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়। পত্রিকার বিবরণটা এই রকম ঃ ‘গ্লোবাল হক’ সপ্তাহে একদিন রুটিন মহড়ায় আকাশে উড়ে থাকে। ষড়যন্ত্রকারীরা গ্লোবাল হক’কে ব্যবহারের জন্যে এই দিনটাকেই বেছে নেয় এবং ঐদিন গ্রাউন্ড কমান্ডে ‘গ্লোবাল হক’-এর দায়িত্বে যে ছিল তাকে কৌশলে ঐদিন ছুটি নেয়ানো হয় এবং তাঁর স্থানে ঘুষ খেয়ে আত্মবিক্রি করা একজনকে বসানো হয়। তারই কমান্ডে ‘গ্লোবাল হক’ বিমান হাইজ্যাক করে টাওয়ারে নিয়ে যায়। পরে ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে তাকে খুন করে চিরতরে তার মুখ বন্ধ করা হয়।’ থামল জর্জ আব্রাহাম।

জর্জ আব্রাহাম থামলে আনা প্যাট্রেসিয়াই প্রথম কথা বলে উঠল। বলল, ‘লা-মন্ডের রিপোর্ট কোথাও কোনোভাবে সরকারকে জড়িয়েছে কিনা?’

‘না জড়ানো হয়নি। বরং সেফ এয়ার সার্ভিস-এর কর্মকর্তা মরিস মরগ্যানের ষ্টেটমেন্ট এবং সর্বশেষ ‘গ্লোবাল হক’-এর গ্রাউন্ড কনট্রোলের যে কথা লা-মন্ডে থেকে বললাম তা মার্কিন সরকারকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।’ জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল।

‘কিন্তু মরিস মরগ্যান তার বিবরণ এবং ‘গ্লোবাল হক’ টাওয়ার ধ্বংসে যে ভুমিকা পালন করেছে তার ফটো অফিসিয়ালি উপরে দিয়েও কোন বিচার পাননি, বরং তার বিভাগীয় চীফ প্রতিকার চাইতে গিয়ে ফোর্স রিটায়ারমেন্টের শিকার হয়েছেন তার ব্যাখ্যা কি?’ বলল আনা প্যাট্রেসিয়া।

‘সরকার জড়িত নেই মানে এই কাজ সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে হয়েছে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু সরকারের শীর্ষ থেকে নি¤œ পর্যায় পর্যন্ত এক বা একাধিক লোক এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকতে পারে। তাদের মাধ্যমে ভূয়া তথ্য, ভূয়া খবর দিয়ে তখন সরকারের কথা ও কাজকে বিপথগামী করা হয়েছে। এবং এই ভাবেই বিনা তদন্তে এবং উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়াই টাওয়ার ধ্বংসের দায় একটা পক্ষের উপর চাপান হয়েছে, তাদের শাস্তিও দেয়া হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীরা এটা পরিকল্পিতভাবে করিয়েছে। লা-মন্ডের রিপোর্টে এ কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। ড. হাইম হাইকেলের মতে তাদের ষড়যন্ত্রের কয়েকটা দিক ছিল। প্রধান একটা দিক ছিল সরকার ও মিডিয়ায় অবস্থানকারী তাদের লোক দিয়ে এমন কথা বলানো, এমন তথ্য ছড়ানো যাতে করে তাদের পরিকল্পনা অনুসারে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ অবধারিত হয়ে পড়ে এবং এর পক্ষে জনমতও সৃষ্টি হয়। এটাই ঘটেছে। সরকার ষড়যন্ত্রের বাহন হিসাবে কাজ করেছে, ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে নয়।’ জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল। জর্জ আব্রাহাম জনসন থামলেও সংগে সংগে কেউ কথা বলে উঠল না।

সোজা হয়ে বসল প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন।

বলল, ‘ধন্যবাদ মি. জর্জ। আপনি যেটা বলেছেন, সেটাই সম্ভবত সত্য। কিন্তু ....।’

প্রেসিডেন্ট কথা শেষ করল না। লাল আলো জ্বলছে তার ইন্টারকম প্যানেলে। কথা বন্ধ করে সবার উদ্দেশ্যে 'মাফ করবেন' বলে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল। টেলিফোনে ওপারের কথা শুনে 'ওকে' বলে টেলিফোন রেখে দিল। সবার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রথমেই জর্জ আব্রাহাম জনসনকে লক্ষ্য করে বলল, আপনার জন্যে মেসেজ আজর ওয়াইজম্যান এবং ইলিয়া ওবেরয় ধরা পড়েছে। আপনার জন্যে আরেকটা সুখবর হলো, তাদের ধরে এফ.বি.আই-এর হাতে তুলে দিয়েছে মি. আহমদ মুসা।' শেষ কথাটা বলার সময় প্রেসিডেন্টের ঠোঁটে এক টুকরো মিষ্টি হাসি ফুটে উঠেছিল।

প্রেসিডেন্ট একটু থামতেই জর্জ আব্রাহাম জনসন কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আমার কথা শেষ হয়নি মি. জর্জ।'

'স্যরি স্যার।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

'ওয়েলকাম জর্জ।' বলে প্রেসিডেন্ট সবার দিকে মুখ ফিরাল। বলল, 'খবরের আরেকটা সংযোজন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ দুনিয়ার সব টিভি ও রেডিও লা-মন্ডের খবরের ফলাও প্রচার শুরু হয়েছে। আজ ভোর রাত থেকে ফ্রি ওয়ার্ল্ড টিভি টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার উপর বিস্তারিত রিপোর্ট শুরু করেছে। সকাল থেকে দুনিয়ার সব টিভি চ্যানেলও এর সাথে যোগ দিয়েছে। পার্লামেন্ট সদস্যসহ সব জায়গা থেকে টেলিফোন আসা শুরু হয়েছে। আমি মিটিং-এ আছি বলে সব কল ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই অবিলম্বে প্রেসের সাথে কথা বলতে হবে। কি বলব এটাই এখনকার বড় প্রশ্ন।'

থামল প্রেসিডেন্ট। তাকাল জর্জ আব্রাহাম জনসনের দিকে। বলল, 'বলুন মি. জর্জ কি যেন বলতে চেয়েছিলেন।'

'মি. প্রেসিডেন্ট, আহমদ মুসা শুধু আজর ওয়াইজম্যান ও ইলিয়া ওবেরয়কেই শুধু ধরলেন না, ড. হাইম হাইকেলকে উদ্ধারসহ গোটা অপারেশনটাই তিনি করেছেন।' জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল।

'স্পুটনিক-এর কথা শুনেই এ চিন্তা আমার মাথায় এসেছে। কয়েকজন মুসলিম যুবকের তৈরি স্পুটনিক ইতিহাস সৃষ্টি করবে, আর তার সাথে আহমদ

মুসা থাকবে না, এটা অবিশ্বাস্য। তারপর যখন আজর ওয়াইজম্যানের পাকড়াও করার কথা শুনলাম, তখনি আমার কাছে বিষয়টা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। ধন্যবাদ জর্জ বিষয়টা ফরমালি জানানোর জন্যে।' বলল প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন।

কথা বলার জন্যে হাত তুলল সশস্ত্র বাহিনী প্রধান রোনাল্ড ওয়াশিংটন। বলল, 'আহমদ মুসা আমারও ¯েœহের পাত্র। কিন্তু স্যার, আহমদ মুসা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এবার বিপদে ফেলল।'

হাসল প্রেসিডেন্ট। 'মি. রোনাল্ড ওয়াশিংটন আপনি ঠিক বলেছেন। তবে তা ঠিক এই অর্থে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এখন একটা কৈফিয়ত বা ব্যাখ্যা দিতে হবে। কিন্তু আরেক দিক থেকে এই আবিষ্কার মুসলমানদের রাহুমুক্তি ঘটাবার সাথে সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও কলংক মোচন করল। আমেরিকা ও ইউরোপের কিছু লোক ছাড়া দুনিয়ার অবশিষ্ট মানুষ বিশ্বাস করতো টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘটিয়েছে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্যে। আর এটাও ঠিক যে মার্কিন সরকার তখন এই ঘটনার সুযোগ গ্রহণও করেছিল। তার বড় কয়েকটি একতরফা সামরিক অভিযান-এর সাক্ষী হয়ে আছে। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সন্ত্রাসকে ইস্যু বানিয়েছিল, সে সন্ত্রাসের দায়েই সেও অভিযুক্ত হয়েছিল। বিশ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই কলংকের বোঝা বহন করে চলেছে। আজ টাওয়ার ধ্বংসের রহস্য উন্মোচিত হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মার্কিন জাতি অন্যের যাত্রা ভংগের সেদিনের দায় থেকে মুক্ত না হলেও 'নিজের নাক কেটে' অন্যের 'যাত্রা ভংগ' করতে গিয়েছিল, এই জঘন্য ধরনের দ্বৈত অপরাধের দায় থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু থাক এসব কথা। আমরা আসল কথায় ফিরে আসি। বলছিলাম প্রেস ব্রিফিং-এর কথা। কি বলব সেটা ঠিক হওয়া দরকার।'

'মি. প্রেসিডেন্ট, আমরা প্রেস ব্রিফিং করব, না প্রেস ষ্টেটমেন্ট করব? ষ্টেটমেন্ট রিলিজ করলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতে হয় না।' বলল সেক্রেটারী অব ষ্টেট বব.এইচ ব্রুস।

'সাংবাদিকদের এড়িয়ে লাভ নেই মি. বব। সত্য যেটা সেটাই আমরা বলব। জনগণের কাছে অবশ্যই আমাদের স্বচ্ছ থাকতে হবে। তাছাড়া দেশ, সরকার কোনটার জন্যেই আমি কোন সমস্যা দেখছি না।' বলল প্রেসিডেন্ট।

'আমিও তাই মনে করছি মি. প্রেসিডেন্ট।' বলল সেক্রেটারী অব ডিফেন্স সান্ড্রা ষ্টোন।

প্রেসিডেন্ট নিরাপত্তা প্রধান এলিজা উড, সি.আই.এ প্রধান এডমিরাল ম্যাক আর্থার এবং সশস্ত্র বাহিনী প্রধান রোনাল্ড ওয়াশিংটনের দিকে তাকাল।

তারা একে একে বলল, 'প্রেসিডেন্টের কথাই ঠিক। সত্যের মুখোমুখি আমাদের দাঁড়ানো উচিত। যতটুকু ভুল ততটুকুকে ভুলই বলতে হবে। এতে আমাদের জাতিগত মর্যাদা আরও সমুন্নতই হবে। গোটা পৃথিবী এই মুহূর্তে উন্মুখ হয়ে আছে আমরা কি বলি তা শোনার জন্যে। আমরা এখন যা বলব, তা শুধু আমাদের নয় গোটা আমেরিকার কথা হয়ে দাঁড়াবে। ব্যক্তিগতভাবে আমরা মিথ্যা বলতেও পারি, সত্য গোপন করতে পারি, কিন্তু জাতির পক্ষে কথা বলতে গিয়ে আমরা তা পারি না। প্রমাণ হচ্ছে আমরা নিজেদের নাক-কেটে অন্যদের যাত্রা ভংগ করিনি। সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা নিজেরা টুইন টাওয়ার ধ্বংস করিনি। কিন্তু এভাবে আমরা নিজেরা নিজেদের নাক না কেটেও পৃথিবীর অনেক দেশ, অনেক মানুষদের আমরা যাত্রা ভংগ করেছি। সেটা আজ উন্মুখ বিশ্ববাসীর কাছে অকপটে আমাদের স্বীকার করা উচিত। এতে দু'চার জন অখুশি হলেও আমাদের ফাউন্ডার ফাদারসরা খুশি হবেন।'

'সবাইকে ধন্যবাদ। আমি মানে প্রেসিডেন্ট নিজেই আজ প্রেসিডেন্ট নিজেই আজ প্রেস ব্রিফিং করবেন। মিস এলিজা উড আপনি সবার সাথে পরামর্শ করে একটা ব্রিফিং দাঁড় করান। ঠিক দশটায় হোয়াইট হাউজে সাংবাদিকদের ডাকা হোক।' একটু থামল প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন। তাকাল জর্জ আব্রাহাম জনসনের দিকে। বলল, 'মি. জর্জ আপনি নিশ্চয় জানেন আহমদ মুসা এখন কোথায়। আপনি নিজে তার কাছে যাবেন। তাঁকে আমার দাওয়াত দেবেন। আজ তাঁর পছন্দমত যে কোন সময় আমি তাঁর সাথে কথা বলতে চাই।' আবার একটু থামল প্রেসিডেন্ট। কথা বলল আবার জর্জ আব্রাহামকে লক্ষ্য করেই, 'প্রেসিডেন্টের প্রেস

ব্রিফিং-এর পর ড. হাইম হাইকেল ও মি. মরিস মরগ্যান-এর সাংবাদিক সম্মেলন হবে। সে ব্যবস্থাও করতে হবে।’ বলল প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন।

‘ইয়েস মি. প্রেসিডেন্ট। আপনার নির্দেশ অনুসারে কাজ হবে।’ বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

‘ধন্যবাদ জর্জ। সবাইকে ধন্যবাদ।’ বলে প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল সবাই।

জেফারসন হাউজ।

দুতলার বিশাল লাউঞ্জে কামাল সুলাইমান, ড. হাইম হাইকেল বসে। তাদের সামনের টি টেবিলে ফ্রান্সের দৈনিক লা-মন্ডে পড়ে আছে। আর তাদের সামনে কয়েকটি টেলিভিশন সেট। বিভিন্ন টিভি স্ক্রীনে বিভিন্ন চ্যানেল। কিন্তু তাদের সামনে তাদের বিষয়টাই ঃ ধ্বংস টাওয়ারের অন্তরাল থেকে সত্য উদ্ধার, ষড়যন্ত্রে মুখোশ উন্মোচন।

সবারই দৃষ্টি টিভি স্ক্রীনের দিকে।

‘কামাল সুলাইমান, এখনও আমার স্বপ্ন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। এমন কিছু ঘটেছে! ঘটতে পারে! খবরের এমন ভয়াবহ বোমা কোথাও কোন দিন ফাটেনি।’ বলল ড. হাইম হাইকেল।

‘মিথ্যার প্রাসাদ যত বড় ছিল, যত দৃঢ় ছিল, বোমাটি ততখানিই শক্তিশালী হয়েছে। যাতে মিথ্যার প্রাসাদ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।’ কামাল সুলাইমান বলল।

বুমেদীন বিল্লাহ লাউঞ্জে প্রবেশ করল। তার মুখ বিষণœ। একটা সোফায় বসতে বসতে বলল, ‘গত রাতে আহমদ মুসা ভাই যে কোথায় গেলেন, এখনও কিছুই জানালেন না তিনি। এদিকে তার নামে তিনটা ই-মেইল এসেছে।’ থামল বুমেদীন বিল্লাহ।

কামাল সুলাইমান ও ড. হাইম হাইকেল দুজনেরই মুখে নেমে এল দুশ্চিন্তার ছাপ। কামাল সুলাইমান বলল, 'গত রাতে উনি আজর ওয়াইজম্যানের পিছু নেবার জন্যে বেরিয়েছেন। ব্যাপারটা উদ্বেগেরই বটে। কিন্তু আল্লাহ ভরসা। বর্তমান মিশনের শেষ কাজটি করার জন্যে তিনি বেরিয়েছেন। আল্লাহ তাকে সফল করবেন।'

'আমিন।' বলল ড. হাইম হাইকেল এবং বুমেদীন বিল্লাহ দুজনেই।

'কোত্থেকে ই-মেইল এসেছে? কি ই-মেইল?' জিজ্ঞাসা ড. হাইম হাইকেলের।

'তিনটা ই-মেইল এসেছে। একটা মক্কার রাবেতা আলম আল-ইসলামী থেকে। আর অবশিষ্ট দুটি ই-মেইল এসেছে জোসেফাইন ভাবীর কাছ থেকে। এ দুটি ই-মেইলই জরুরি।' কামাল সুলাইমান বলল।

'জরুরি বিষয়টা কি? আপনারা পড়েছেন তো?' বলল ড. হাইম হাইকেল।

'জি না। ভাইয়ার পার্সোনাল ই-মেইল আমরা দেখি না।' বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

কথা শেষ করেই চিৎকার করে উঠল বুমেদীন বিল্লাহ, 'ভাইয়া আসছেন।'

সবাই তাকাল। দেখল, আহমদ মুসা সিঁড়ি দিয়ে দুতলায় উঠে আসছে। সিঁড়ি মুখেই কামাল সুলাইমান ও বুমেদীন বিল্লাহ তাকে জড়িয়ে ধরল।

ড. হাইম হাইকেলও উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'মোবারকবাদ আহমদ মুসা। মানুষ স্বপ্নেও যা ভাবেনি, তা আজ বাস্তব হলো।'

'আজকের হিরো তো বিল্লাহ। তার সাংবাদিকতার 'গোল্ডেন ডে' আজ।' বলল আহমদ মুসা।

'আর এই গোল্ডেন ডে'র মেকার তো আপনি।' বলল বিল্লাহ প্রতিবাদের সুরে।

'না। আজকের গোল্ডেন ডে'র মেকার আমাদের স্যার ড. হাইম হাইকেল। তাঁর দেখানো পথে আমরা হেঁটেছি মাত্র।' আহমদ মুসা বলল।

‘শক্তি, বুদ্ধি কোন কিছুতেই আপনাদের সাথে পারব না। বিনয়েও পারব কি করে? যাক, আজকের দিনের মেকার আমরা কেউ নই, আল্লাহ।’ বলল ড. হাইম হাইকেল।

‘আলহামদুলিল্লাহ।’ সবাই এক সাথে বলে উঠল।

আহমদ মুসা বসতে যাচ্ছিল সোফায়। কামাল সুলাইমান বাধা দিয়ে বলল, ‘ভাইয়া বসবেন না, ভাবীর জরুরি ই-মেইল এসেছে। আগে সেটা দেখুন।’

আহমদ মুসা কোন কথা না বলে ছুটল তার ঘরের দিকে।

আহমদ মুসার মনে তখন নানা কথার ভীড়। কি খবর দিয়েছে ডোনা? সে ভাল আছে তো? গত কদিন ধরে সে একটা খবরের জন্যে উদগ্রীব, সে খবর এল কি?

দ্রুত আহমদ মুসা কম্পিউটার খুলল। ওপেন করল মেইল বক্স।

পরপর দুটি ই-মেইল। পড়ল।

প্রথমটি পড়েই ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলে সিজদায় গেল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার পেছনে কামাল সুলাইমানরাও আহমদ মুসার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

তারা আহমদ মুসাকে সিজদায় যেতে দেখল। সিজদা থেকে উঠলে কামাল সুলাইমান বলল, ‘কি খবর ভাইয়া?’

ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা। তার মুখে হাসি, চোখে পানি। বলল, ‘আলহামদুলিল্লাহ। সুখবর। তোমাদের ভাতিজা হয়েছে।’

কামাল সুলাইমান ও বুমেদীন বিল্লাহ ছুটে গিয়ে আনন্দে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। কামাল সুলাইমান বলল, ‘আজ খুশির উপর মহাখুশির সংবাদ। ভাতিজার একটা ভাল নাম চাই ভাইয়া। নিশ্চয় ঠিক করেছেন?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এ প্রসংগ একটু পরে। তোমার ভাবী দ্বিতীয় ই-মেইলটায় কি লিখেছে পড়ে নেই।’ বলে আহমদ মুসা আবার কম্পিউটারে বসল।

কামাল সুলাইমানরা ঘরের সোফায় গিয়ে বসল।

একটুপর আহমদ মুসা কামাল সুলাইমানদের দিকে ফিরে তাকাল। হেসে বলল, 'নাম করণে একটু জটিলতা আছে।' বলে ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, 'এখন ১২টা বাজতে যাচ্ছে। ঠিক ১২ টা ১ মিনিটে তোমাদের ভাবী ই-মেইলে একটা নাম সাজেষ্ট করবে। আর ঠিক ১২ টা ১ মিনিটে আমিও একটা নাম সাজেষ্ট করব। দুটো নামের মধ্যে লটারি করে একটা নাম ঠিক করা হবে।'

'ই-মেইল কেন ভাইয়া। টেলিফোনে কথা বলুন।' বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

'না তা হবে না। কেউ তার নাম আগে বলতে রাজি নয়। কারণ আশংকা হলো, পরে যে বলবে, সে তার নাম আর নাও বলতে পারে।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা আবার বসল কম্পিউটারে।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে কামাল সুলাইমানরা। একটু পরপর ঘড়ি দেখছে।

তাদের অপেক্ষার ইতি ঘটিয়ে আহমদ মুসা ঘুরে বসল তাদের দিকে। তার মুখ ভরা হাসি। বলল, 'মিরাকল।'

'মিরাকল! কি ঘটেছে ভাইয়া।' বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

'মিরাকল মানে, দুপ্রান্ত থেকে দুজনের চয়েস এক। একই সময়ে দুজনের ই-মেইলে একই নাম সাজেষ্ট করা হয়েছে। দুপক্ষের সাজেষ্ট করা সে নাম 'আহমদ আবদুল্লাহ।' বলল আহমদ মুসা। 'আহমদ আবদুল্লাহ?' বলে দুজনে এক সাথে চিৎকার করে উঠল।

এ সময় ঘরে ঢুকল ড. হাইম হাইকেল। তার হাতে দুটি প্যাকেট।

'কি ব্যাপার এত চিৎকার কেন? 'আহমদ আবদুল্লাহ' কে?' বলল ড. হাইম হাইকেল।

দুজনে এক সাথে বলে উঠল, 'আমাদের নবজাত ভাতিজা।'

'ও! নামকরণ হয়ে গেছে? তাহলে মিষ্টিমুখে তো দেরি করা যায় না?' বলে ড. হাইম হাইকেল কাগজের প্লেটে একটা খেজুর ও একটা করে মিষ্টি সবাইকে বিতরণ করল। বলল, 'হতাশ হবার কারণ নেই, এটা উপস্থিত পরে আরও হবে।'

‘নিউইয়র্কে খেজুর কোথায় পাওয়া গেল এ সময়?’ বলল কামাল সুলাইমান।

‘শুধু খেজুর কেন, নিউইয়র্কে গোটা দুনিয়া পাওয়া যায়।’ ড. হাইম হাইকেল বলল।

তারপর পকেট থেকে দুপিস ক্যান্ডি বের করে কামাল সুলাইমান ও বুমেদীন বিল্লাহকে দিয়ে বলল, ‘ভাতিজার জিনিস চাচারা খেতে পারে, বাপকে দেয়া যাবে না।’

হেসে উঠল সবাই।

‘ভাইয়া, রাবেতা থেকে একটা ই-মেইল এসেছিল, ওটা কি দেখেছেন?’ বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

‘দেখেছি, কিন্তু পড়িনি। প্রিন্ট নিয়েছি। এদিকের সব কাজ শেষ হলে পড়ব।’ আহমদ মুসা বলল মুখে একটু হাসি টেনে।

‘তার মানে ভাইয়া, নতুন কোন মিশন.........।’ কামাল সুলাইমান বাক্য শেষ না করেই থেমে গেল।

‘থাক এ কথা এখন। বললাম তো ও প্রসংগটা পরে। আমি এখন একটা জরুরি টেলিফোন করব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক আছে ভাইয়া। আমরা পরে আসছি। ভাবীকে আমাদের সালাম ও মোবারকবাদ, আর আহমদ আবদুল্লাহর জন্যে দোয়া দেবেন।’

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কামাল সুলাইমানরা সকলে।

আহমদ মুসা দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে মোবাইলটা হাতে নিতেই রিং হতে লাগল মোবাইলে।

আহমদ মুসা দেখল ডোনা জোসেফাইনের টেলিফোন।

‘আস্সালামু আলাইকুম। মোবারকবাদ জোসেফাইন। কেমন আছ তুমি? কেমন আছ আবদুল্লাহ।’

‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম। আমি ও বাচ্চা ভাল, আলহামদুলিল্লাহ। তোমাকে কনগ্রাচুলেশন।’ ওপ্রান্ত থেকে বলল ডোনা জোসেফাইন।

'আমাকে মোবারকবাদ কেন? অসীম খুশির এক ভান্ডার তুমি উপহার দিয়েছ, তাই হাজারো মোবারকবাদ তোমার প্রাপ্য।'

'আমাদের এই খুশি তোমার আমার এবং আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতজনদের জন্যেই শুধু, কিন্তু তুমি যে আনন্দ সংবাদ সৃষ্টি করেছ, যে আনন্দ সংবাদ আজ ভোর থেকে হাজারো সংবাদপত্র ও হাজারো টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে পৃথিবীর পৃথিবীর ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। সে আনন্দ শুধু পৃথিবীর দেড়শ কোটি মুসলমানের নয়, পৃথিবীর সব শান্তি ও সুবিচারকামী মানুষের। তোমাকে লাখো মোবারকবাদ দিলেও তা কম হবে।'

'জোসেফাইন, আমরা এখন আমাদের কথা বলছি। বাইরের কথা থাক না।'

'ঠিক বলেছ। কিন্তু ঘর বাহির নিয়েই তো আমাদের জীবন এবং আমাদের আনন্দও। জান, আজ রাতে হাসপাতালের বেডে শুয়ে বারবার তোমাকে মোবাইল করেছি, সকালেও। কিন্তু তোমাকে পাইনি। এক সময় অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। বুক ভরে গিয়েছিল ক্ষোভে। পরক্ষণেই যখন মনে হলো, শান্তির শয্যা ছেড়ে তুমি কাঁটা বিছানো পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ, অবিরাম ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছ তোমার জন্যে নয়, আল্লাহর জন্যে, আল্লাহর বান্দাদের জন্যে, তখন হৃদয়ের সকল ক্ষোভ আনন্দের অশ্রু হয়ে বের হয়ে এল দুচোখ দিয়ে। জান, দুনিয়ার কোন কষ্টই এ আনন্দের চেয় বড় নয়। আমাদের ঘর বাহির আলাদা নয় কোনো ভাবেই।'

'ধন্যবাদ জোসেফাইন। তোমার কাছ থেকে এ শক্তি না পেলে আমি এত কাজ করতে পারতাম না।'

'গতরাত এবং সকালে তুমি কোথায় ছিলে। মোবাইল সাথে নাওনি কেন?'

'আমি আজর ওয়াইজম্যানের পিছু নিয়েছিলাম। মোবাইল বন্ধ রেখেছিলাম। সকালে তাকে ধরা গেছে। তাকে ধরার পর আমাদের সাফল্য পূর্ণ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।'

'আলহামদুলিল্লাহ। তুমি এখন কোথায়? বাইরে কোথাও, না জেফারসন হাউজে?'

‘জেফারসন হাউজে।’

‘আমাদের সোনামনির খবর সারাকে দিয়েছি। ও এখন ইস্তাম্বুলে।’

‘সারাকে কেমন করে পেলে?’

‘তুমি যখন তার টেলিফোন নাম্বার দিতে পারলে না, তখন ভার্জিনিয়াতে ওঁর আম্মার কাছ থেকে টেলিফোন নাম্বার নিয়েছিলাম।’

‘জোসেফাইন, আবদুল্লাহর কথা যে কিছু বলছ না! বল সে কেমন হয়েছে। আজই ই-মেইলে ওর একটা ছবি পাঠাও!’

‘কেমন আছে বলব না, ছবিও পাঠাব না।’ বলে হেসে উঠল ডোনা জোসেফাইন।

‘আমি তো আসছি। অতএব এই কষ্ট না দিয়ে কিছু বল এবং ছবি পাঠাও।’

‘আমি বলব না। কারণ তার বর্ণনা দেবার মত ভাষা আমার জানা নেই। ছবি পাঠাব না, কারণ ছবি কখনই আসল হয় না।’

‘ধন্যবাদ। তোমার যুক্তি মোক্ষম। দুধের সাধ ঘোলে মিটানো ঠিক নয়। জান্নাত থেকে আসা সোনার টুকরাকে প্রথম সরেজমিনেই স্বাগত জানানো উচিত। আমি আসছি।’

‘তুমি কষ্ট পাচ্ছ। শোন, দুধের সাথে যদি সুন্দর অনুপাতে তরল সোনা মেশাও, তাহলে কেমন রং হবে সেটা সামনে রেখে কল্পনা কর আবদুল্লাহর রং-এর কথা। আর তোমার শিশু চেহারাকে তো তুমি দেখনি, দেখলে বলতাম সে এক শিশু আহমদ মুসা। তবে আব্বা-আম্মা বলেন, ‘ওঁর মুখ আমার মতো, আর চোখ-চুল কপাল তোমার........।’

ডোনা জোসেফাইন কথা শেষ করতে পারল না। তাকে বাধা দিয়ে আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘আর বলতে হবে না, আবদুল্লাহর একটি চবি আমি এঁকে ফেলেছি জোসেফাইন।’

‘তোমার মধ্যে এ পরিবর্তন কেন?’ হঠাৎ জিজ্ঞাসা জোসেফাইনের।

‘কি পরিবর্তন?’

‘আমাকে কখনও ‘জোসেফাইন’ ডাকতে না, ‘ডোনা’ বলতে।

‘ডোনার আসন থেকে তুমি এখন অনেক উঁচুতে উঠেছ। পূর্ণ মানুষের এক মহিয়ান-গরিয়ান আসনে এখন তুমি। ছোটবেলার ছোট্ট ডাক নাম ‘ডোনা’র মধ্যে আমার মনে হচ্ছে তোমার এই পরিচয় সার্থক হয়ে উঠছে না। খুব ইচ্ছে করছে তোমাকে ‘জোসেফাইন’ নামে ডাকতে। এই নামেই যেন তুমি আমার কাছে পূর্ণ হয়ে উঠেছো।’ বলল আহমদ মুসা। আবেগে ভারী হয়ে উঠেছে তার কণ্ঠ।

‘ধন্যবাদ।’ বলে একটু থামল জোসেফাইন। তারপর ধীর কণ্ঠে বলল, ‘তুমি অনেক ভাবছ আমাকে নিয়ে। অতদূর থেকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে ভাবতে নেই। কষ্ট তাতে বাড়ে। এখন বল ওদিকের কাজ শেষ কিনা? কবে আসছ?’ আবেগ-জড়িত ভারী কণ্ঠ জোসেফাইনেরও।

‘এখানে আমার কাজ শেষ। এখন যা করণীয় তা করবে মার্কিন সরকার। তবে যাওয়ার দিন ঠিক করিনি। সবার সাথে আলোচনা করে দেখি। জানাব তোমাকে। আব্বা আম্মাসহ ওদিকে সবাই কেমন?’

‘ভাল আছেন। জান, মসজিদে নববীর ইমাম সাহেব এসেছিরেন আহমদ আবদুল্লাহকে দেখতে। তিনি কি উপহার দিয়েছেন জান? রূপার ফ্রেমে কাঁচের আধারে রাখা রূপোর প্লেটে খোদিত সোনা বিছানো ইসলামী বিশ্বের একটা মানচিত্র। আহমদ আবদুল্লাহর পাওয়া এটাই প্রথম গিফট।’

‘আলহামদুলিল্লাহ। আব্বার মাধ্যমে ইমাম সাহেবের কাছে আমার সালাম পৌছাবে।’ আহমদ মুসা বলল।

এ সময় দরজায় এসে দাঁড়াল কামাল সুলাইমান। তার হাতে মোবাইল। ইশারায় সে আহমদ মুসাকে জানাল তার টেলিফোন এসেছে। কামাল সুলাইমানের মোবাইলে।

‘জোসেফাইন একটু হোল্ড কর। সম্ভবত আমার টেলিফোন এসেছে। কার টেলিফোন জেনে নেই।’ বলে মোবাইলটা মুখ থেকে নামিয়ে বলল, ‘কার টেলিফোন কামাল সুলাইমান?’

'এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসন। কয়েকবার আপনার টেলিফোনে চেষ্টা করেছে। না পেয়ে আমাকে টেলিফোন করেছে। কি একটা জরুরি বিষয়।' বলল কামাল সুলাইমান।

আহমদ মুসা তার মোবাইল তুলে নিল। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু তার আগেই ওপার থেকে ডোনা জোসেফাইন বলল, 'শুনেছি আমি, মি. জর্জ আব্রাহাম জনসন তোমার জন্যে টেলিফোনে অপেক্ষা করছে! এখন রাখছি। পরে টেলিফোন করব। আস্সালামু আলাইকুম।'

'ওয়া আলাইকুমুস সালাম। ধন্যবাদ জোসেফাইন।'

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি মোবাইলটা রেখে কামাল সুলাইমানের মোবাইল হাতে নিল।

আহমদ মুসার কণ্ঠ ওপার থেকে শুনতে পেয়েই জর্জ আব্রাহাম জনসন আহমদ মুসাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'আসসালামু আলাইকুম। আহমদ মুসা তোমাকে প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে এবং আমার তরফ থেকে মোবারকবাদ। তুমি অসাধ্য সাধন করেছো। তোমার জন্যে আমার গর্ব হচ্ছে আহমদ মুসা।'

'ধন্যবাদ জনাব।' বলল আহমদ মুসা।

'অল্পক্ষণের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নিজে সাংবাদিক সম্মেলন করছেন টাওয়ার ধ্বংসের প্রসঙ্গ নিয়ে। আর ড. হাইম হাইকেল ও মি. মরিস মরগ্যানের সাথে আমি কথা বলেছি। তারা নিউইয়র্কে আজ একটি সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলতে রাজি হয়েছেন। আমাদের লোকেরা সব ব্যবস্থা করবে। আমরা চাই, তুমি তাদের একটু গাইড করো।' জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল।

'ধন্যবাদ। খুব ভালো সিদ্ধান্ত হয়েছে। ড. হাইকেল এবং মরিস মরগ্যানের সাংবাদিকদের সাথে কথা বলা খুব জরুরি। আমি ওঁদের সাথে অবশ্যই কথা বলব।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা। প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে তোমার জন্যে একটা মেসেজ আছে।' জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল।

'কি মেসেজ?'

'তিনি আজ তোমার সাথে কথা বলতে চান। তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনের পর যে কোন সময়ে। বিমান বাহিনীর একটা হেলিকপ্টার তোমাকে নিয়ে আসবে। কখন আসতে পারছ, সময়টা আমাকে দাও।'

'প্রেসিডেন্ট আমাকে ডেকেছেন, আমি কৃতজ্ঞ। তবে আমার গাড়িতে যাব, সামরিক হেলিকপ্টারে নয়। বাদ মাগরিব সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট করলে ভাল হয়ে জনাব।'

'হেলিকপ্টারে আপত্তি কেন? দ্রুত আসার জন্যেই এই ব্যবস্থা।'

'আমি সরকারের কোন মেহমান নই, কিংবা 'আসামী'ও নই। সরকারি বা সামরিক হেলিকপ্টার আমাকে দেয়া হবে কেন?' আহমদ মুসা বলল।

'বুঝেছি তুমি সরকারকে সম্মানিত হবার সুযোগ দিতে চাচ্ছ না। ঠিক আছে, তোমার জন্যে প্রাইভেট হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করছি।'

'আপনি আপনার বক্তব্যের প্রথম অংশকে যদি সত্যিই 'মিন' করে থাকেন, তাহলে সামরিক হেলিকপ্টারেই আমাকে যেতে হবে।' বলল আহমদ মুসা।

হেসে উঠল জর্জ আব্রাহাম জনসন। বলল, 'আমি তা 'মিন' করিনি আহমদ মুসা। একটু রসিকতা করলাম। তোমার বেসরকারি হেলিকপ্টারে আসাই সব দিক থেকে ভাল হবে।'

'ধন্যবাদ। তাহলে সময়টা বাদ মাগরিব মানে সাড়ে ছটার দিকে হলেই ভাল হয়।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা।' তখনই তোমার সাথে দেখা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ। এখনকার মত শেষ করছি। বাই।'

'ধন্যবাদ জনাব। বাই।' বলে মোবাইল রেখে দিল আহমদ মুসা।

ড. হাইম হাইকেল এসে দাঁড়িয়েছিল সেখানে।

আহমদ মুসা তাকে বলল, 'স্যার আপনি ও মরিস মরগ্যানের সাথে আমার কিছু কথা বলা দরকার। আসুন আমরা বসি।'

'আমিও সেটাই আশা করছি। কিন্তু তুমি উপস্থিত না থাকলে আমাকে দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন হবে না।'

আমি নিউইয়র্কে থাকলেও আপনার সাথে সাংবাদিক সম্মেলনে থাকতে পারবো না। তার দরকারও হবে না। যা প্রয়োজন আমরা এখনি আলোচনা করে নিতে পারি।'

বলে আহমদ মুসা এগুলো সোফার দিকে বসার জন্যে। তার সাথে এগুলো সকলেই।

পরবর্তী বই

কালাপানির আন্দামানে

কৃতজ্ঞতায়ঃ Mahfuzur Rahman